জয়বাংলা মুক্তিফৌজ

ও

শেখ মুজিব

কলহন

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম মুদ্রণ ১৪ আষাঢ়, ১৩৬৫

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
অনিলকুমার ঘোষ
শ্রীহরি প্রেস
১৩৫-এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট
কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
রবীন দত্ত

দাম : সাড়ে বারো টাকা

বাবার কাছ থেকে আমি 'স্বাধীনতা' পেয়েছি।
বাবা নেই। বাঙলাদেশের স্বাধীনতার কথা
লিখতে গিয়ে আজ বার বার বাবার কথাই
মনে পড়ছে।

কোনো কোনো স্থানের বিন্যাসকৌশল দেখে অনেকে বইটিকে 'রাজনৈতিক উপন্যাস' বলে ভাবতে পারেন। তাই গোড়াতেই বলে রাখছি, বইটি আগাগোড়া তথ্যপূর্ণ। এই বইয়ে ' জুন মাস অবধি মুক্তিযুদ্ধের পরিচয় এবং সেই সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ পটভূমি তুলে ধরার চেষ্টা ক'রেছি, তবে তা খুবই সংক্ষেপে। সংক্ষেপে ক'রতে হ'য়েছে প্রধানত দামের কথা ভেবে। পূর্ণাঙ্গ পটভূমি তুলে ধরতে গিয়ে আমার 'বিক্ষুব্ধ পাকিস্তানে'র '৫২-এর ভাষা-আন্দোলন এবং 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র অংশ-বিশেষ এখানেও আনতে হ'য়েছে।

লেখক

কৃতজ্ঞতা

বইটিতে লিখতে গিয়ে এপারবাঙলা-ওপারবাংলার অনেকের সাহায্য নিয়েছি। তাঁদের মধ্যে ওপার বাঙলার ছাত্রলীগের কামরুল আলম খসরু, এ. কে. এম. নজরুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম, আফতাব উদ্দিন আহমদ, এ. বি. এম. এ. রব, আজিজ, শেখসাহেবের প্রেস সেক্রেটারি আমিনুল হক বাদশা, এবং কবি জসিমউদ্দীনের পুত্র খুরশিদ আনোয়ার, কবি শামসুর, রহমান এবং বদরুদ্দীন উমরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এপার বাঙলার অভিজিৎ দাশগুপ্ত এবং বিশ্বজিৎ গুহ রাজশাহী থেকে তুলে-আনা তাঁদের কয়েকটি ছবি দিয়েছেন। একটি ছবি দিয়েছেন আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তাসম্পাদক শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী। আমার শুভানুধ্যায়ী শ্রীমতী আরতি চট্টোপাধ্যায়, বন্ধুবর নকুল চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ সমাজদার এবং স্নেহভাজন ময়ূখ বসু আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। জমুনাদাস আখতারের 'কনস্পিরিসি ইন পাকিস্তান' বইটিও আমার খুব উপকারে এসেছে। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সব শেষে জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতার কথাও সকৃতজ্ঞ চিত্তে উল্লেখ ক'রতে হয়।

লেখক

" 'মুজিব ভাই, আপনি আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলুন। আপনার বাড়ি থাকা ঠিক হবে না।'

উত্তরে মুজিব ভাই মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে একটু হাসলেন। বিদেশী জিনিস বলতে মুজিব ভাই ওই পাইপটাই ব্যবহার করেন। দীর্ঘদিনের সঙ্গী, তাই ছাড়তে পারেন নি। তাছাড়া পা থেকে মাথা পর্যন্ত তিনি পুরো বাঙালি। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি তাঁর নিত্যদিনের পোশাক। শীতকালে গায়ে চাপান হাফকোট বা শাল। হাফকোটের নাম এখন মুজিব-কোট হয়ে গেছে। আগে, তরুণ বয়সে প্যাণ্ট-সার্ট পরতেন। তারপরেও কখনো-সখনো পরেছেন। কিন্তু বেশ কয়েক বছর তিনি পাজামা-পাঞ্জাবি ধরেছেন। আর ওই পাজামা-পাঞ্জাবিতে মুজিব ভাইকে মানায়ও ভালো। তাছাড়া ওই পোশাকে সব সময়ই তাঁকে নিজের মানুষ বলে ভাবতে পারি। তাই বোধ হয় তার সঙ্গে আমাদের অনাবশ্যক দূরত্ব গড়ে ওঠে নি। বিকেল থেকেই খবর পেয়েছিলাম, অনেকটা উড়ো খবরের মতো, যে আজ মিলিটারি আওয়ামীলীগ এবং ছাত্রলীগের নেতাদের গ্রেপ্তার করতে পারে। মহল্লায় মহল্লায় খবরটা আমরা জানিয়ে দিয়েছি। আটটা-সাড়ে আটটার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় এবং হলগুলোতে ঢুকবার রাস্তায় রাস্তায়, ইট দিয়ে, গাছ ফেলে, ঠেলা এবং বাস দাঁড় করিয়ে রেখে অনেক ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছিলাম আমরা। যাতে চট করে সৈন্যরা হলগুলোতে ঢুকতে না পারে। নটা-সাড়ে নটা নাগাদ হলগুলোতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্তায় নেমে এলো গভীর স্তব্ধতা। পলাশ-শিমূলের ডালে ডালে পাখপাখালির ডানা ঝাপটানি শোনা যাচ্ছিল ক্ষণে ক্ষণে। আমরা কয়েকজন দশটা পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ

নাগাদ মুজিব ভাইয়ের বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম। আমাদের কথা আমরা ভাবছিলাম না, ভাবছিলাম মুজিব ভাইয়ের কথা। মুজিব ভাইয়ের নিরাপত্তার গুরুত্ব খুবই। তাই আমরা মুজিব ভাইকে 'আণ্ডারগ্রাউণ্ডে' যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকলাম।

জবাবে মুজিব ভাই বললেন, 'তোরা তৈরী হ'-গে যা, আমার জন্য ভাবিস না। আমায় আর কী করবে। বড়জোর ধরে নিয়ে যাবে। তাই বলে আমি চোরের মতো পালিয়ে যেতে পারি না। তাছাড়া আমি পালিয়ে গেলে আমার খোঁজে ওরা সাধারণের ওপর অত্যাচার চালাবে, বাড়িঘর পুড়িয়ে দেবে। আমার লোকদের আমি বিপদের মুখে ফেলে পালিয়ে যেতে পারি না।' পাশেই তখন তাজুদ্দিন ভাই বসে। তাঁরও পরনে তখন ছিল সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। আমি মুজিব ভাইয়ের দু'চোখের দিকে সোজা তাকালাম। তাঁর পুরুফ্রেমের ভিতর থেকে দু'টি চোখ আমাদের স্নেহের শাসন জানাল। অর্থাৎ যা বলছি কর্। মুজিব ভাই এলেন না। আমরা যখন তার ৩২নং ধানমণ্ডীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম তখন ঠিক রাত এগারোটা। মহিউদ্দিন এবং আরও দু'চারজন মুজিব ভাইয়ের বাড়ি রয়ে গেল। তাঁকে আমরা একা ছেড়ে দিতে পারি না। ভাবী সেদিন বাড়ি ছিলেন না। মেয়ের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। (মুজিব সাহেবের ব্যক্তিগত ফোটোগ্রাফারের অভিমত, শামিবাগে এক আত্মীয়বাড়ি চলে গিয়েছিলেন ভাবী। একজন ছাত্রনেতা বলেন, ধানমণ্ডী এলাকার একটি বৈদেশিক দূতাবাসে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন।) বাড়িতে চাকর-চাকরানী ছাড়া বিশেষ কেউ ছিল না। আমরা যখন রাস্তায় নেমে এলাম রাস্তা তখন ফাঁকা হয়ে গেছে। লোকজন একেবারে নেই। পিছন ফিরে একবার তাকালাম। মুজিব ভাইয়ের বাড়ির ছাদে চৈতালি হাওয়ায় ফুরফুর করে উড়ে চলেছে বাঙলাদেশের পতাকা। কালচে সবুজ বনেদের ওপর সিঁদুর-লাল

গোল থালার মতো বড়ো সূর্য। সূর্যের মাঝখানে পূর্ববাঙলার মানচিত্র। রঙ তার সোনালি। আমাদের এই পতাকা অনেক ভালোবাসার, অনেক শ্রদ্ধার। কতো শহীদের রক্তের ইতিহাস ওই পতাকা। সবুজের দেশ এই বাঙলা। সবুজ তার মাঠ, তার বনানী, তার দিগন্তরাল প্রসারিত ধানের ক্ষেত। দেশ যখন ভাগ হয় আমরা ওই সবুজের সমারোহের স্বপ্নই দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম, মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র হলে আমাদের আর কিছুর অভাব থাকবে না। জমিদারের শোষণ থেকে মুক্তি পাবে চাষী। মজুর পাবে তার ন্যায্য পাওনা। সোনার বাঙলার কথা আমরা শুনেছি, যখন টাকায় একমণ চাল বিকোত। দুধ ছিল অঢেল, দুপয়সা-চারপয়সা সের। প্রকৃতি আমাদের অকৃপণ হাতে অনেক কিছু দিয়েছেন। আমাদের দুঃখ থাকার কথা নয়। সেই স্বপ্নের সোনার দেশের গোয়াল-ভরা গোরু আর গোল-ভরা ধান না থাকুক, অন্ততঃ প্রতিটি মানুষ দু-বেলা দু-মুঠো ভাত পাবে তো। এ তো মানুষের ন্যূনতম ন্যায্য দাবি। মুসলিমলীগের কর্তারা আমাদের বুঝিয়েছিল, মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র হলেই সব অভাব দূর হয়ে যাবে। সোনার বাঙলা আবার সোনার ফসলে ভরে উঠবে। কিন্তু কী দেখলাম? আজ ২৩ বছর দেশ স্বাধীন হয়েছে। এই ২৩ বছরে পূর্ববাঙলা পাকাপাকি পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়ে গেছে। লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, পূর্ববাঙলা কারু তাঁবেতে থাকবে না। পূর্ব ও পশ্চিমের কতগুলি মুসলিম অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান হবে। পাকিস্তান হবে একটি রাষ্ট্রসমবায়। তাঁর ইউনিটগুলি থাকবে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং সার্বভৌম (Independent States)। তাই আমরা সরল বিশ্বাসে জিন্নাহ্-লিয়াকত আলীর কথায় আস্থা স্থাপন করেছিলাম। আমরা ছিলাম জনসংখ্যায় গরিষ্ঠ। আমাদের

সহযোগিতা এবং সাহায্য না পেলে 'পাকিস্তান' নামক রাষ্ট্রসমবায়টির জন্ম হতো না। কিন্তু দেশভাগ হতে-না-হতেই ওদের আসল চেহারা ফুটে উঠতে লাগল। ওরা ক্রমশ নিজেদের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করল। করাচি রাজধানী হলো। সৈন্যবাহিনী রইল কেন্দ্রের হাতে। এসব ব্যাপারে পূর্ববাঙলার মানুষ তখন আপত্তি তোলেনি। কারণ, পূর্ববাঙলার সরল, সোজা মানুষ পশ্চিমাদের অভিসন্ধি ধরতে পারেনি। ভারত-জুজুর ভয় দেখিয়ে এবং ইসলামের মরফিয়া খাইয়ে পূর্ববাঙলার মানুষকে মাতাল করে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল পশ্চিমের শাসকরা। প্রথম-প্রথম ধর্মের নামে এমন অত্যাচার-অবিচারের জোয়ার বহাল যে কারু টু শব্দটি করার জো রইল না। সেই জোয়ারের মুখে নীরব থাকতে হয়েছিল বুদ্ধিজীবীদের। শিল্পী সাহিত্যিকরাও তখন পথের অভাবে ছিল দিশেহারা, বিব্রত, সংকোচিত। দেশে একটা বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। চলনে-বলনে, পোশাকে-আশাকে জোর করে মুসলমানী আদপ-কায়দা চালু করার চেষ্টা চলছিল, চেষ্টা চলছিল রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা বর্জনের, চেষ্টা চলছিল বাংলা হরফ বদলানোর। ওটা নাকি হিন্দুদের হরফ। আমাদের স্বপ্নের পাকিস্তান হওয়ার পর তখনো বছর পেরুয় নি। ১৯৪৮ সালের এগারোই মার্চ কায়েদে-আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকায় এলেন। রেসকোর্সের ময়দানে বক্তৃতা দিলেন। ত্বজায়গায়ই তিনি বললেন, Urdu and only urdu shall be the state language of Pakistan. প্রতিবাদে জনসভায় গুঞ্জন ওঠে এদু'দিন বাদে কার্জন হলে এক কনভোকেশন অনুষ্ঠানে ওই একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি। তখন আমাদের মুজিব ভাই প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, 'না।' সেই ধ্বনি একা শেখ মুজিবের ছিল না, ছিল পূর্ববাঙলার পাঁচকোটি মানুষের

হৃদয়ের কথা। ঢাকার কালো পিচের রাস্তায় মুসলিমলীগ সরকারের বুলেটে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে শফিক-রফিক-জাব্বার-বরকত সালাম বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি প্রতিষ্ঠিত করে গেল। বাংলার ছেলে-মেয়েদের রক্ত দেওয়ার পালার সেই শেষ নয়, শুরু। তারপর আন্দোলনে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে সেই স্বপ্নের দেশ কায়েম করার জন্য, শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না। তাদের রক্তঢালা পথেই তাদের রক্ত গায় মেখে একদিন নতুন সূর্য, নতুন প্রভাত আসবেই। সেই প্রভাত নিয়ে আসবে বহু আকাঙ্খিত দিনের বার্তা। শস্যশ্যামল বাঙলার বুকে একদিন-না-একদিন শহীদের রক্তঢালা পথ বেয়ে নতুন দিনের নতুন বার্তা বয়ে রাণার এসে পৌঁছুবেই। আমাদের লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে হলেও আমরা আমাদের স্বপ্নের সোনার বাঙলা গড়ে তুলবই। এই পতাকা তারই প্রতীক। সবুজ-শস্যশ্যামলা বাঙলার জমিন। লালবৃত্ত—শহীদের রক্তে স্নাত নতুন দিনের নতুন সূর্য। তারই মাঝে সোনালিতে পূর্ববাঙলার মানচিত্র আঁকা অর্থাৎ সোনার বাঙলার প্রতীক। পতাকা-পরিকল্পনার একটা চমৎকার ইতিহাস আছে।

যাক্ যা বলছিলাম। মুজিব ভাইয়ের বাড়ির ছাদের ওপরে এবং নিচে, সামনে তখন উড়ছিল একটা পতাকা। ছাদের ওপরেরটা উত্তোলন করেছেন মুজিব ভাই নিজে। আর নিচেরটা শ্রমিক-নেতা মান্নান ভাই, অর্থাৎ আবদুল মান্নান। পল্টনেরটা উদ্বোধন করেছিলাম আমি। পল্টনে আওয়ামীলীগ স্বেচ্ছাবাহিনীর প্যারেড হলো। মক ফাইট হলো। লড়াই চলল সবুজপ্যাণ্ট সবুজসার্ট আর খাকিপ্যাণ্ট এবং সাদাগেঞ্জি পরা সৈন্যের মধ্যে। সবুজ পোশাক পরা ছেলেরা বাঙলা দেশের ফৌজ। আর খাকি পোশাক

পরিহিতরা পাকিস্তানের সৈন্য। হাতে তাদের ডামি রাইফেল। পিছন থেকে একজন মাঝে মাঝে ফায়ার করে যাচ্ছিল। তারপর সেখান থেকে আমরা গেলাম মুজিব ভাইয়ের ধানমণ্ডীর বাড়ির সামনে। মুজিব ভাই এবং আমরা কয়েকজন নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুর রব, আবদুল কুদ্দুস মাখন, সাজাহান সিরাজ— আমরা মার্চপাস্ট অনুষ্ঠানের অভিবাদন গ্রহণ করলাম।"

পাকিস্তানে প্রতিবছরই জাঁকজমকের সঙ্গে তেইশ মার্চ তারিখটি উদ্‌যাপিত হয়। ১৯৪০ সালের এই দিনেই ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। ওই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল: নিখিল ভারত মুসলিমলীগের সুচিন্তিত অভিমত হচ্ছে এই যে, নিম্নোক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে রচিত না হলে কোনো সংবিধানিক পরিকল্পনাই এদেশে কার্যকর হবে না বা মুসলিমদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে না। মূলনীতি হবে এইরূপ: ভৌগলিক দিকে থেকে সন্নিহিত ইউনিটগুলি নিয়ে এবং এজন্য প্রয়োজনবোধে আঞ্চলিক রদবদল করে ভারতকে এমন কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে নিতে হবে যাতে করে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল, যেখানে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ—সেখানে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠবে এবং সে-সকল রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ইউনিটগুলি হবে স্বশাসিত ও সার্বভৌম।

আরও বলা হয়েছিল:

ভারতীয় মুসলিম লীগের এই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন লীগ-ওয়ার্কিং কমিটিকে নির্দেশ দিচ্ছেন, উপরোক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে ভাবী সংবিধানের এমন একটি ছক তৈরী করে ফেলেন যাতে শেষ পর্যন্ত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি প্রয়োজনবোধে প্রতিরক্ষা বহির্বিষয়ক ব্যাপারে যোগাযোগ, শুল্ক ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ের সকল ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিতে পারেন।

ওই লাহোর-প্রস্তাবের স্মারক-দিবস হিসাবেই তেইশ মার্চ এতকাল বছর-বছর উদ্‌যাপিত হয়ে এসেছিল। এইবার 'স্বাধীন বাঙলা ছাত্র সংগ্রাম-পরিষদ' এবং 'স্বাধীন বাঙলা শ্রমিক সংগ্রাম-পরিষদ'-এর ডাকে পূর্ববাঙলায় প্রতিরোধ দিবস উদযাপিত হয়। কিসের ওই প্রতিরোধ এবং কার বিরুদ্ধে? ওই প্রতিরোধ পশ্চিমা শাসক-গোষ্ঠীর শোষণের বিরুদ্ধে। পাকিস্তান সৃষ্টির গোড়া থেকেই পশ্চিম-পাকিস্তান পদে পদে পূর্ববাঙলার ওপর অন্যায়-অবিচার করেছে, শোষণ চালাতে চালাতে পূর্ববাঙলার সমস্ত সম্পদ আজ তারা নিঙড়ে নিয়ে গেছে। তারা লাহোর-প্রস্তাবের সম্মান বার বার ক্ষুণ্ণ করেছে। তাই ওই দিনটি উদ্‌যাপনের সার্থকতা কোথায়? এই প্রতিরোধ-দিবস পালনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে ওই দিনকার সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা বলেছে: স্বাধীনতার নামে মানুষের স্বাধিকার হরণ যেমন লাহোর-প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য ছিল না, তেমনি সে-প্রস্তাবে দেশের সংখ্যা-গরিষ্ঠ অঞ্চলকে কলোনী বানাইবার ও তার কোটি কোটি মানুষকে ক্রীতদাসে পর্যবসিত করারও কোনো প্রস্তাবনা ছিল না। কিন্তু ক্ষমতা হাতে পাইবার পর হইতে শাসকগোষ্ঠী তেইশ বছর যাবৎ তাহাই করিয়াছে এবং সংহতির নামে দুই যুগ ধরিয়া গণশোষণ, নিপীড়ন ও স্বাধীনতা হরণকার্য চালাইয়াছে। একটা ভৌগোলিক অঞ্চল হিসাবে এদেশের মানুষ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির কথা সাতচল্লিশের চৌদ্দই অগস্ট শুনিয়াছিল বটে কিন্তু বাঙলার হতভাগ্য মানুষ সে-স্বাধীনতার কোনো স্বাদ ভোগ করিতে পারেন নাই। জনসংখ্যা-গরিষ্ঠ এই অঞ্চলের মানুষেরা স্বাধীনতার যে-অমৃত ভোগ করিয়াছে তাহা হইল নিপীড়ন, নির্যাতন, শোষণ ও বঞ্চনা। ঝুটা 'আজাদীর' এমনি মহিমা যে, বাঙলার বঞ্চিত, বিশীর্ণ মানুষের প্রতিবাদ জানানোর অধিকারটুকুও উহার কল্যাণে হৃত, লুণ্ঠিত হইয়াছে। বস্তুতঃ বাক্-স্বাধীনতাই হইয়াছে

নব্য ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর হস্তে ফার্স্ট ক্যাজুয়েলিটি এবং স্বাধীনতার মূল সনদ লাহোর-প্রস্তাব হইয়াছে উহাদের মেশিনগানের মুখ্য শিকার।’

তাই প্রতিরোধ দিবস পালনের ডাক দিয়েছেন ছাত্র এবং শ্রমিকরা। সেদিন শুধু শেখ সাহেবের বাড়ি এবং পল্টন ময়দানেই বাঙলাদেশের পতাকা উঠল না, পতাকা উঠল নিউ-সেক্রেটারিয়েট ভবনে, হাইকোর্ট ভবনে, টেলিভিসন ভবনে, ঢাকা বেতারকেন্দ্রে —সমস্ত সরকারি-বেসরকারি ভবনে। শেখ সাহেব সেদিন সকলকে পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত পাক সার জমিন ইয়ে সাদ বাদ’ গাইতে এবং পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন না করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সামরিক প্রশাসক চাপ দিলেন টেলিভিসিন কর্তৃপক্ষকে বলতে বলে তাদের ঘেরাও করে অনুষ্ঠান শেষে পাকিস্তানী পতাকা দেখাতে এবং জাতীয় সংগীত প্রচার করতে বললেন। শেখ সাহেবের নির্দেশও অমান্য করতে পারেন না। আবার সামরিক প্রশাসকদের নির্দেশ না মানলে প্রাণ যায়। টেলিভিসন কর্তৃপক্ষ পড়লেন মহা ফাঁপরে। শেষে অনেক ভেবে ভেবে তাঁরা এক কৌশল বের করলেন। যেখানে ১১টা ২৮ মিনিটে অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার কথা। অতিরিক্ত অনুষ্ঠান জুড়ে জুড়ে সময়টাকে সেখানে এগিয়ে নিলেন। অনুষ্ঠান শেষ করলেন বারোটা চার মিনিটে। অনুষ্ঠান শেষে ঘোষণা করলেন, ‘আজ ২৪ মার্চ, বুধবার। আমাদের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ হ’লো।’ তারপর আর অসুবিধা রইল না পাকিস্তানী পতাকা ওড়াতে। সেদিন শোকের চিহ্ন হিসাবে তারই পাশাপাশি কালোপতাকাও ছিল।

বিক্ষুব্ধ বাঙলার দশ দিগন্তে সর্বাত্মক মুক্তি-আন্দোলনের পটভূমিতে নয়া আঙ্গিকে আবির্ভূত তেইশ মার্চের অবিস্মরণীয় দিনে বন্যার স্রোতের মতো জনতার কাফেলা আসতে থাকে শেখসাহেবের

বাসভবনে। সেদিনকার জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণদান কালে স্বাধীনতার আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। যতদিন বাঙালির সার্বিক মুক্তি অর্জিত না হবে, যতদিন একজনও বাঙালী বেঁচে থাকবে, এই সংগ্রাম চলতেই থাকবে। মনে রাখবেন, কম রক্তপাতের মাধ্যমে যিনি চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন তিনিই সেরা সিপাহ্‌সালার। তাই বাঙলার জনগণের প্রতি আমাদের নির্দেশ—সংগ্রাম চালিয়ে যান। শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, সংগ্রামের কর্মপন্থা নির্ধারণের ভার আমার উপর ছেড়ে দিন।'

তিনি আরও বলেন, 'বাঙলার দাবির প্রশ্নে কোনো আপোস নেই। বহু রক্ত দিয়েছি, প্রয়োজনে আরও দেব, কিন্তু মুক্তির লক্ষ্যে আমরা পৌঁছবই। বাঙলার মানুষকে আর পরাধীন করে রাখা যাবে না। আমরা সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসাই চাই। কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বেঁচে থাকার লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রাম আমাদের চলতেই থাকবে। শোষক এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের কী ভাবে পর্যুদস্ত করতে হয় আমি জানি। অতুলনীয় ঐক্য, নজীর বিহীন সংগ্রামী চেতনা আর প্রশংসনীয় শৃঙ্খলা বোধের পরিচয় দিয়ে বাঙলার মানুষ আবার প্রমাণ করে দিল যে শক্তির জোরে তাদের আর দাবিয়ে রাখা যাবে না।'

সেদিন সকাল থেকে ছোটো বড়ো অন্তত: ৫৫টি মিছিল শেখসাহেবের বাসভবনে গিয়েছে। মহিলা মিছিলও ছিল ৬টা। সেদিন ভোরে ছাত্ররা প্রভাতফেরী করে; শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

কামরুল আলম খসরুর কথাতে আবার ফিরে যাচ্ছি।

খসরু বাঙলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন অগ্রণী সিপাহশালার।

ছাত্রলীগ জঙ্গীবাহিনীর প্রথমসারির নেতা এই খসরু। ডাকাবুকো ছেলে। দীর্ঘদেহী পুরুষোচিত বলিষ্ঠ চেহারা তাঁর। চেহারার মধ্যে একটা আভিজাত্যের ছাপ আছে। দেখলে কিন্তু মনেই হয় না এই ছেলে এমন দুর্ধর্ষ! আয়ুব-ইয়াহিয়ার চর তাঁর খোঁজে হন্যে হ'য়ে ফিরেছে। খসরু '৬৯ সালে ঢাকা নিউ মার্কেটের কাছে একজন পাকিস্তানী মেজরকে মেরে ফেলেছিলেন। খসরুরই অনুপস্থিতিতে তাঁর চোদ্দ বছরের সাজা হলো। কিন্তু কোথায় খসরু? কোথাও নেই। এই দেখা যায়, এই নেই।

একবার খসরুকে ধরবার জন্য মিলিটারি জহুরুল হক (ইকবাল হল) হল ঘিরে ফেলেছিল, খসরু তখন ভিতরেই ছিলেন। মিলিটারি আসার খবর শুনে খসরু তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেলেন। মিলিটারি এবং পুলিশ অফিসাররা দেখলেন। কিন্তু ছাদের কোথাও খসরুকে পাওয়া গেল না। প্রতিটি ঘর, আনাচ-কানাচ তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন তাঁরা। এমন কি ছাদের জলের ট্যাংকের ভিতরটা যে বেঅনেটে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখল সৈন্যরা। কিন্তু খসরু কোথায়ও নেই। পুলিশ এবং মিলিটারি চলে যাওয়ার সময় মন্তব্য করল, 'ও জরুর কুছ ম্যাজিক জানতা হ্যায়।' সৈন্য চলে যাবার পরই ভিজা কাপড়ে খসরু সাহেব নেমে এলেন। লুকিয়ে ছিলেন জলের ট্যাংকে। বেঅনেটের খোঁচাগুলি তাঁর দুপাশ দিয়ে চলে গেছে। গায়ে লাগে নি। খসরুসাহেব স্টেনগান মেসিনগান সবই চালাতে পারেন। সেই খসরুর কাছেই গাড়িতে যেতে যেতে শুনেছিলাম ২৫ মার্চ রাত্রের ঘটনা।

'শেখসাহেবের বাড়ি থেকে বেরিয়েই জীপ চালিয়ে আমরা জহুরুল হক (ইকবাল হলে) হলে এসে পৌঁছলাম। ক্যানটিনে

বসে আলাপ করছিলাম বন্ধুদের সঙ্গে। তখন ঠিক এগারোটা কুড়ি। গুলির আওয়াজ পেলাম। পাক-সৈন্য আমাদের ছাত্রাবাস ঘিরে ফেলেছে। আমরা বন্ধুদের আগেই সরে যেতে বলে ছিলাম। সেদিন কিছু একটা হবে আঁচ পাচ্ছিলাম। কিন্তু বড় রকমের অর্থাৎ যুদ্ধগোছের কিছু যে হতে পারে এ-আশঙ্কাই আমাদের মধ্যে দেখা দেয় নি। আমরা মোটামুটি নিশ্চিন্ত ছিলাম ইয়াহিয়া আমাদের দাবি মেনে নিয়েছেন। আমাদের নেতাদের সঙ্গে তাদের ঐক্যমত হয়েছে। ইয়াহিয়া বলেছিলেন, তিনি মার্শাল ল তুলে নেবেন এবং ইউনিট গুলির ক্ষমতা জনপ্রতিনিধিদের হাতে ফিরিয়ে দেবেন। সংবিধান না হওয়া পর্যন্ত তিনি কেন্দ্র এবং ইউনিটগুলির প্রধান থাকবেন। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন দুই-একদিনের মধ্যে দুই পক্ষে একটা একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। তাই বলতে গেলে আমরা একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। ইকবাল হলে সেদিন বিশেষ কিছু অস্ত্রও ছিল না। বেশির ভাগ ছেলেই সেদিন চলে গিয়েছিল। কয়েকজন নিরীহ ছেলে তখনো ছিল। তাছাড়া বয়, বেয়ারা, ক্যানটিনের স্টাফ কয়েকজন ছিল। আমাদের হাতে সেই মুহূর্তে অস্ত্র ছিল না। আমি আর মনির আরও কয়েকজন গোয়ালঘরে গিয়ে শুয়ে রইলাম মাটির সঙ্গে মিশে। ওরা এলোপাথাড়ি গুলি-গোলা ছুড়ে যাচ্ছিল তখন। পরের দিন দেখেছি ছাত্রাবাসের ঘরে ঘরে অনেক বন্ধুর নিষ্প্রাণ দেহ পড়ে রয়েছে। ছাদে উঠেছিল অনেকে; রেহাই পায় নি তারাও। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে জগন্নাথ হলের। ওখানকার মাত্র দু'জন ছাত্রই বাঁচতে পেরেছে। ওই ছাত্র দুটিকে দিয়ে ২৫-২৬ এই দুই মিলিটারিরা লাস টানিয়েছে। রক্তে হাত-পা মেখে গিয়েছিল। শেষে ওদের দাঁড় করিয়ে ফায়ার করে। ওরা ঠপাস্ করে মাটিতে পড়ে যায়। মিস ফায়ার হয়েছিল, ওরা কিন্তু মৃতের ভান করে পড়ে ছিল। মিলিটারিরা

চলে গেলে ওরা উঠে এলো। ওদের কি বাঁচাটা নেহাতই দৈবের যোগ। মর্টার দিয়ে দেওয়াল-কে-দেওয়াল উড়িয়ে দিয়েছে। স্টাফ কোয়ারটার থেকে ধরে এনে ইংরেজির অধ্যাপক জ্যোর্তিময় গুহঠাকুরতাকে নির্দয় ভাবে হত্যা করেছে। জ্যোর্তিময় গুহঠাকুরতা নাটক করতে খুব ভালোবাসতেন। ফুলও ভালবাসতেন। জগন্নাথ হলের মৌসুমী ফুলের বাগানের পিছনে জ্যোর্তিময়দার দান আছে। জগন্নাথহলের ছেলেদের কাছে জ্যোর্তিময়দার খুব নামডাক। বর্বরেরা ভাবী এবং তাদের একমাত্র মেয়েকেও রেহাই দেয় নি। টেনে-হিঁচড়ে বাইরে এনে স্টেনগানের গুলিতে হত্যা করেছে। শুনেছি, ডক্টর গোবিন্দ দেবকে দিয়ে বর্বরেরা কবর খুঁড়িয়েছে। তারপর তাকে লাথি গুঁতো মেরেছে, পিটিয়েছে, শেষে গুলি করে মেরে ফেলে রেখেছে। পরের পরের দিন দেখা গেছে ইকবাল হল আর জগন্নাথ হলে সগু তাড়াহুড়ো করে গোর-দেওয়া মানুষের হাত-পা তখনো খানিক খানিক বেরিয়ে রয়েছে। কী পৈশাচিক দৃশ্য! ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। খবরের কাগজে দেখেছি জিন্নত আলী মারা গেছেন। জিন্নত আলী ছিলেন ইকবাল হলের সহসভাপতি। সৈন্যরা আক্রমণ করলে তিনি তাড়াতাড়ি কয়েক জনকে নিয়ে গ্যারেজের ছাদে গা মিশিয়ে শুয়ে থাকেন। একদিন এক রাত্রি ওমনিভাবে ছিলেন। তৃতীয় দিন শেষে আস্তে আস্তে নেমে আসেন অমনি একজন মিলিটারির হাঁক শোনা গেল: 'কোন্ হ্যায়।'

তাঁরা কাঁপতে কাঁপতে সামনে এগিয়ে এলেন।

সৈন্যটি ছিল বেশ বয়স্ক এবং পাঠান। সে জিজ্ঞেস করল 'ইধার কেয়া কর্ রহা হ্যায়?'

ডক্টর আলী বললেন, 'হামলোগ ইদারহি রহেতা হ্যায়।'

'ইধার কুই হিন্দুলোক হ্যায়?'

একজনের উত্তর, 'নেহি তো। হামলোগকো সব হি কা খৎনা হ্যায়।'

অতঃপর বুড়ো সৈন্যটি প্রত্যেককে ন্যাংটো করে দেখলেন তারা মুসলমান কিনা। কেননা তাদের বলা হয়েছে ভারতীয় হিন্দু অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকে গেছে ঢাকায় প্রচুর। তাঁদের সবাইকে শেষ করতে হবে। আশপাশে যেসব লাশ পড়ে ছিল সৈন্যটি সেগুলোকে কুড়িয়ে এক জায়গায় সার দিয়ে রাখতে বলল। জিন্নত আলী সুদ্ধ সবাইকে দিয়ে ওই কাজ করিয়ে নিল সৈনিকটি।

তারপর সৈন্যটির মনে কী ভাবের উদয় হয়েছিল কে জানে হঠাৎ বলল, 'যাও, জলদি জলদি ভাগ্ চলো, আভি আভি ক্যাপেটন সাব চলা আয়েগা।'

বেঁচে গেলেন তাঁরা।

তাছাড়া ২৮ মার্চ নজরুল তাঁকে দেখেছে হলের সামনে। খালি পা। পাজামা পাঞ্জাবি পরনে। বগলে একটা পুটলি। নজরুলের কাছে সেণ্ডেল চাইছিলেন। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী সম্ভবত বাড়ি ছিলেন না। মনিরের ভাই হন অধ্যাপক হায়দার। মনির তো বলছে হায়দার সাহেব আগেই স্টাফ কোয়ারটার ছেড়ে গুলসানের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। তাই তিনিও সম্ভবত জীবিতই আছেন। আমিও সেই রাতে নেহাৎ বরাত জোরে বেঁচে গেছি। ইয়াহিয়ার চরদের আমার ওপর তীক্ষ্ণ নজর আমি জানি। তাই রাতে ইকবাল হলে থাকতাম দিন কয়েক ধরে। ওরা অতর্কিত হানা দিতে পারে এরকম একটা আশঙ্কা আমার ছিল। তাই রাতটা আমি কাটাতাম জগন্নাথ হলে। হলের সরস্বতী প্রতিমা যেখানটায় রাখা ছিল আমি সেখানেই থাকতাম। প্রতিমার পিছনটায়। আমাদের ধারণা ছিল ওরা প্রতিমা ছুঁতে সাহস পাবে না। ভাগ্যিস সেদিন জগন্নাথ হলে থাকি

নি। জগন্নাথ হলে সবচেয়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ড হয়েছে। জগন্নাথ হলের ছেলেরা হলেই ছিল। ওরা ভেবেছিল, আমাদের আর কী করবে? নেতৃস্থানীয় দুএকজন যারা ছিল তারা অবশ্য সরে পড়েছিল। শুনেছি ডক্টর গোবিন্দ দেব ছেলেদের পক্ষ হয়ে সামরিক অফিসারদের কাছে কিছু অনুরোধ জানাতে এসেছিলেন। তিনি এখন বর্তমানে যদিও হলের প্রভোস্ট নন, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা প্রভোস্ট, তবু তিনি এসেছিলেন। দীর্ঘদিন এই হলের প্রভোস্ট ছিলেন। ছেলেদের অমনভাবে মারতে দেখে তিনি স্থির থাকতে পারেন নি। ছুটে গিয়েছিলেন। ওখানে না গেলে হয়ত বেঁচে যেতেন। জগন্নাথ হলের হাউস টিউটর সন্তোষবাবুও সম্ভবত নিহত হয়েছেন। মধুদা জগন্নাথ হলে থাকত। সপরিবারে নিহত হয়েছে। একটি বাচ্চা মেয়ে বেঁচে রয়েছে শুধু।

২৮ মার্চ জীপ চালিয়ে গিয়েছিলাম পুরনো ঢাকায়। যেতে যেতে পথের দু'পাশে দেখেছি জ্বালানো-পোড়ানো দোকান বাড়ি। কোথাও দেখেছি শেলিং-এর চিহ্ন। কোথাও দেখেছি বুলেটের চিহ্ন। আমি শাঁখারি বাজারের কাছ দিয়ে যেতে দেখলাম, একদল অবাঙ্গালী মুসলমান লুটতরাজ করে চলেছে। ওদের অনেকেই আমাকে চেনে। দেখলাম হৈ-হৈ করে ছুটে আসছে একটা দল আমাকে ধরবার জন্য। আমি খুব জোরে জীপ চালালাম শাঁখারিবাজার দিয়ে। জগন্নাথ কলেজের ওখান থেকে শাঁখারি বাজারের পুরনো পুরনো বাড়িগুলোর ওপর সৈন্যরা মর্টার দাগিয়েছে। ঝুর ঝুর করে ভেঙে পড়ে গেছে সেইসব বাড়ি। ল্যাম্পপোস্টও ধ্বসে গেছে। তার ঝুলে রয়েছে, খুলে রয়েছে রাস্তা জুড়ে। হঠাৎ আমার জীপের চাকায় একটা তার জড়িয়ে গেল। আমি লাফিয়ে নেমে দ্রুত তার খুলতে থাকলাম। দাঙ্গাবাজরা তখন খুব কাছে এসে গেছে।

মুহূর্তে জীপে লাফিয়ে উঠে খুব জোরে জীপ চালালাম। পথ না পেয়ে কয়েকটা লাশের ওপর দিয়েই জীপ চালিয়ে এসেছি। ওখানটায় আমি কম করেও তুশ-আড়াইশ লাশ পড়ে থাকতে দেখেছি। কোনো-কোনো লাশ দেখেছি তারের সঙ্গে ঝুলে রয়েছে তখনো।

আমরা গোড়ায় অলি-গলি থেকে সৈন্যদের দিকে গুলি ছুড়েছি ৩০৩ রাইফেল দিয়ে। কিন্তু তার ফল ভালোর চেয়ে খারাপই হয়েছে। যেখান থেকেই গুলির আওয়াজ পাওয়া গেছে সেখান-কার লোকদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। আমরা এই পথ ছেড়ে দিলাম। এতে আমাদের অনেক নিরীহ লোক মারা যাচ্ছে। আমরা তখন ঢাকা ছেড়ে দিয়ে জিন্‌জিরায় গিয়ে আস্তানা গাড়লাম। সেখান থেকে আমাদের লড়াই চালালাম দিন-কয়েক। ওরা শেষে জিন্‌জিরা ধ্বংস করে দিল দূরপাল্লার কামান দেগে, মেসিনগান আর রাইফেলের গুলি ছুড়ে। জিন্‌জিরায় কম করেও বিশ থেকে ত্রিশ হাজার লোক মারা গেছে।"

খসরুসাহেব এখন রণাঙ্গনে রণাঙ্গনে যুদ্ধ করে বেড়াচ্ছেন।

জিন্‌জিরা বাজারের একটা দোতলা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন ছাত্রনেতা সাজাহান সিরাজ। সঙ্গে ছিলেন জঙ্গীবাহিনীর আর একজন প্রথমসারির কর্মী নজরুল ইসলাম এবং তাঁদের অন্য একজন বন্ধু। নজরুল মুন্সীগঞ্জের ছেলে। মাঝারি গড়নের বলিষ্ঠ চেহারা তার। জগন্নাথ কলেজের ছাত্র ছিলেন নজরুল ইসলাম। সাজাহান সিরাজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। ল পাশ করে পলিটিক্যাল ফিলোসফি পড়ছেন। টাঙ্গাইলের ছেলে। তুজনের সঙ্গেই আলাপ হলো। এক রাতে বসে বসে

নজরুলের কাছ থেকে অনেক কিছু শুনলাম। নজরুলকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কী করে জিন্‌জিরা থেকে এলেন? ওখানে তো শুনলাম প্রচণ্ড শেলিং হয়েছে। নজরুল বললেন, 'দাদা, ঠিকই শুনেছেন। পাক সৈন্যরা ২ এপ্রিল খুব ভোরে শেলিং শুরু করে। ওরা নদীর ওপার থেকেই শেষ রাতের দিকে নদীর এপাড়ে এসে জড়ো হয়। ভোর পাঁচটা নাগাদ মর্টার দাগতে শুরু করে। সেই সঙ্গে হেভি মেসিনগানের গুলি চলায়। পরে বোমাও ফেলে। আমরা ওখান থেকেই মুক্তিযুদ্ধ চালাচ্ছিলাম। আমরা একটা দোতলা ঘরে ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ শেলিং-এর প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ধড়ফড় করে উঠে পড়লাম। পাশের বাড়িতে গোলা পড়েছে। থর-থর করে কেঁপে উঠেছিল আমাদের দোতলাটা। যে যে-কাপড়ে ছিলাম সেই অবস্থায়ই দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়লাম নিচে। কানের পাশ দিয়ে শিসের মতো আওয়াজ তুলে সাঁই-সাঁই গুলি বেরিয়ে গেল। ঝুপ্‌ করে মাটিতে শুয়ে পড়লাম তিনজনে। তারপর বুকে ভর দিয়ে একটু-একটু করে এগিয়ে গেলাম। নিরাপদ দূরত্বে কিছুটা গিয়ে একটা শুকনো নালার মতো পেলাম। তাতে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমার পরনে ছিল প্যান্ট আর গেঞ্জি। ওই অবস্থায়ই চলে এসেছি। জামা-কাপড় টাকা-পয়সা ব্যাগ সব ওই দোতলায়ই ফেলে এসেছি। ওখান থেকে আমরা এলাম সিরাজ দিঘা। খুঁজে বের করলাম আমাদের সমর্থক একজন মেয়ের বাড়ি। নামটা তাঁর আপাতত উহ্য থাক। ওখানে একটা রাত কাটিয়ে চললাম ফরিদপুরের দিকে। সিরাজ দিঘা থেকে একটি লোক আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ফরিদপুর। ফরিদপুর মুক্ত অঞ্চল। ওখানে অনেক আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একটা জীপ ওখান থেকে আমাদের পৌঁছে দিল

রাজবাড়ি। আমাদের পরিচয় পেতেই রাজবাড়ির স্টেশন-মাস্টার আমাদের জন্য একটা ইঞ্জিনের ব্যবস্থা করে দিলেন। ইঞ্জিনে চড়ে কুষ্টিয়া এলাম।

১৬ এপ্রিল ঢাকা থেকে প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা শ্রীভবেশ নন্দী এসেছেন। এক সময় তিনি পূর্ববঙ্গে পরিষদ-সদস্য ছিলেন। থাকতেন ঢাকার র‍্যাংকিন স্ট্রীটে। 'আমার দেশ' বলে একটা পত্রিকারও সম্পাদক তিনি। তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শুনলাম। তিনি বললেন, 'পঁচিশ তারিখ রাতে আমি বিশেষ কিছু বুঝতে পারিনি। আমাদের দিকে সৈন্যরা আসেনি। ২৬ তারিখ সকালে কিছু-কিছু খবর শুনলাম। খুবই নির্ভরযোগ্য সূত্রে কয়েকটা খবর পেলাম। জানেন তো, ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ড। ২৫ তারিখ রাত্রে যে-কয়জন ট্যাক্সি-ড্রাইভার ছিল সেখানে, সৈন্যরা তাদের গুলি করে মেরেছে। ভিক্টোরিয়া পার্কের নাম হয়েছে এখন বাহাদুরশাহ পার্ক। আর একটা পাকা খবর পেলাম। ফরাসগঞ্জে সৈন্যরা সাইন্স লেবরেটরির ডক্টর হরিনাথ দের বাড়ি চড়াও করে হরিনাথ দে এবং আরও ১৩ জনের মতো লোককে দিনের বেলা গুলি করে হত্যা করেছে। মেয়েদের অবশ্য মারে নি। হরিনাথ দে-কে কেন মারল জানি না। আমেরিকা-ইংলণ্ডের যে-সব সাহেবরা সম্প্রতি রাস্তায় রাস্তায় হরিনাম করে বেড়ান এবং বক্তৃতা দেন শ্রীদে তাঁদের সঙ্গে থাকতেন এবং তাঁদের ইংরেজি বক্তৃতার বাংলা তর্জমা করে লোককে শোনাতেন। আমার মনে হয়, সেইসব দেখেশুনে ইয়াহিয়ার লোক শ্রীদেকে চর-টর ভেবেছিল। তাই বোধহয় হত্যা করেছে। কিংবা একজন বুদ্ধিজীবী বলেও হত্যা করে থাকতে পারে।

আমার কয়েকটা বাড়ি পরেই একজন ব্যাংকের ম্যানেজার

থাকেন। মুসলমান ভদ্রলোক। তাঁর সঙ্গে আমার বেশ আলাপ ছিল। আমি তাঁকে দেখে মেয়েদের ছাদে নিয়ে ছাদে ঢোকার দরজার বাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে দিতে বললাম। যাতে ওরা এলেও মনে করে কেউ বাড়ি নেই। আমি নিজেও আপত্তিকর কাগজপত্র যা-ছিল সব পুড়িয়ে ফেললাম। কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। সোমবার দিন অর্থাৎ ২৯ মার্চ দশটা নাগাদ আমি ওই পাড়ায়ই আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ি গেলাম। উদ্দেশ্য, পরামর্শ করা। ওঁর বাড়িতে বসে কথা বলছি, আমার চাকর এসে খবর দিল, মিলিটারি পাড়ায় ঢুকেছে। আমার ঘরে ঢুকে তছনছ করে ফেলছে সবকিছু। তাছাড়া অবাঙ্গালীরা দাঙ্গাও শুরু করে দিয়েছে। উত্তর মৈষণ্ডি এবং দক্ষিণ মৈষণ্ডিতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল বাঙালী বাড়ি ঢুকে ঢুকে অবাঙ্গালী মুসলমানরা আগুন লাগিয়েছে, ছুরি মারছে, লুঠ করছে। একটা আতঙ্ক আমাকে গ্রাস করে ফেলল। বাড়ি ফিরে আর লাভ নেই। আমি ভাবলাম, চেক-টেক লুঠেরারা নিশ্চয়ই নিয়ে নেছে। ব্যাংকে গিয়ে বলে আসি একবার। হাবিব ব্যাংকে আমার একাউন্ট ছিল। হাবিব ব্যাংক সদরঘাটে। আমি টিকাটুলি হয়ে শামিবাগ কলতাবাজার হয়ে ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে পৌঁছলাম। দেখলাম লোকজন নেই। থম থম করছে চারদিক। ব্যাংকে গিয়ে দেখলাম, ব্যাংক বন্ধ। শাঁখারিবাজারের ওখানে দেখলাম অনেক লাশ পড়ে রয়েছে। সেণ্ট গ্রেগরি স্কুলে অনেক লোক আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের মধ্যে থেকে সকল পুরুষদের ধরে এনে এনে জগন্নাথ কলেজের সামনে লাইন করে দাঁড় করিয়ে মেসিনগান দিয়ে গুলি করে মেরেছে পাক-সৈন্যরা। তাদের সংখ্যা ছশোর মতো হবে। ব্যাংক বন্ধ দেখে ফিরে এলাম র‍্যাংকিন স্ট্রীটে। পরে একটা বেবিট্যাক্সি নিয়ে চলে গেলাম ডেমরা। নদী পার হয়ে গেলাম নরসিংদীতে।

রাস্তায় যেতে যেতে দেখেছি, লোকেরা সেখানে বাধা দেবার জন্তে তৈরী হচ্ছে। সকলেই খুব উত্তেজিত। ওখানে পাক-সৈন্ত তখনো যায় নি। ২ তারিখ দুপুরে আমি যখন নরসিংদী ছেড়ে লঞ্চে উঠলাম, দূর থেকে দেখলাম পাকিস্তানী বিমান নরসিংদী বাজারে বোমা ফেলছে। দাউ-দাউ করে জ্বলছে আগুন।

নরসিংদীর একজন বাসিন্দার সঙ্গে দেখা হলো। শুনলাম ২৮ তারিখ থেকে নরসিংদীতে বোমাবর্ষণ শুরু হয়। একটা বোমা ফেলে.ছিল কলেজ লক্ষ্য করে। বোমাটা সামনের পুকুরে গিয়ে পড়েছে। আর-একটা ফেলেছিল ফায়ারবিগ্রেড লক্ষ্য করে। একটা গোরু মরেছে। সেটাও সরে গিয়ে পড়েছে, ফায়ারবিগ্রেডের ক্ষতি হয়নি। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে নরসিংদী বাজার। বাজারে পাকিস্তানী বিমান থেকে প্রথমে পেট্রোল ছড়ায়। তারপর বোমা ফেলে। বোমা পড়ে চাউল-পট্টিতে। বাজারের কয়েকশ' ঘর জ্বলে গেছে। পাক-সৈন্তরা বিমান থেকে মেসিনগানের গুলিও চালিয়ে ছিল। তাতে লোক মারা গিয়েছিল ষোল-সতের জন। লোক বেশি মারা যায় নি সেখানে। কারণ, লোকজন আগেই দূরে, গাঁয়ের দিকে সরে পড়েছিল। পরে পাকসৈন্ত · গীসৈন্ত নামায় নরসংদীতে।

ঢাকার ছাত্র সিরাজুল কাদেরের ডাইরী থেকে এবার খানিকটা তুলে দিচ্ছি: ২৫ মার্চ রাত তিনটে নাগাদ ক্রমাগত গুলির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো নবাবপুর এলাকার দিকে গুলি চলছে। বাইরে বেরিয়ে দেখি দূরে আগুনের লেলিহান শিখা। মধ্য ঢাকার দিকে। সারারাত ঘুম এলো না। একটা আতঙ্ক আমাকে গ্রাস করে ফেলেছে। ভোর-ভোর গুলির শব্দ কমে আসতে লাগল।

তখন ভোর পাঁচটা। আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে। আমার নজরে পড়ল দু'একটা জায়গায় তখনো ধোঁয়া উঠছে। আরও খানিক অপেক্ষার পর কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করে ঘটনা পর্যবেক্ষণের জন্য বের হলাম। পথে এক জায়গায় দেখলাম, রক্তের টানা দাগ। কোনো রক্তাক্ত মানুষকে হিঁচড়ে নিয়ে গেলে যেমনটা হয়। বাংলাবাজারে আসতেই টায়ার পোড়ার গন্ধ পেলাম। এগিয়ে গেলাম, বাহাদুর শাহ পার্কের (ভিক্টোরিয়া) দিকে। যেতেই দেখলাম, তিনটি প্রাইভেট বাস জ্বলছে। প্রায় পুড়ে গেছে। বাসগুলোর কাছেই মাটিতে পড়ে রয়েছে তিন জনের মৃতদেহ। আগুনে দুজনের পরনের লুঙ্গি তখনো অল্প অল্প পুড়ছে। একজনের দেহ পুড়ে কাঠকয়লা হয়ে গেছে। কী বীভৎস দৃশ্য! এই প্রথম এমন দৃশ্য দেখলাম, মাথাটা এক মুহূর্তে গুলিয়ে উঠল। পার্কের আশে-পাশে কোনো লোকজন নেই। খাঁ খাঁ করছে সমস্ত রাস্তাটা। হঠাৎ একদল রিক্সাওয়ালা এগিয়ে এলো। আমার কাছে এসে নামল। মৃতদেহগুলো আমরা দুজনে কাছাকাছি একটা জায়গায়, একটু আড়ালে সরিয়ে নিলাম। রিক্সাওয়ালাই আমাকে সেখানে নিয়ে গেল। সেখানে আরও সাতটি লাশ ছিল।

পাটুয়াটুলিতে দেখলাম, অমৃত বস্ত্রালয় পুড়িয়ে দিয়েছে, কাপড়-চোপড় লুঠে নিয়ে নিয়েছে। আটটায় কার্ফু দেওয়া হলো, চলে এলাম বাসায়। ২৭ তারিখ আবার কিছুক্ষণের জন্য কার্ফু তুলে নেওয়া হলো। সেদিন লোহার পুলের কাছে দেখলাম কয়েকটি লাশ। সেদিনই পোটলাপুঁটলি হাতে বহু লোককে ঢাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতে দেখলাম। সকলেই প্রাণভয়ে গ্রামের দিকে ছুটছে। মুখে আতঙ্কের চাপ।

২৮ মার্চ ডেমরা ট্যানেলের কাছে পাঁচ-ছটি লাশ। লোকের মুখে

খবর পেয়েছি হাজারিবাগ, নবাবগঞ্জ, ফার্মগেট, জিনজিরা, লেকরোজ-বাগ, ডাকপাড়া, তেজগাঁর নাখোল পাড়া, ইত্যাদি স্থানে পাক সৈন্যরা ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, বহুলোককে গুলি করে হত্যা করেছে।

ইয়াহিয়া-টিক্কাখানের বিশেষ পরিকল্পিত অভিযানটি প্রথম শুরু হয় ২৫ মার্চ, মাঝ-রাত্তিরে। হঠাৎ-ঘুম-ভাঙা ঢাকার মানুষ ছাদে দাঁড়িয়ে ভীত ফ্যাকাশে মুখে ভয়-বিহ্বল চাহনি নিয়ে দেখেছে পশ্চিমা সৈন্যদের নৃশংস ধ্বংসযজ্ঞ। যেদিকেই তাকিয়েছে, চোখে পড়েছে শুধু আগুন আর আগুন। ধোঁয়া আর ধোঁয়া।

সেদিন রাত সাড়ে নটা পর্যন্তও ঢাকার অবস্থা ছিল স্বাভাবিক। জিন্নাহ্ এভিনিউ (ঢাকার ছাত্ররা প্রস্তাব নিয়েছে জিন্নাহ্ এভিনিউর নামকরণ হবে সুভাষ এভিনিউ, সূর্যসেন এভিনিউ নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জিন্না হল হয়েছে সূর্যসেন হল।) এবং নিউ মার্কেটে রোজকার মতোই লোকজন চলাচল করেছে নিশ্চিন্তে। বাস চলেছে, গাড়ি চলেছে রোজকার মতোই বনেটে কালো পতাকা লাগিয়ে। তখনও চৈতালি হাওয়ায় সেক্রেটারিয়েট ভবনের শীর্ষে বাংলা দেশের পতাকা উড়ছিল। পতাকা উড়ছিল হাইকোর্ট ভবনে, ঢাকা বেতার-কেন্দ্র এবং ঢাকা টেলিভিসন-কেন্দ্রে। রাত সাড়ে নটার পরে-পরেই মিলিটারি জীপ চলাচল শুরু হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা অস্বাভাবিক মনে হয়নি ঘরে-ফেরা ঢাকাবাসীদের কাছে। কারণ, মার্শাল ল' তো রয়েছেই। রাত এগারোটায় টিক্কা খানের নির্দেশে কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্ট থেকে শুরু হলো যথার্থ সৈন্যাভিযান। ট্রাক-ট্রাক সৈন্য শহর অভিমুখে ছুটল। হাতে তাদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র—লাইট মেসিনগান, স্টেনগান এবং রাইফেল। জীপে

নিতে দেখা গেল রিকয়েললেস গান এবং মিডিয়াম মেসিনগান। একটি খবরে প্রকাশ, প্রথম দফায় টিক্কা খানের নির্দেশে ঢাকায় তিন ব্যাটেলিয়ন সৈন্য নামে। তাদের সঙ্গে ছিল এক স্কোয়াড্রন গোলন্দাজ-বাহিনী।

সৈন্যরা প্রথমেই অবরোধ করল তেজগাঁর ইণ্টার উয়িং বিমানবন্দর এবং নবনির্মিত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। বিমানবন্দর দু'টি সৈন্যরা ঘিরে রইল। সেখানে ৩৭ এম. এম. গান লাগানো আরমারড কারও দেখা গেল। বিমানবন্দরের পর সৈন্যরা একে একে ঢাকা বেতারকেন্দ্র, ঢাকা টেলিভিসন-কেন্দ্রের দখল নিল। ওখানে দুই-চারজন কর্মচারী যা-ছিল তাদের দিয়ে ভবনের মাথা থেকে বাঙলা দেশের পতাকা নামিয়ে এনে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। সেনাবাহিনী এগিয়ে চলল শাহাবাগ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার দিকে। যেতে যেতে পথে একদল সৈন্য 'পিপল' পত্রিকার অফিস পুড়িয়ে ছারখার করে দিল। পিপল পত্রিকার সম্পাদক আবিদুর রহমান। বার্তা-সম্পাদক সোহ্‌বান সাহেব। শোনা যায়, সৈন্যরা সোহ্‌বান সাহেবের চোখ উপড়ে নিয়েছে। 'পিপল' ছিল সরকারের সবচেয়ে কট্টর সমালোচক। ঢাকার ছাত্রেরা বলে, অন্যান্য পত্রিকা, এমন কি ইত্তেফাক যা ছাপতে চাইত না, একমাত্র 'পিপল' নির্বিচারে তা ছেপে যেত, সেই বিবৃতি বা খবর যত মারাত্মকই হোক না কেন। আর একদল গেল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরি পেরিয়ে ফুলার রোড ধরে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। আর একদল গেল হাইকোর্টের ধার দিয়ে কার্জনহলের দুই পাশ দিয়ে। কিছুটা গিয়েই বাধা পেল সৈন্যরা। রাস্তায় রাস্তায় অসংখ্য ব্যারিকেড তৈরী করা হয়েছে। বিভিন্ন হল থেকে ছাত্ররা প্রথম বাধা দিল। হাত বোমা ছুড়ল। ৩০৩ রাইফেলের গুলি ছুড়ল। ওদিকে সৈন্যদের স্টেনগান সাব-মেসিনগানের গুলি

এসে পড়তে লাগল হলগুলোতে। বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি মেসিনগানের গুলিতে তছনছ হলো। বৃটিশ কাউন্সিলের ওপর দিয়ে সৈন্যরা তখন পাশের সলিমুল্লাহ্ হলে ঢুকে পড়েছে। ছাত্ররা ছাদ থেকে, ঘরের জানালা থেকে ৩০৩ রাইফেল আর ১২ বোরের বন্দুকে প্রতিরোধ করল সেনাবাহিনীর। প্রতিটি ছাত্রাবাসে চলল ছাত্র, আর সৈন্যে অসম লড়াই। পাক-ফৌজ ট্যাংক নিয়ে এলো। ট্যাংক দিয়ে সরালো ব্যারিকেড। ৭৫ এম. এম. মর্টার থেকে গোলা বর্ষণ শুরু করল সৈন্যরা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনে, ছাত্রাবাসগুলিতে। প্রচণ্ড গোলা আর মেসিনগানের মুখে ছাত্ররা আর কতক্ষণ দাঁড়াবে। পিছু হটার পথও বন্ধ। তারা শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করল পশ্চিমা সৈন্যদের। যারা তখন গুলিতে মারা যায়নি ছাত্রাবাসের ঘরে ঘরে ঢুকে, চৌকির নিচ থেকে চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে মাঠের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়ে মেসিনগান দিয়ে গুলি করেছে। সব ছাত্রই যে লড়াই করেছে তা নয়। কিন্তু যারা লড়াই করেনি, তারাও রেহাই পায়নি। নির্বিচারে হত্যা করেছে সকলকে। তবে অনেক ছাত্রই আগে থেকে আঁচ পেয়ে হল ছেড়ে চলে গিয়েছে। এগিয়ে গেল একদল সৈন্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে শহীদ মিনার এবং মেডিকেল কলেজের দিকে। বর্বর সৈন্যের বুলেটের আঘাতে ভেঙে চুর-চুর হল শহীদ-মিনারের সুন্দর লাল কাচের আর্চগুলি, যেন ফোঁটায় ফোঁটায় জমাট-বাঁধা রক্ত ছড়িয়ে পড়ল মিনারের চত্বরে। শহীদ রফিক-শফিক-বরকত-সালামের রক্তাক্ত হৃদয় আবার গুলিবিদ্ধ হ'লো। ১৯৫২ সালের ফেবরুয়ারিতে বাংলা ভাষার মর্যাদা আদায়ের জন্য মুসলিমলীগের পুলিসের গুলিতে ওরা প্রাণ দিয়েছিল। তাদের স্মৃতির বেদী এই মিনার। ঢাকার ছাত্ররা ওই মিনারের পাদদেশে দাঁড়িয়েই নতুন সংগ্রামের শপথ

নেয়। পূর্ববাঙলার ছেলেমেদের সংগ্রামের প্রেরণা, আত্মত্যাগের প্রেরণা ওই মিনার! এপার-বাঙলা ওপার-বাঙলার সাড়ে বার কোটি মানুষের পবিত্র তীর্থমঞ্চ ওই শহীদ বেদী। এই সেই শহীদ মিনার যেখানে দাঁড়িয়ে প্রতিটি একুশে ফেবরুয়ারি তারিখে শোষকের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার দীক্ষা নেওয়া হয়। তাই পাকিস্তানী সৈন্যরা মিনারের আর্চগুলি ভেঙেই নিবৃত্ত হলো না, ভিৎসুদ্ধ তুলে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য দেগে গেছে কামান। ক্ষত-বিক্ষত এবং অনেক গহ্বরে পরিণত হয়েছে শহীদ বেদী। বন্দিনী মাকে মুক্ত করার জন্য শত্রুর আধুনিক গোলা-গুলির মুখে অসম সাহসে লড়াই চালিয়ে বীরের মতো মৃত্যুবরণ করে চলেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। আজিমপুর গোরস্তান থেকে শহীদ মিনার পর্যন্ত যে শহীদ-সড়ক একুশে ফেবরুয়ারির পবিত্র দিনে আলপনায় আলপনায় ভরিয়ে তুলেছিল চারু ও কারু কলেজের ছাত্ররা, আজ তা রক্তে রক্তে লাল। একটি দুটি নয়, শ'য়ে শ'য়ে তাজা প্রাণের রক্তে রাঙা হয়েছে ওই পথ। যে-পথে শফিক-বরকত-জাব্বার প্রাণ দিয়েছে, যে-পথে আসাদ-মনিরুজ্জামান প্রাণ দিয়েছে, সেই পথ আজ হাজার ছাত্রের রক্তে হয়েছে ছয়লাপ। হায়, কত প্রতিভা, কত মনীষা ঝরে গেল পাক-সৈন্যের মেসিনগানের গুলি আর কামানের গোলার সামনে কে তার খোঁজ রাখে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস বিল্ডিং থেকে আজিমপুর গোরস্তান পর্যন্ত রাস্তার নতুন নামকরণ হয়েছে শহীদ-সড়ক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টসবিল্ডিং-এর ভিতরে আগুন জ্বলছে দাউ-দাউ। ধোঁয়া আর আগুন ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। শত্রুর গোলায় মেডিকেল কলেজের ইমারজেনসি রুম, নার্স কোয়ারটারেও মর্টারের শেল পড়েছে। অনেকে মারা গেছে সেখানে। উড়ে গেছে মধুর ঐতিহাসিক ক্যান্টিন। পূর্ববাঙলার

বিভিন্ন সংগ্রামের জন্ম হ'য়েছে ওই মধুর ক্যানটিনে। ওই মধুর ক্যানটিনে বসেই শেখ মুজিব, গাজিউল হক, অলি আহম্মদ, মোহম্মদ তোয়াহারা একদিন ভাষা-আন্দোলনের পরিকল্পনা করেছিলেন। ওইখানেই জন্ম নিয়েছিল '৫২, সালের গণ-আন্দোলন। ওই ক্যানটিনের সঙ্গে সিরাজুল আলম খান, মতিয়া চৌধুরী, রাশেদ খান মেনন, তোফায়েল আহম্মদ, সাইফুদ্দিন মাণিক, জামাল হায়দার, নূরে আলম সিদ্দিকী, সাজাহান সিরাজ, আবদুল কুদ্দুস মাখন, আবদুর রব, কামরুল আলম খসরু, দীপা দত্ত দীপক বড়ুয়া আরও অনেক অনেক বাঙলা মায়ের বীর ছেলেমেয়ের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে শেখ মুজিব থেকে শুরু করে অসংখ্য নেতার। আমাদের অনেক সকাল-দুপুর-সন্ধ্যার স্মৃতি-জড়ানো ওই ক্যানটিন আর নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা ঘেঁষে রাস্তায় কাছেই মধুর ক্যানটিন। ওই ক্যানটিন গুঁড়িয়ে দিয়ে ট্যাঙ্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ঢুকে পড়ল। ওখানেই ঘাঁটি করেছিল পাকসৈন্যরা। অধ্যাপকদের আবাসস্থলে ঘরে ঘরে ঢুকে হত্যা করেছে ডক্টর সারওয়ার খুরশিদ, ডক্টর মনিরুজ্জামান, অধ্যাপক আবদুর রেজ্জাক, ডক্টর মফিজুল্লাহ্ কবির, ডক্টর ইন্নস আলী আরও অনেককে অধ্যাপকদের পরিবারের লোকেরাও রেহাই পাননি। ঘুমন্ত শিশুদের বিছানায়ই মেরে রেখে চলে গেছে বর্বরেরা। এমন অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের নজির সাম্প্রতিক ইতিহাসে আছে বলে মনে হয় না। অধ্যাপক এবং ছাত্র খুনের এমন নজিরও সম্ভবত আর নেই। জনৈকা বিদেশিনী এক পাক অফিসারকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমরা নিষ্পাপ শিশুদের কেন মারছ? সৈনিকটি জবাব দিয়েছেঃ না হলে ওরাই যে একদিন তাদের মায়ের ভাইয়ের বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে। সৈন্যরা পরিকল্পিতভাবেই বাঙলাদেশের

সেরা-সেরা অধ্যাপককে হত্যা করেছে। ইয়াহিয়ার অভিমত: মুজিবকে মদত দিতেন অধ্যাপক, ছাত্র, সাংবাদিক এবং শিল্পীরা। এঁরাই হলেন পূর্ববাঙলার সমস্ত গণ-আন্দোলনের অগ্র-পথিক। তাঁদের নিশ্চিহ্ন করতে পারলে ভবিষ্যতে পূর্ববাঙলায় আর গণ-আন্দোলন দেখা দেবে না।

আর যদি তাদের পূর্ববাঙলা ছাড়তেই হয়, তাহলেও যাতে আগামী কয়েক বছর পূর্ববাঙলা দাঁড়াতে না পারে, তারই জন্য বুদ্ধিজীবীদের এই পাইকারি হত্যার আয়োজন। শুনছি বর্বর পাক-সৈন্যের বুলেট আর বেয়নট থেকে হাইকোর্টের বিচারপতিরা পর্যন্ত রেহাই পান নি।

যে-সব অধ্যাপক নিহত হয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন কৃতী এবং ঢাকার সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শোনা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ভার ছিল মেজর ইমামের ওপর। তার হাতে একটা তালিকা ছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ কোয়ারটারে ঢুকে তালিকা মিলিয়ে মিলিয়ে একে একে অধ্যাপকদের হত্যা করেছেন।

পাক-দস্যুরা বহু অধ্যাপক এবং ছাত্রকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরেছে। নিহতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি জগন্নাথ হল এবং ইকবাল হলে। জগন্নাথ হল এবং ইকবাক হলের আবাসিক ছাত্রদের খুব সামান্যই পাক-সৈন্যদের হাত থেকে বাঁচতে পেরেছে। জগন্নাথ হলের ছাত্রদের সকলেই হিন্দু। হলের মাঠে, বারান্দায়, ঘরে, সিঁড়িতে সর্বত্র কয়েকদিন পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল অনেক মৃতদেহ। রোকেয়া হল পর্যন্ত ওই একই দৃশ্য! রোকেয়া হলের মেয়েরাও প্রথম বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল, পারেনি। সৈন্যরা ভিতরে ঢুকে ঘরে ঘরে গিয়ে পলায়মান মেয়েদের ধরে ধরে নির্যাতন করেছে। ওই দৃশ্য দেখে অনেকেই

ছাদ থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ দিয়েছে। প্রকাশ, পঞ্চাশ জনের মতো মেয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। একশ'র মতো মেয়েকে পাক-সৈন্যরা ধরে নিয়ে গেছে কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে। জানি না, ওদের ভাগ্যে কী লাঞ্ছনা, কী নির্যাতন জুটছে। ওদের মাত্র কয়েকজন রাতের অন্ধকারে পালাতে পেরেছে বলে জানা যায়। রোকেয়া হলের সহ-সভানেত্রী ছিলেন আয়েশা খানম। রোকেয়া হলের প্রতিটি ছাত্রী তাঁর কথায় উঠত বসত। হলের নেত্রী ছিলেন মতিয়া চৌধুরী। আয়েশা তাঁরই উত্তরসূরী। অগ্নি-কন্যা মতিয়া চৌধুরীর মতোই দিন-কয়েক আগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তাঁর চোখে দেখা দিয়েছিল আগুনের ফুল্‌কি, শপথের দৃঢ়তা। জানি না, ওই পঞ্চাশজনের মধ্যে আয়েশাও আছে কিনা। এমনি আর একজন বীরাঙ্গনা ছাত্রী রোশেনারা। বুকে মাইন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে শত্রুর ট্যাংকের নিচে। নিজে মরেছে, কিন্তু শত্রুর একটি ট্যাংক ধ্বংস করে মরেছে। রোশেনারা আজ মরেও অমর। রোশেনারা ঢাকা উয়িমেন কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। শুধুমাত্র হাতবোমা সম্বল করেও বাঙলার দামাল ছেলেরা পাক-ট্যাংকের গতিরোধ করতে এগিয়ে গেছে শয়ে শয়ে। ডজনে ডজনে গুলি খেয়েছে, মরেছে, তবুও তারা ট্যাংকের ওপরে উঠে ভিতের নিক্ষেপ করেছে হাতবোমা। এমনি ভাবে মুক্তিফৌজের বীর ছেলেরা লালবাগ এলাকায় শত্রুর আরও তিনটি চীনা টি-৫৪ ট্যাংক ধ্বংস করেছে।

রোকেয়া হলের সবে-গড়া শহীদ মিনারটি ভেঙে গুঁড়িয়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে পাক-সৈন্যরা। এই বছরই শহীদ দিবসে বেদীটির উদ্বোধন করেছিলেন হলের প্রভোস্ট আক্তার ইমাম।

পাক-সৈন্যের সবচেয়ে বেশি আক্রোশ ছিল ইকবাল হলের ওপর। এই হলের নতুন নামকরণ হয়েছে জহুরুল হক হল। ঢাকার ছাত্রদের

কাছে সার্জেণ্ট জহুরুল হক ইকবালের চেয়ে অনেক বেশি শ্রদ্ধার। ইকবালের স্বপ্নের পাকিস্তানের সৈন্যদেরই হাতে ১৯৬৯ সালে শহীদ হয়েছিলেন সার্জেন্ট জহুরুল হক। শেখ মুজিবের মত তিনিও ছিলেন আগরতলা-ষড়যন্ত্র মামলার একজন আসামী। সার্জেণ্ট জহুরুল হককে আটক রাখা হয়েছিল তৃতীয় পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের ৪ নম্বর ব্যারাকে। ১৫ ফেব্রুয়ারি রাত চারটেয় ফ্লাইট সার্জেণ্ট জহুরুল হক ল্যাট্রিনে যেতে চাইলে রক্ষী ভোর হওয়ার আগে দ্বার খুলে দিতে অস্বীকার করে। সামরিক কাস্টোডিয়ান মেজর বেসেরের কিন্তু নির্দেশ ছিল, আসামীরা প্রয়োজনবোধে যে কোনো সময় ল্যাট্রিনে যেতে পারবেন। তর্কাতর্কির পর গার্ড হাবিলদার মঞ্জুর হোসেইন শাহ্ দরজা খুলে দিল বটে, কিন্তু সার্জেণ্ট হক এবং তাঁর এক সঙ্গী কয়েক পা এগুতে-না-এগুতেই মঞ্জুর হোসেইন পিছন থেকে গুলি করল তাঁদের। জহুরুল হক এবং তাঁর সঙ্গী লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। রক্তে ভেসে গেল জায়গাটা। সঙ্গী বাঁচলেন, কিন্তু জহুরুল হক মারা গেলেন। তাঁরই স্মরণে ইকবাল হলের নাম পাল্টে হলের নতুন নামকরণ হয়েছে জহুরুল হক হল। এবারকার সংগ্রামের কেন্দ্র ছিল জহুরুল হক হল। 'স্বাধীন বাঙলা ছাত্র সংগ্রাম-পরিষদ'-এর প্রধান কার্যালয় ছিল এই হলেই। কাজেই ইয়াহিয়া-টিক্কাখানের রুদ্ররোষ তো ওই হলের আবাসিক ছাত্রদের ওপর সবচেয়ে বেশি পড়বেই। ইকবাল হলে সৈন্যরা একেবারে বিনা বাধায় ঢুকতে পারে নি। ছেলেরা রাইফেল, বন্দুক আর হাত-বোমা দিয়ে কিছুক্ষণ লড়াই চালিয়ে গেছে মেসিনগান, মর্টার আর ট্যাংকের বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত ছাত্ররা ওদের রুখতে পারেনি। সৈন্যরা আধুনিক সমরাস্ত্র হাতে দলে দলে তিন দিক থেকে ঢুকে পড়েছে আবাসিক হলে। ঘরে ঘরে যাকে পেয়েছে তাকেই গুলি

করেছে। ঘরে ঢুকে ধরে নিয়ে এসেছে ছাত্র আর অধ্যাপকদের। যাঁরা ছাদে উঠেছিল প্রাণভয়ে, রেহাই পায়নি তাঁরাও। একটি খবরে প্রকাশ, জহুরুল হক হলের ২১ জন ছেলেকে মাঠের মধ্যে দাঁড় করিয়ে মেসিনগান দিয়ে গুলি করেছে পাক-সৈন্যরা। অধ্যাপকদেরও হত্যা করেছে ওরা। সামান্য দুই চারজন যাঁরা তখনও জীবিত ছিলেন তাঁদের দিয়ে কবর খুঁড়িয়েছে সৈন্যরা। বড়ো বড়ো গর্ত খুঁড়ে লাশগুলি কবর দিয়েছে যাঁরা, তাঁরাও রেহাই পাননি। কবর দেওয়া হয়ে গেলে তাঁদেরও গুলি করে হত্যা করেছে বর্বরেরা। তারা তাদের মারণযজ্ঞের কোনো সাক্ষীই রাখতে চায় না। পৃথিবীকে বোঝাতে চায়, ছ্যাখো, ঢাকায় কিছুই হয়নি। সবই ভারতের মিথ্যা রটনা।

সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল, ফজলুল হক হল, মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাস সর্বত্র ঢুকেছে পাকিস্তানী সৈন্যরা। পৈশাচিক আনন্দে নির্বিচারে ছাত্র আর অধ্যাপক নিধন চালিয়ে গেছে তারা সেই রাত্রে। ওই দিনকার মারণযজ্ঞের প্রথম বলি হয়েছিল সম্ভবত বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরির সামনেকার প্রহরারত ই. পি. আরের কয়েকজন বাঙালী।

বিদ্যালয় এলাকায় যে-সময় পাকসৈন্যরা দাগছিল কামান আর মর্টার, ছুঁড়ছিল রকেট এবং মেসিনগানের গুলিতে হত্যা করছিল নিরীহ, নিরস্ত্র ছাত্র আর অধ্যাপকদের, ঠিক ওই একই সময়ে সেনাবাহিনীর একটা বিরাট দল এগিয়ে গেছে রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাকের দিকে; আর একটা গেছে ই. পি. আরের হেড কোয়ারটার্স পিলখানার দিকে। দিন-কয়েক থেকেই নানান ছুতোয় তাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা চলছিল দেখে পুলিশ আর ই. পি. আরের লোকদের মনে সন্দেহ একটা দেখা দিয়েছিল। তারা বুঝতে পারছিল, কিছু একটা ঘটবে। কিন্তু কী রূপে, সেটাই জানত না

তারা। তারা ভেবেছিল, হয়তো মার্শাল ল' জোরদার হবে; ধরপাকড় হবে প্রচুর। কিন্তু পাক-সৈন্যরা আধুনিক সমরাস্ত্র নিয়ে যে সরাসরি যুদ্ধে নেমে পড়বে এটা ভাবেনি কেউ। তাই তাদের কাছে আক্রমণটা ছিল অতর্কিত। পাক-সেনাবাহিনী রাজারবাগের পুলিশ হেড-কোয়ারটার ঘিরে ফেলতেই সকলে লাফিয়ে উঠল। যে যেমন অবস্থায় ছিল, প্যান্ট অথবা লুঙ্গি পরা, গেঞ্জি অথবা শার্ট গায়ে, সেই অবস্থাতেই মুহূর্তে হাতে তুলে নিল রাইফেল। যে-কয়টা মেসিনগান ছিল তা নিয়ে একটা দল উঠে গেল ছাদে। অন্যেরা রাইফেল হাতে পজিসন নিল জানালায় জানালায়, অলিন্দে অলিন্দে। রাইফেল হাতে মোকাবিলা করল তারা সৈন্যদের। পুলিশরাও যে এমন নির্ভীক, এমন বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালাতে পারে সৈন্যরা আগে ভাবতেও পারেনি। ২৬ মার্চ বিকেল পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছিল বাঙালী পুলিশরা আধুনিক অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত পাক-ফৌজের একটা বিরাট বাহিনীকে। শেষটায় পাক-সৈন্যরা ব্যবহার করেছে রকেট, মর্টার আর ট্যাংক। পুলিশরা অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু মেরেছেনও অনেক।

১৩ এপ্রিল ঢাকার একজন ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হ'লো। সে নিজেই একজন মুক্তিযোদ্ধা। ঢাকারই ছেলে। পাক-সেনা যখন রাজারবাগ পুলিশ-ব্যারাক আক্রমণ করে, তখন তিনি ব্যারাকের খুবই কাছে ছিলেন। তাঁর মুখেই সেদিন পাক-সেনা কর্তৃক রাজারবাগ পুলিশ-ব্যারাক আক্রমণের নিখুঁত ছবি তুলে ধরছি। তাঁর কথা: '২২ মার্চই হঠাৎ একটা গুজব রটে যায় যে, পাক-সৈন্যের এক বিরাট-বাহিনী আজ ঢাকায় নামবে। ধরপাকড় এবং হত্যা দুই-ই তারা চালাবে। আমরা প্রস্তুত হ'য়ে রইলাম। কিন্তু কিছুই হ'লো না, তবু, কখন কী হয়—এই ভেবে আমরা মোটামুটি তৈরী হ'য়েই রইলাম। রাত জেগে, রাইফেল হাতে

ঢাকার পাড়ায় পাড়ায় পাহারা দিয়ে চলছিলাম কয়েকদিন ধরেই। ভোরে আবার রাইফেল ট্রেনিং নিতে যেতাম। কয়েক দিন খুবই খাটুনি পড়ে গিয়েছিল। তবু, উৎসাহে আমাদের ঘাটতি পড়েনি।

২৫ মার্চ বিকেলে খবর পেলাম, আজ একটা-কিছু হবে। আওয়ামীলীগ অফিস থেকে আমাদের তৈরী হয়ে থাকতে বলল।

'আমি তখন বন্ধুদের সঙ্গে রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাকের কাছে একটা বাড়িতে। পুলিশদের সঙ্গে কথা হয়েছিল তাঁরা সংকেত দেখালে আমরা তাঁদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাব। রাত সাড়ে এগারোটার দিকে দেখা গেল দুই দীর্ঘ সারিতে মিলিটারি জীপ আসছে। পিছনে মিলিটারি ট্রাক। জীপ রাজারবাগ পুলিশ-ব্যারাকের সামান্য দূরে এসে থামল। পুলিশ-ব্যারাকের সমস্ত আলো তখন নেভানো ছিল। জীপ থেকে জোরালো সার্চ-লাইটের আলো ফেলা হলো বাড়িটায়। সামনের সারি থেকে একজন মিলিটারি অফিসার মাইকে চীৎকারে করে বলল, 'ফো লাই।' সম্ভবত কথাটা 'ফলো লাইন'। একটু নীরবতা। আবার মিলিটারি অফিসারটি চীৎকার করে বলল, 'ফো লাই।' এবারে জবাব এলো পুলিশ-ব্যারাক থেকে। একসঙ্গে একরাশ রাইফেলের গুলি গিয়ে বিদ্ধ করল প্রথম সারির প্রায় সব কয়জন সৈন্যকে। পিছনের জীপ থেকে আবার চীৎকার শোনা গেল, 'ফো লাই।' উয়ি ওনট্ রিপিট ইট এগেইন।' পুলিশ-ব্যারাক থেকে কোনো সাড়া নেই। মিলিটারি জীপের সার্চ-লাইটের আলো নিভে গেল। অন্ধকার নেমে এলো। পর-মুহূর্তে রাতের নৈঃশব্দ খান্ খান্ করে দিয়ে একসঙ্গে গর্জে উঠল কয়েকটা মেসিনগান। টা-টা-টা-টা—এক নাগাড়ে চলল গুলি। পুলিশ-ব্যারাক থেকেও প্রত্যুত্তর এলো। গুলির শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ বাদে

ট্যাংকের ঘড়্ ঘড়্ আওয়াজ শুনলাম। ওগুলো দূরে মালিবাবাগের রাস্তায় দাঁড় করানো ছিল। ট্যাংকের শব্দে জানলার শার্সি-গুলো ঝন্ঝন্ করে কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল, সব কাঁচ এখনই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। ওরা ট্যাংক থেকে কামান দাগাল, রকেট ছুড়ল। দাউ-দাউ আগুন জ্বলে উঠল।

পুলিশ-ব্যারাক থেকে সংকেত আর আসেনি। আমরাও মাত্র কয়েকটি রাইফেল সম্বল করে এগিয়ে যেতে সাহস করিনি। তাতে কিছুই লাভ হতো না। আমরা শেষ রাত্রের দিকে চলে এসেছি। পুলিশরা বেশ কয়েক ঘণ্টা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেছে।

পরে জগন্নাথ হলে গিয়েছিলাম। দেখলাম এ্যাসেম্বলি হলের সামনে শহীদ-মিনারের সামনে মাটির নিচ থেকে তখনো অনেকের হাত-পা বেরিয়ে রয়েছে। কোনো মতে একটা গর্ত খুঁড়ে গোর দেওয়া হয়েছে অনেককে একসঙ্গে।

কী করে ঢাকা ছেড়ে যাব ভাবছিলাম। ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে গেলে সন্দেহ করবে সৈন্যরা। তাই তাদের সামনে দিয়েই চললাম। আমার হাতে ছিল একটা পাউডারের কৌটো। একটা বেবীফুডের শিশি, একটা ব্যাগ। রাস্তায় একজন সৈন্য পথ রুখল। 'কাঁহা যা রহা হ্যায় ?'

আমি বিনীত ভাবে উত্তর করলাম, 'ম্যায় কারখানা মে কাম করতা। ঘর যা রহা হ্যায়।' ছাত্র বলে পরিচয় দিলাম না ইচ্ছে করেই। তাহালেই নির্ঘাৎ বুলেটে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যেত।

ছোঁ মেরে হাত থেকে পাউডারের কৌটোটা নিয়ে বলল, 'ইসমে কেয়া হায় ?'

আমি আমতা আমতা করে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, এটা পাউডার। গায়ে মাখে। কিন্তু ব্যাটা কিছুই বুঝল না। তেড়েমেরে বলল, 'ইয়ে কিউ লেতা ?' বলেই পাউডারের কৌটোটা ছুড়ে

ফেলে দিল। বেবীফুডের শিশিটা এক নজর দেখে নিল। কিছু বলল না। ব্যাগ সার্চ ক'রে কোমরের বেল্টটা বের করে আনল। ওটাও নিয়ে নিল। তারপর ছাড়ল।

নদী পার হয়ে আরিচার বাস ধরলাম। কপাল ভালো, সেদিন একটা বাস পেয়ে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে এলাম আরিচা-ঘাট। আরিচা-ঘাটে নেমে খেলাম। জিনিসের দাম বাড়ে নি। সস্তায়ই খাওয়া হ'য়ে গেল। সেখান থেকে লঞ্চ পেলাম। লঞ্চের মাথায় উড়ছে পাকিস্তানী পতাকা। অনেকটা পথ যাওয়ার পর দূরে দেখলাম স্পীডবোট এবং লঞ্চে কিছু সৈন্য আসছে। ভাবলাম, পাকিস্তানী সৈন্য। ভয়ে সকলেই চুপসে গেল। এতক্ষণ পাকিস্তানী সৈন্যের মুণ্ডপাত করছিল সকলে। কিন্তু সারেঙ আশ্বাস দিয়ে বলল, 'ওনারা মুক্তি-ফৌজ। আপনাগো ডর নাই।' সারেঙ 'জয় বাংলা' বলে পাকিস্তানী পতাকা সরিয়ে লঞ্চের মাথায় বাঙলাদেশের পতাকা ওড়াল। বলল, 'আমরা মুক্ত-অঞ্চলে আইস্যা গেছি।' মুক্তিযোদ্ধারা আর কাছে এলেন না। ছাত্র পরিচয় দেওয়ায় লঞ্চের লোকেরা আমার কাছ থেকে আর ভাড়া নেয় নি। গোয়ালন্দ নেমে কুষ্টিয়া এলাম।'

রাজারবাগের মতোই পিলখানায় ই. পি. আর বাহিনী লড়াই চালিয়ে গেছে ৪৪ ঘণ্টা। ই. পি. আরের ছ'শো লোক শেষ মুহূর্তে পিছু হটে আওয়ামী স্বেচ্ছাবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়।

সৈন্যদের মর্টার আর কামানের গোলায়, রকেটে রাজারবাগ আর পিলখানার আশপাশের অনেক বাড়িই পুড়ে এবং ভেঙে গেছে। ওইসব অঞ্চলে দিন-তিনেক পর্যন্ত শুধু দেখা গেছে আগুন আর ধোঁয়া।

শুধু ছাত্র আর বুদ্ধিজীবীদের হত্যা ক'রেই ক্ষান্ত হয়নি

ইয়াহিয়ার সৈন্যরা। মধ্য ও পুরনো ঢাকার আবাসিক এলাকায়ও চালিয়েছে তাদের নৃশংস হত্যাযজ্ঞ। মধ্য-ঢাকার মালিবাগ, পুরানো পল্টনে বাড়ি বাড়ি ঢুকে কত লোককে যে মেরেছে সৈন্যরা তার ইয়ত্তা নেই। যেই বাড়িতেই দেখেছে বাঙলাদেশের পতাকা, সেই বাড়ির মেয়ে-পুরুষ-শিশু প্রতিটি মানুষকে, নৃশংসভাবে হত্যা ক'রেছে বর্বরেরা।

সৈন্যরা কয়েকটা ভাগে ঢুকে পড়েছিল পুরনো ঢাকায়। নবাবপুর রোড হয়ে গেছে একটা দল, নিউ মার্কেট হ'য়ে চকবাজার অভিমুখে গিয়েছে আর-একটা দল। যেতে যেতে পথের দুই ধারের বাড়িঘর দোকানপাট খেয়াল-খুশিমতো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে, ভেঙে-চুরে দিয়ে গেছে সৈন্যরা। নবাবপুর রোডের দুই ধারের অনেক বাড়ি পাক-সৈন্যের মর্টারের গোলায় ভেঙে গেছে, পুড়ে গেছে। এখনো দরজায়-দরজায়, দেওয়ালে-দেওয়ালে পাওয়া যাবে গোলা-গুলির নিদর্শন। পাক-সৈন্যদের তাণ্ডব চলেছে বেশি তাঁতিবাজার, শাঁখারিবাজার, বাংলাবাজার, শংকরটোলা, সদরঘাট, ইসলামপুর প্রভৃতি এলাকায়। তাঁতিবাজার, শাঁখারিবাজারের বেশির ভাগ অধিবাসী হিন্দু। বাংলাবাজারের অধিবাসীদেরও অধিকাংশই হিন্দু। এইসব এলাকা খুবই ঘনবসতিপূর্ণ। বাড়িগুলো একটার গায় একটা লাগানো ; ঘিঞ্জি। সৈন্যরা এলাকাগুলো ঘিরে ফেলে পেট্রোল ছড়িয়ে ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। কত নরনারী আর শিশু যে সেই আগুনে পুড়ে মরেছে কে তার হিসাব রাখে। যারাই বেরুতে গেছে সৈন্যদের সাব-মেসিনগানের গুলি তাদের দেহ এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় আবার তাদের অনেককে একত্রে হাত তুলে দাঁড় করিয়ে এমাথা থেকে ওমাথা লাইট মেসিনগান চালিয়ে দিয়েছে। কয়েকদিন পর্যন্ত ওইসব এলাকায় দেখা গেছে শুধু আগুন আর আগুন।

কোনো কোনো স্থানে মানুষ মরিয়া হয়ে দা লাঠি বন্দুক বল্লম নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল সৈন্যদের মুকাবিলার জন্য। সেখানে অত্যাচার আরও বেশি হয়েছে।

পাক-সৈন্যরা 'ইত্তেফাক' অফিস আক্রমণ করে ২৬ মার্চ বেলা চারটের দিকে। তিনটি ট্যাংক কিছুটা ফাঁক ফাঁকে দাঁড়িয়ে পড়ল ইত্তেফাক অফিসের সামনে। অফিসের ভিতরে তখন ছিলেন কার্যকরী-সম্পাদক সিরাজউদ্দীন আহমদ, বার্তা-সম্পাদক আসাফউদ্দৌল্লা, রিপোর্টার সৈয়দ সাজ্জাহান এবং আরও আটজন সাংবাদিক।

সৈন্যরা কামান থেকে গোলা দেগে অফিস-ভবনের ফ্ল্যাগ-স্তম্ভটি ভেঙে দিল। ওখানে তখনো উড়ছিল বাঙলাদেশের পতাকা। বেরুবার রাস্তা সামনে দিয়ে। সাংবাদিকরা তাই বেরুতে পারছিলেন না। তাঁরা বাড়ির পিছনের দিককার পাঁচতলার একটা ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। ওখানে গোলা-গুলি এসে পৌঁছছিল না। কিন্তু হঠাৎ ইত্তেফাকের ফটোগ্রাফিক ডিপার্টমেণ্টের সামনে একটা গ্রেনেড ফাটল। আগুন ধরে গেল। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু ওদিকে বাইরে বেরুনোর পথ বন্ধ। কী করা যায়। হঠাৎ একজনের চোখে পড়ল সিলিং-এর কাছে কিছুটা ফাঁক আছে। তবে ওঠা মুস্কিল। হাতের কাছে কিছুই নেই। তখন পঞ্চান্ন বছরের সাংবাদিক ইকবাল সাহেব বললেন, 'আপনারা আমার কাঁধে ভর দিয়ে উঠুন।

একজনের প্রশ্ন 'কিন্তু আপনি?'

'সে হবে খন।' উত্তর দেন ইকবালসাহেব। তখন কথা বাড়াবার সময় ছিল না। ইকবাল সাহেবের কাঁধে উঠে, সিলিং ধরে সকলে বাইরে বেরিয়ে গেল। পিছনের লাগোয়া বাড়ি থেকে একটা বাঁশ ফেলে দেওয়া হ'লো। তা ধরে ধরে সৈন্যদের অগোচরে

একে একে সকলেই বেরিয়ে গেলেন। বেরুতে পারলেন না শুধু ইকবালসাহেব। সৈন্যরা তখনো একনাগাড়ে গোলাগুলি বর্ষণ করে চলেছি। সকলে মুক্তি পেয়েও গভীর দুঃখে ম্রিয়মান হয়ে রইল। ইকবালসাহেবের জন্য সকলের মন হুহু করে উঠল। নিজের জীবন দিয়ে সহকর্মীদের বাঁচালেন। পরে বিল্ডিং থেকে ইকবাল সাহেবের মৃতদেহ আনা হয়েছিল।

তোফাজ্জল হোসেন এবং তাঁর সহকর্মীদের অনেক পরিশ্রম, অনেক কষ্টের বিনিময়ে তিলে তিলে গড়ে তোলা সৌধ পাক-সৈন্যরা গুঁড়িয়ে দিল। ইত্তেফাক বরাবরই গণ-আন্দোলনের তীব্র সমর্থক। আওয়ামীলীগের গণ-সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার ছিল ইত্তেফাক। ইত্তেফাকের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৪৯ সালে, সাপ্তাহিক হিসাবে। তাও ছিল অনিয়মিত। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ১৯৪৯ থেকে ৫১ সাল পর্যন্ত সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের মাত্র তেরটি সংখ্যা বেরয়। দৈনিক হিসাবে ইত্তেফাকের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর। তারপর কয়েকবারই সরকারি কোপে পড়তে হয় এই পত্রিকাটিকে। আয়ুবী আমলের শেষ দিকেও পত্রিকাটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। গণ-আন্দোলনের সময় ইত্তেফাকের প্রকাশ বন্ধ ছিল। আয়ুব প্রেসটি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন, পত্রিকা বন্ধ রেখেছিলেন শুধু, ইয়াহিয়া পত্রিকা-ভবনটিরই আর অস্তিত্ব রাখলেন না।

শুধু ইত্তেফাকই নয়, ইংরেজি দৈনিক 'পিপল' (আগে সাপ্তাহিক ছিল।) পত্রিকার অফিসটিও সৈন্যরা জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দিয়েছে। 'পিপল' ছিল ইয়াহিয়া-ভুট্টোর কট্টর সমালোচক। আর একটি সংগ্রামী পত্রিকা 'সংবাদ'-এরও প্রভূত ক্ষতি হ'য়েছে শোনা যায়। আয়ুব-বিরোধী গণ-আন্দোলনে এই পত্রিকাটিরও ভূমিকা অবিস্মরণীয়। পত্রিকাটির সম্পাদক জহুর-হোসেন চৌধুরী।

সহ-সম্পাদক প্রখ্যাত সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ্ কায়সার। ঘংশালরোডের এই ভাঙাচোরা বাড়িটির সঙ্গে আমারও অনেক কর্মদিনের স্মৃতি জড়িত। পত্রিকাটি ওয়ালি খান গ্রুপ ন্যাপের মুখপত্র ছিল।

ইয়াহিয়ার এই ধ্বংসযজ্ঞের সহায়তা করেছে ঢাকার অবাঙালী মুসলমানেরা। তারা সঙ্গে সঙ্গে লুঠতরাজ করেছে, বিভিন্ন এলাকায় মাথায় মুখে কাপড় জড়িয়ে দেখিয়ে দিয়েছে আওয়ামীলীগ কর্মী এবং নেতাদের বাড়ি। দেখিয়ে দিয়েছে সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত বাঙালী অফিসারদের বাড়ি। ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত বাঙালী অফিসার এবং সৈনিকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শেখ মুজিবকে সমর্থন করার। ২৩ মার্চ বিকেলে বায়তুল মোকারমের প্রাঙ্গণে বিমান, নৌ এবং স্থল বাহিনীর প্রাক্তন সৈনিকদের এক সমাবেশ হয়। তাঁরা সেখানে ঘোষণা করেন, আজ থেকে আমরা আর কেউ প্রাক্তন নই। আজ থেকে আমরা আছি নেতা আর জনতার পাশে।

তাঁরা যাতে শেখ মুজিব এবং তাঁর মুক্তিফৌজের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে না পারেন তার জন্যে পাক-সৈন্যরা তাঁদের খোঁজে হন্যে হ'য়ে বেড়িয়েছে সেই রাতে এবং তার পরেও। তাঁদের অধিকাংশকেই পাক-সৈন্যরা খুঁজে পায়নি। দু-একজন যাঁদের পেয়েছে তাঁদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। যাঁদের পায়নি, তাঁদের অনেকের ঘরে ঢুকে ঢুকে তাঁদের স্ত্রী-কন্যার ওপর ধর্ষণ করেছে, তারপর সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে সৈন্যদের ব্যারাকে।

সৈন্যদের হাত থেকে মন্দির, মসজিদ কিংবা গির্জাও রেহাই পায়নি। ঢাকার রেসকোর্সের পাশে বহুদিনকার পুরনো ঐতিহ্য-বাহী রমনা-কালিবাড়ি পাক-সৈন্যরা ধ্বংস করে দিয়েছে। সেখানকার পূজারী এবং অন্যান্য লোকজন কেউই বেঁচে নেই বলে

প্রকাশ। সৈন্যরা ধ্বংস করে দিয়েছে নবাবপুর রোডের বহু পুরানো সেণ্ট থমাস গির্জা। ২৫ মার্চ রাত্রিতে সৈন্যদের মর্টার আর কামানের গোলায় গির্জাটা প্রায় ধ্বসে গেছে। ঢাকা বৃটিশ কাউন্সিলের একজন কর্মচারী শ্রীচার্লস হাউই এবং ভি-এস-ওর দুইজন সদস্য গির্জার ছবি নিতে গিয়েছিলেন। পাক-সৈন্যরা দেখতে পেয়ে তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে ক্যাণ্টনমেণ্টে। একটি ফায়ারিং স্কোয়াডে তাঁদের দাঁড় করিয়ে গুলি করতে যাবে, সেই মুহূর্তে মার্কিন কনস্যুলেটের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর হস্তক্ষেপের ফলে তাঁরা তিনজন প্রাণে বেঁচে যান। তবে ওই মুহূর্তে তাঁদের ঢাকা ত্যাগ করতে হয়। বলা বাহুল্য, ক্যামেরা তারা ফেরত পাননি।

২৫ তারিখ মাঝরাত্তির থেকে সারারাত, আবার ২৬ তারিখ সকালে খানিকটা সময় বাদ দিয়ে সারাদিন সারা রাত্তির ধরে চলে সৈন্যদের তাণ্ডব। ২৭ তারিখ সকালে কয়েকঘণ্টার জন্য কার্ফু তুলে নেওয়া হয়। লোকেদের মধ্যে তখন ঢাকা ছেড়ে পালানোর হিড়িক পড়ে যায়। যাঁরা তখনো বেঁচে ছিলেন, বুড়িগঙ্গা পাড়ি দিয়ে পালাতে শুরু করেন। চারটে থেকে শুরু হয় আবার কার্ফু। আবার সেই তাণ্ডব—জ্বালানো-পোড়ানো, গুলি-চালানো, অত্যাচার নির্যাতন।

ঢাকার কাছেই, দশমাইলের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ। মহকুমা-শহর। নদীবন্দর। পূর্ববাঙলার পাটব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। সব দিক থেকেই নারায়ণগঞ্জের গুরুত্ব খুব। তাই ঢাকার পরেই সৈন্যদের দৃষ্টি পড়ল নারায়ণগঞ্জের ওপর। নারায়ণগঞ্জের খানপুরের অধিবাসী একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির মুখে সেখানকার একটি নিখুঁত ছবি পেলাম: '২৭ মার্চ, শনিবার। তখন দুপুর একটা। রেডিওতে

খবরটা শুনে সবে শেভ করতে বসেছি এমন সময় ঘরের চাল শেলের প্রচণ্ড গর্জনে থর-থর করে কেঁপে উঠল। টেলিফোন এবং অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত থাকলেও লোক মারফত আমরা ঢাকার পাকসেনাদের অত্যাচারের কিছু-কিছু কাহিনী শুনেছিলাম। তাছাড়া আওয়ামীলীগ থেকেও শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যাওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। অনেকেই ২৬ তারিখ শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। শহর ছাড়ার হিড়িক পড়ল ২৭ তারিখে, শহর আক্রমণের পর। এক কাপড় সম্বল করে কমলাঘাট, আবদুল্লাপুর, বিক্রমপুর এবং বৈদ্যেরবাজার, রামচন্দ্রপুরের দিকে ছুটল হাজার হাজার মানুষ আশ্রয়ের সন্ধানে। আমাদের পরিবারের অন্যান্য লোকজনকে নদীর ওপারে পাঠিয়ে দিলাম। আমি বাড়িই রয়ে গেলাম।

পরদিন বেলা একটা নাগাদ পাকসৈন্য নারায়ণগঞ্জে প্রবেশ করে। এই চব্বিশ ঘণ্টা ধরে অনবরত শুনেছি গুলি-গোলার আওয়াজ। মুক্তিফৌজ পুরো চব্বিশ ঘণ্টা পাকসৈন্যদের আটকে রেখেছিল। ওই অবসরে নারায়ণগঞ্জের লোকজন শহর ছেড়ে যাবার সুযোগ পেয়েছিল। তাই লোকজন বেশি মারা যায় নি। তবে দু'টো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রাস্তার ওপরই জামতলার কাছে ছিল পূর্ববাঙলার বিশিষ্ট পাটব্যবসায়ী সাত্তার সাহেবের বাড়ি। সৈন্যরা বাড়ি চড়াও করল একদিন। অভিযোগ, ওই বাড়ি থেকে গুলি ছোড়া হয়েছে। সৈন্যরা বাড়ির ছেলে-মেয়ে-বুড়ো-শিশু সবাইকে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কৌন গোলি ছোড়া ?' সকলেই নীরব। অফিসারটি খেঁকিয়ে উঠে আবার বলে, 'জলদি বাতাও। অর আই:উইল স্যুট ডাউন অল অব ইউ।'

গুলি ছুড়েছিল সাত্তার সাহেবের বড়ো ছেলে এবং তার দু'জন বন্ধু। মা-বাবা কোন্ প্রাণে ছেলের নাম বলবেন ?

সৈনিকটি আবার বলে ওঠে, 'আই অ্যাম গিভিং ইউ দ্য লাস্ট ওয়ারনিং।'

বাড়ির পাঞ্জাবি ড্রাইভারটি আর থাকতে না পেরে বড়ো ছেলে এবং তার বন্ধুদের দেখিয়ে বলে, 'এরা গুলি ছুড়েছে। এদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। জোর করে, ভয় দেখিয়ে বাড়ি ঢুকেছে এরা।'

পরমুহূর্তেই খট্-খট্-খট্ কয়েক রাউণ্ড গুলির শব্দ শোনা গেল। তিনটি দেহ মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল। চোখের সামনে বড়ো ছেলেকে হত্যা করতে দেখেও কাঁদতে পারলো না কেউ সেই মুহূর্তে।

আর-একটি ঘটনা ঘটেছে স্মিথ রোডে। ওখানকারই একটি বনেদী পরিবার রায়-চৌধুরীরা। ২৯ তারিখ বিকেলে কয়েকজন সৈন্য নিয়ে একজন অফিসার এলেন সন্তোষকুমার রায়চৌধুরীর বাড়ি। সে সময় তাঁর ভাই নোটন রায়চৌধুরী এবং অপর একজন আত্মীয় রবি রায়চৌধুরীও বাড়ি ছিলেন। অফিসারটির হাতে একটা তালিকা ছিল। সে সন্তোষবাবুর নাম ধরে ডাকতেই মুসলমান চাকরটি বুদ্ধি করে বলল, বাবু তো বাড়ি নেই, সকালেই বেরিয়ে গেছেন।'

অফিসারটি বেরিয়ে গেল। তাঁরা ভাবলেন, বিপদ কাটল। রবি রায় চৌধুরীর কিন্তু খটকা লেগেছিল। সন্দেহ হ'য়েছিল সৈন্যরা ফের আসতে পারে। লক্ষ্য রাখছিলেন তাদের আগমনের পথের দিকে। মিনিট পাঁচেক বাদেই অফিসারটি আবার ফিরে এলো। সঙ্গে একজন অবাঙালী মুসলমান। রবি-রায়চৌধুরী তাড়াতাড়ি বাড়ির পাশের খালের জলে গিয়ে লুকিয়ে রইল।

অফিসারটি বাড়ির কাছে আসতেই অবাঙালী মুসলমানটি বলল, 'আভি আভি ম্যায়নে দোনো বাঙালী ভাইকো দেখা।'

দরজা বন্ধ ছিল। ভেঙে ভিতরে ঢুকে গেল ওরা। সামনেই

পেল নোটন রায়চৌধুরীকে। গুলিতে তাঁর দেহ লুটিয়ে পড়ল মেঝে। তারপর ধরে আনা হলো সন্তোষকুমার রায়চৌধুরীকে। নির্মমভাবে হত্যা করল সৈন্যরা তাঁকেও। হত্যা করল মুসলমান চাকরটিকেও। সৈন্যরা চলে গেলে রবি রায়-চৌধুরী উঠে এলেন খালের জল থেকে। চোখের জলের জলে বুক ভাসিয়ে নীরবে মৃতদেহগুলো নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেন।

সন্তোষ রায়চৌধুরী জয়গোবিন্দ হাইস্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন দীর্ঘদিন। পরোপকারী এই লোকটির মৃত্যুতে কলকাতায় বসেও অনাত্মীয় অনেকে চোখের জল ফেলেছে।

এছাড়া মেট্রো সিনেমার সংলগ্ন-বাড়ির মণ্টু এবং তার ভাইকেও সৈন্যরা হত্যা করেছে।

খোদ নারায়ণগঞ্জ শহরে এই কয়জনের বাইরে আর কার মৃত্যু ঘটেছে বলে আমি জানি না।

লক্ষ্মীনারায়ণ-চিত্তরঞ্জন-ঢাকেশ্বরী মিল এলাকায় জনা পঁচিশেক লোক সৈন্যদের হাতে নিহত হয়েছে। বন্দরে অবাঙ্গালীদের দাঙ্গায় মারা গেছে গোটা কুড়ি মানুষ। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের চোখে দেখেছি খানপুরের এম. সারকিস স্টাফ-কোয়ারটার মিলিটারিরা পুড়িয়ে দিল। রাস্তার ধারের এমন অনেক বাড়ি-ঘরই সৈন্যরা পুড়িয়ে দিয়েছে, যাতে ওখান থেকে মুক্তিফৌজ হঠাৎ সৈন্যদের ওপর হামলা চালাতে না পারে। ২৮ তারিখ ছুটো ট্যাংক এবং কয়েকটি মিলিটারি জীপ এসেছিল খানপুর। আমি তখন ঘরে। ট্যাংক ছুটো কুমুদিনীর মাঠে ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে গেল। ওদিকে ছুটো ট্যাংক গিয়েছিল মণ্ডলপাড়া পুলের কাছ পর্যন্ত। মোস্তফা সারওয়ারের শ্মশানের কাছের বাড়িটা শেলিং-এ বিধ্বস্ত হয়েছে; ডায়মণ্ড টকিজের ছবিটা কামানের গোলায় সম্পূর্ণ ধ্বসে পড়েছে। রহমতুল্লাহ্ ইন্সটিটুশন

আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। কলকটি, টানবাজার, চারারগোপ কালিরবাজার, দিগ্‌বাবুর বাজারের সামনের দোকানপাট অবাঙালীরা লুঠ করেছে। কালির বাজারে কালিবাড়ির মূর্তি দুবৃত্তরা নিয়ে চলে গেছে। কায়েদ-ই-আজম রোডের দু'পাশের বাড়িগুলো অসংখ্য গুলির ক্ষতে মালার মতো হ'য়ে গেছে। নারায়ণগঞ্জে সৈন্যরা বোমা ফেলেনি। শুধু প্রথম দিন একটা হেলিকপ্টার কয়েকটা চক্কর দিয়ে গেছিল নারায়ণগঞ্জের ওপর দিয়ে।

আমরা একজন মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়ি আশ্রয় নিয়েছিলাম। কে হিন্দু, কে মুসলমান একথা তখন আমাদের কারুর মনেই দেখা দেয়নি। আমাদের একমাত্র পরিচয় ছিল, আমরা বাঙালী। হিন্দুর বাড়ি মুসলমান আশ্রয় নিয়েছে, খেয়েছে; মুসলমানের বাড়ি হিন্দু আশ্রয় নিয়েছে, খেয়েছে নিঃসঙ্কোচে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এমন সম্প্রীতি আগে আর কখনো দেখিনি।

সারবন্দী হ'য়ে লাঙলবন্দের রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ বৈদ্যেরবাজারের দিকে গেছে। পথে একদল গুণ্ডা জনৈক হিন্দু ভদ্রমহিলার গলার হার ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। অন্যান্য মুসলমান লোকেরা তাদের ঘটনাস্থলেই ধরে ফেলে জবাই করে। তারপর থেকে আর ছিনতাইয়ের ঘটনা শোনা যায় নি।

আমরা রামচন্দ্রপুর থেকে আগরতলা সীমান্ত পর্যন্ত দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়েছি। পথে কোথাও খাবার কিনতে পাওয়া যায় নি। বাচ্চা দুটো খিদেয় অস্থির হয়ে পড়ছিল। এক মৌলবী-সাহেবও চলছিলেন আমাদের সঙ্গে আগরতলা। তিনি অর্ধেকটা ছাতু খেয়ে বাকিটা রেখে দিয়েছিলেন গামছায় বেঁধে পরে খাবেন বলে। তিনি ওই ছাতু দিয়ে দিলেন বাচ্চা দুটোকে। তার কথা আমরা কোনোদিনই ভুলব না।'

'পঁচিশ তারিখ সন্ধ্যে নাগাদই আমরা খবর পেয়েছিলাম পাকিস্তানী ফৌজ হামলা চালাতে পারে। আমরা মাইকে সকলকে শহর ছেড়ে গ্রাম, বৈদ্যেরবাজারের দিকে চলে যেতে বললাম। রহমতুল্লাহ্ ক্লাব, হংস সিনেমা এবং জোহা ভাইয়ের বাড়িতে কন্ট্রোলরুম ছিল আমাদের। মোস্তাফা সারওয়ারের নেতৃত্বে আমরা রাত আটটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম চাষাড়া ছাড়িয়ে পঞ্চবটীর দিকে। মিউনিসিপ্যালিটির বুলডোজার নিয়ে এসে রাস্তা খুঁড়ে খুঁড়ে দিলাম। ইলেকট্রিক করাত দিয়ে ঝপাঝপ্ গাছ ফেললাম। অন্তত হাজার বিশেক ছেলে কাজে লেগে গেছিল সেদিন। ডেমরায় আদমজীর রাস্তাও কেটে কেটে রাখলাম। রেল-লাইন তুলে ফেললাম, মালগাড়ি দিয়েও পথ আটকালাম। পঞ্চবটীর ওখানে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রাস্তার দুপাশে জমিতে জলসেচের জন্য নালা কাটা হয়েছিল। আমরা ওই নালা দিয়ে রাস্তার নিচ পর্যন্ত সুড়ঙ্গ খুঁড়লাম। তারপর প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করলাম পাক-সৈন্যের মুকাবিলার জন্য। আমাদের কারু হাতে ৩০৩ রাইফেল, কারু হাতে ১২ বোরের বন্দুক, কারু হাতে-বা দা কাঁচি লাঠি রড।

২৭ মার্চ ঠিক দুপুর নাগাদ ঢাকা থেকে পেট্রোল দেওয়ার জন্য কয়েকটা মিলিটারি জীপ এলো। আমরা ওদের এগিয়ে আসতে দিলাম। দুপাশে নালার মধ্যে বসে তীব্র উত্তেজনা নিয়ে আমরা অপেক্ষা করছি সংকেতের। মোস্তফাভাই সংকেত দেবেন। জীপগুলো এগিয়ে এলো। সম্ভবত ৭টি জীপ ছিল। ওরা মাঝামাঝি জায়গায় যেতেই আমরা গুলি চালালাম বৃষ্টির মতো। ওরা হতভম্ব। অস্ত্র ভালোভাবে ব্যবহারের আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল সকলে। একজন ড্রাইভার কোনোমতে বেঁচে গেছে। সে-ই গিয়ে খবরটা দিয়েছে। সন্ধ্যের পরে-পরেই দেখলাম, সার সার মিলিটারি ভ্যান আসছে। সঙ্গে ট্যাংক।

বিরাট বাহিনী। আমরা পিছু হটব কি আক্রমণ করব ভাবছিলাম। কিন্তু মনে তখন তীব্র উত্তেজনা। রক্ত ফুটছে টগবগ করে। হানাদারদের রুখতেই হবে। সকলের চোয়াল শক্ত হ'লো। আমি এবং আমার পাশে চুইনকাভাই রাইফেলের ট্রিগারে হাত রেখে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকলাম। আগের মতোই ওদের ভিতরে ঢুকতে দিলাম। চাঁদের চাপা আলোয় আবছায়া ট্র্যাক, ভ্যান আর ট্যাংকগুলো এগিয়ে চলেছে ধীর গতিতে। মাঝে মাঝে ওরা আলোক-বোমা ছুড়ছিল। তাতে নিয়নসন বাতির আলোয় সবকিছু যেমন উজ্জ্বল দেখায়, তেমনটা দেখাচ্ছিল সবকিছু। ট্যাংকের ঘড়্ ঘড়্ আওয়াজে রাস্তা থর্ থর্ করে কাঁপছে। মনে হচ্ছিল, রাস্তাটা ভেঙে আমাদের মাথার ওপর পড়ে যাবে। আমরা এমনভাবে রাস্তার দু'পাশে শুয়ে ছিলাম যে, রাস্তার ওপর থেকে আমাদের দেখা যাচ্ছিল না। ওরা যখন মাঝামাঝি স্থানে এসে পৌঁছল, মোস্তাফাভাইয়ের সংকেত পেলাম। রাইফেলের গুলি ছুড়েছেন তিনি। মুহূর্তে আমার হাতের রাইফেলও গর্জে উঠল, গর্জে উঠল চুইনকাভাইয়ের রাইফেল এবং আরও অনেক রাইফেল। প্রত্যুত্তর এলো পাক-সৈন্যদের কাছ থেকেও। রাত্রির নৈঃশব্দ চিরে চিরে গেল। বার বার ট্রিগ্রার টেনে পাঁচরাউণ্ড গুলি ছুড়ে গেলাম আমি। তারপর রাইফেলটি তুলে দিলাম বন্ধুর হাতে। এক-একটি রাইফেলের পিছনে আমরা পাঁচজন করে লোক ছিলাম। হাত বদল ক'রে ক'রে ফায়ার করে গেছি। কিন্তু গুলি ছিল আমাদের খুবই কম। তাই হিসেব করে করে গুলি ছুড়ছিলাম।

ট্যাংক থেকে খট্-খট্-খট্ শব্দে মেসিনগানের গুলি চারিদিকে বৃষ্টিধারার মতো ছুটে চলেছিল। মেসিনগানটি ঘুরছিল চারদিকে। একজন গুলি ভরে চলেছে। অপর কয়েকজন স্বংক্রিয় অস্ত্রহাতে

ফায়ার করে চলেছে। আমরা গুলি ছুড়ি, ট্যাংকের গায় গিয়ে লেগে তা একটা আগুনের ফুলকি হয়ে যেন বালির মতো গুঁড়িয়ে যায়। বুঝলাম, রাইফেলের গুলিতে ট্যাংক কাবু করা যাবে না। আমরা তখন সৈন্যদের ভাগ ক'রে ক'রে গুলি ছুড়লাম। এতে কাজ হ'লো। চুইনকাভাই খুব সাহসী। বুকে ভর দিয়ে দিয়ে রাস্তার ঢাল বেয়ে বেশ খানিকটা উঠে গুলি ছুড়ল পর-পর দু'বার। দুজন সৈন্য একটা ট্রাক থেকে ঢ'লে পড়ল নিচে। একজন-দুজন করে বেশ কিছু সৈন্য মারা গেল। আমাদেরও হতাহত হতে থাকল।

আমরা বুঝলাম, শুধু রাইফেল সম্বল করে আধুনিক অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত পাক-সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বেশীক্ষণ লড়াই করা যাবে না। আমাদের গুলিও প্রায় ফুরিয়ে আসছিল।

আমার বুলেট ফুরোতেই আমি বুকে ভর দিয়ে দিয়ে ক্ষেতে নেমে পড়লাম। ভারি বলে রাইফেলটা আমি আনিনি সঙ্গে। এখন রাইফেলটার জন্য খুব আফসোস হচ্ছে। ক্ষেতের ভিতর দিয়ে দিয়ে আমি মাসডাইল, দেওভোগ হ'য়ে শীতলক্ষ্যা গেলাম। তারপর নদী সাঁতরে ওপারে, বন্দরে গেলাম। তখন প্রায় ভোর হ'য়ে গেছে। সারা দেহ ক্লান্ত। উঠতে পারছিলাম না। নদীর ধারে শুয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। তারপর উঠে কিছুদূরে যেতেই একজন লোকের মুখে শুনলাম বন্দরে অবাঙ্গালী মুসলমানেরা দাঙ্গা শুরু করে দিয়েছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে আগুন লাগাচ্ছে। ছুরি মারছে। লুঠতরাজ করছে। আমি আর এগোলাম না। নদীর ধার দিয়ে হেঁটে হেঁটে কিছুটা গিয়ে নদী সাঁতার গোপচরে এলাম।'

মুক্তিযোদ্ধা আজিজের মুখে শুনলাম নারায়ণগঞ্জে পাক সৈন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা। কলেজের ছাত্র আজিজ। ছাত্রলীগের একজন কর্মকর্তা। ছোটোখাটো পাতলাগোছের চেহারা তার। কিন্তু ইস্পাতের মতো দৃঢ় সে দেহ। চোখে তাঁর

আগুন। ধনীর দুলাল আজিজের দিন কাটে আজ মাঠে ঘাটে। খাওয়া কখনো জোটে, কখনো জোটে না। ভ্রুক্ষেপ নেই সেদিকে আজিজের। আজিজের সামনে আজ একটাই লক্ষ্য, একটাই চিন্তা: হানাদারদের কবল থেকে বাঙলামাকে মুক্ত করতেই হবে। আজিজ আজ খাওয়া চায় না, পরা চায় না, চায় শুধু অস্ত্র। অস্ত্র চায় সে শত্রুসৈন্য বিতাড়িত করার জন্য, অস্ত্র চায় সে 'গাদ্দারদে'র হত্যা করার জন্য। (আজিজের ভাষায়, বিশ্বাস-ঘাতকরা হ'লো 'গাদ্দার') আজিজ আমার দেশের ছেলে, ছোটোভায়ের মতো। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে কে মারা গেছে কে কে লড়েছে?' আজিজের উত্তর, 'নারায়ণগঞ্জের কোনো ছেলে বাকি ছিল না। সকলেই লড়েছে। পাইকপাড়া, বাবুরাইল, খানপুর, নবীগঞ্জ, দেওভোগ—সমস্ত জায়গা থেকে যুবকরা সেদিন লড়াই করছে আপ্রাণ। আজও জানিনা, কে বেঁচে আছে, কে মারা গেছে, তখন খোঁজ নেওয়ার মতো অবস্থা ছিল না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'মোস্তাফা সারওয়ারের ভাই বাবু লড়াই করতে গিয়ে কি শহীদ হয়েছে? খসরু আমায় বলেছে।'

আজিজ বলল, 'বাবু লড়াইয়ে ছিল। আমাদের থেকে আরও এগিয়ে ছিল। জানি না কী হয়েছে?'

বাবু, ফুলের মতো ওইটুকু ছেলেও রাইফেল হাতে পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়ছে ভেবে অবাক লাগছে। কোথায় পেল সে এতো শক্তি এত দুর্জয় সাহস; কোথায় পেল মরণকে জয় করবার এই দীক্ষা। আজ যে বাবুর মতো লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ের হৃদয়ে বরকত-সালাম-শফিক-রফিকেরা জেগে উঠেছে।

সময়-অসময়ে 'কল্‌হনভাই কল্‌হনভাই' বলে ডাকত, পাতলা-চেহারার প্যান্টসার্টপরা ওই ছোট্ট ছেলেটির জন্য আজ সুখে এবং আশংকায় কান্না পাচ্ছে।

আজিজ আরও বলল, 'দাদা, না দেখলে ভাবতেও পারবেন না। মোস্তাফাভাই গত কয়েক সপ্তাহ ধরে কী পরিশ্রমটাই না করেছেন। নাওয়া নেই খাওয়া নেই দিনরাত আমাদের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করেছেন। মোস্তাফাভাই আমাদের প্রেরণা, আমাদের উপদেষ্টা, আমাদের পরিচালক।

আমার চোখের সামনে এই মুহূর্তে ভেসে উঠছে নারায়ণগঞ্জের শ'য়ে শ'য়ে মুক্তিযোদ্ধার ছবি। ভেসে উঠেছে মোস্তাফা সারওয়ারের ছবি, চুনকো, বাবু, খাজা মহিউদ্দীন, আফজাল, মান্নান আরও অনেকের ছবি। আমি যে ওদের চিনি। কতদিন একসঙ্গে খেয়েছি, আড্ডা দিয়েছি।

এই সেই মোস্তফা সারওয়ার ভাষা-আন্দোলনের সময় যাঁর কণ্ঠস্বর নারায়ণগঞ্জের প্রতিটি ছেলেমেয়ের শিরায় শিরায় তপ্তরক্তের মাতন জাগিয়েছিল। মমতাজআপা আর তাঁর ডাকে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে সেদিন ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল রাস্তায়, মুসলীম-লীগের বেয়নেট আর টিয়ারগ্যাসের মুখোমুখি।

মমতাজআপা তখন নারায়ণগঞ্জ গার্লস স্কুলের হেড মিসট্রেস। তাঁর চোখ দুটিতে ছিল আশ্চর্য সম্মোহন, কণ্ঠে ছিল জাদু, স্কুলের প্রতিটি মেয়ে তার কথায় উঠত বসত, যে-কোনো বিপদের মুখে অকুতোভয়ে এগিয়ে যেত।

মমতাজআপা দিনের পর দিন মেয়েদের তাতিয়ে তুলেছেন, বাংলাভাষার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন। কোথায় কোন্ হেডমিস্ট্রেস ছাত্রীদের প্ররোচিত করেন ধর্মঘট করতে? মমতাজআপা করেছেন।

১৯৪৭ সালের ১৪ অগস্ট ইংরেজ দেশ ছেড়ে চলে গেল। দেশ স্বাধীন হ'লো। 'পাকিস্তান' নামক রাষ্ট্র-সমবায়টির জন্ম হ'লো।

লাহোর-প্রস্তাবের প্রতিশ্রুতি ছিল পাকিস্তানের 'constituent units shall be autonomous and *sovereign*'. অর্থাৎ বিভিন্ন ইউনিটের লোকের ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশের অবাধ অধিকার থাকবে। থাকবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক স্বাধীনতা।

তরুণদের মনে তখন নতুন উৎসাহ, উদ্দীপনা। তারা তাদের স্বপ্নের দেশ গড়তে চায়—যেখানে থাকবে না অভাব, শিশুরা পাবে শিক্ষার সুযোগ, আত্মবিকাশের সুযোগ; যেখানে গড়ে উঠবে নতুন যুগের আশা-আকাঙ্খার সাহিত্য।

জিন্নাহ্-লিয়াকত আলীর স্থান তখন সারা দেশের মানুষের মণিকোঠায়। তাঁরা নবীন-প্রবীণ সকলের আদর্শ, যাত্রাপথের দিশারী।

কিন্তু নেতারা নিজেরাই ছিলেন তখন দিশেহারা। তাদের সামনে দেশগড়ার কোনো পরিকল্পনা নেই। নেই দেশের সমস্যাসমাধানের চেষ্টা। পরিবর্তে ভারত-বিরোধী স্লোগান এবং ইসলাম বিপন্ন, এবং পাকিস্তান বিপন্নের জিগির তুলে মানুষের মন আসল সমস্যা থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার চেষ্টায় উঠেপড়ে লাগলেন।

জিন্নাহ্ কখনোই সাধারণের নেতা ছিলেন না। বড়ো ঘরের ছেলে তিনি। জেলে যেতে রীতিমতো ভয় পেতেন। তাই তাঁর কথাবার্তা আইনের সীমা ছাড়াত না কোনো সময়ই। শাসন চালানো সম্পর্কে জিন্নাহ্র নিজের কোনো জ্ঞান ছিল না। তাই তিনি লিয়াকত আলীর পরামর্শে শাসন-বিভাগের প্রধান প্রধান পদে সব বৃটিশ অফিসারদের নিয়োগ করলেন। পূর্ববাঙলার গভর্নর করলেন স্যার ফ্রেডরিক বোর্নকে, স্যার ফ্র্যান্সিস মুদি এবং স্যার জর্জ ক্যানিংহাম হলেন যথাক্রমে পশ্চিম-পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর। জেনারেল ফ্র্যাংক মাসারভিকে করা

হ'লো কমাণ্ডার-ইন-চীফ। কর্নেল বিনি হলেন জিন্নাহ্‌র মিলিটারি সেক্রেটারি। চৌধুরী খালিকুজ্জামান এবং লিয়াকত আলী ছিলেন বৃটিশের হাতের লোক। বৃটিশ দেশ ছেড়েও, তাদের দিয়েই পাকিস্তানের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখলেন। জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তানে ক্ষমতার লড়াই আর প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র শুরু হ'য়ে গেছিল। জনগণ তখনো একথা জানতো না। তাই জিন্নাহ্‌ ছিলেন তখনো জাতির পিতা। আর লিয়াকত আলী খান কায়েদ-এ-মিল্লাত। পাকিস্তানের সৃষ্টি থেকেই ভাষা-সমস্যা এবং মুসলিমলীগের উপদলীয় কোন্দলের ফলে পূর্ববাঙলায় যে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল তা নিরসনের জন্য নাজিমউদ্দীন জিন্নাহ্‌কে ঢাকায় নিয়ে এসেন। লীগনেতৃবৃন্দ এবং সিরাজদৌল্লা, মীরমদন, মোহনলালের নামে ঢাকার বিমানবন্দর থেকে চীফ সেক্রেটারির বাড়ি পর্যন্ত অনেকগুলো তোরণ নির্মিত হয়েছিল সেদিন, কায়েদ-ই-আজম চীফ সেক্রেটারি আজিজ আহম্মদের বাড়িই উঠেছিলেন।

জিন্নাহ্‌ যখন ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ ঢাকায় এলেন, তখন পাকিস্তানের বয়স মাত্র আট মাস। স্বভাবতই জিন্নাহ্‌-লিয়াকত আলীর তখনো দোর্দণ্ড প্রতাপ। সকলের মুখে তাঁদের নাম।

পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ্‌ ২০ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে নাগরিক সংবর্ধনার উত্তরে ভাষণ দিতে উঠলেন। সারা ময়দান লোকে থই-থই করছে। দূর-দূরান্ত থেকে লোক এসেছে জিন্নাহ্‌কে দেখবার জন্য, তাঁর কথা শুনবার জন্য। 'পাকিস্তান-জিন্দাবাদ',-'নারায়ে তগদবির—আল্লাহু আকবর,' 'কায়েদ-ই-আজম—জিন্দাবাদ' প্রভৃতি ধ্বনিতে মুহুর্মুহু উদ্বেলিত হচ্ছিল জনতা।

অসংখ্য মাইকে কায়েদ-ই-আজমের কথা ছড়িয়ে পড়ছে মাঠময়। উর্দুতে ভাষণ দিলেন তিনি। মাঝে মাঝে সেই সঙ্গে

মিশেল দিলেন ইংরেজির। হোক উর্দু। যা বুঝতে পারছে তাতেই জনতা করতালিতে করতালিতে বার বার তাদের নেতাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। মুহুর্মুহু করতালিতে মাঠ ভরে উঠছিল সেদিন।

কায়েদ-ই-আজম বলে চলেছিলেন: আমি একথা আপনাদের বলতে চাই যে, আমাদের মধ্যে নানা বিদেশী এজেন্সীর অর্থ সাহায্যপুষ্ট কিছু লোক আছে যারা আমাদের সংহতি বিনষ্ট করতে বদ্ধপরিকর। তাদের উদ্দেশ্য হ'লো পাকিস্তানকে ধ্বংস করা। আপনারা সাবধান হয়ে চলুন আমি তাই চাই, আমি চাই আপনারা সতর্ক থাকুন এবং আকর্ষণীয় স্লোগান ও বুলির দ্বারা বিভ্রান্ত না হন।

পাকিস্তানের শত্রুরা এখন পাকিস্তানী মুসলমানদের মধ্যে বিভেদসৃষ্টির দ্বারা রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার দিকে মনোযোগ দিয়েছে। প্রাদেশিকতার উস্কানী দানের মাধ্যমেই তাদের এই প্রচেষ্টাকে তারা অব্যাহত রেখেছে। যে পর্যন্ত না এই বিষকে আপনারা রাজনীতি থেকে বর্জন করছেন, সে পর্যন্ত আপনারা নিজেদের সত্যিকারের জাতি হিসেবে গঠন করতে সক্ষম হবেন না।

মুসলমানদের মধ্যে বিভেদসৃষ্টির জন্যই ভাষার প্রশ্ন তোলা হ'য়েছে। বাংলা এই প্রদেশের সরকারি ভাষা হবে কিনা সেটা এই প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা স্থির করবেন। কিন্তু আমি সুস্পষ্ট ভাষায় আপনাদের পরিষ্কার জানাতে চাই যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়। একটি মাত্র রাষ্ট্রভাষা ছাড়া কোনো জাতিই একসূত্রে গ্রথিত হ'য়ে কার্যনির্বাহ করতে পারে না।

হঠাৎ জনতা স্তব্ধ হ'লো। সাগর-তরঙ্গ স্থির হ'য়ে পড়ল কোন্ জাদু বলে! কী হ'লো! কায়েদ-ই-আজম তো বলেই চলেছেন।

অথচ কোথায় সেই একটু আগের মুহূর্তের উল্লাস-ধ্বনি, কোথায় সেই করতালি, কোথায় সেই আনন্দের উচ্ছ্বাস। সকলেই যে নীরব, মুখ থম-থমে।

একি কথা! এরকম তো কথা ছিল না। কায়েদ-ই-আজম কি লাহোর রেজুলেশনের কথা ভুলে গেছেন? আমাদের বাপ-দাদা যে-ভাষায় কথা বলেছে, আমরা যে-ভাষায় কথা বলি তা আর বলতে পারব না। কেন? কেন? কেন? জনতার মনে তখন প্রশ্নের আলোড়ন চলছে। উর্হু রাষ্ট্রভাষা হোক আমাদের আপত্তি নেই, সেই সঙ্গে বাংলাও নয় কেন? পাঞ্জাবি, পশ্‌তু, সিন্ধিই-বা নয় কেন? আর রাষ্ট্রভাষা যদি হ'তেই হয় তবে বাংলার দাবি তো সকলের আগে। সারা পাকিস্তানে হাজারে মাত্র ২৫ জন লোকের মাতৃভাষা উর্দু, সেখানে বাংলা ৪১২ জনের মাতৃভাষা; পশ্‌তু ৫০ জনের। উর্দুর দাবি তো অনেক পরে। সেখানে উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে—কায়েদ-ই-আজম এ কী কথা বলছেন? কোথায় গেল সেই ভাষা, সংস্কৃতি এবং প্রশাসনিক স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি?

বিক্ষুব্ধ জনতা রুদ্ধশ্বাসে শুনছে তাঁর বক্তৃতা। না কায়েদ-ই-আজম লাহোর রেজুলেশনের কথা ভোলেন নি। সরল ক'রে তিনি ব্যাখ্যা ক'রলেন লাহোর রেজুলেশনের। বললেন, 'পাকিস্তান হবে একটি 'Independent state', 'states' নয়। লাহোর রেজুলেশনের 'states' শব্দের শেষের 's' টি টাইপের ভুল। হ'য়ে গেল সব সমস্যার সমাধান। মাত্র একটি 's' বাদ দেওয়ার ফলে পাকিস্তান হ'য়ে গেল এক রাষ্ট্র, এক সংস্কৃতির দেশ।

এমন সরল ব্যাখ্যাও সেদিন জনতা মেনে নিতে পারে নি। প্রতিবাদ ক'রে নি বটে, কিন্তু মনে মনে তাদের অগণিত জিজ্ঞাসা আলোড়ন তুলেছে। কই এতদিন তো একথা শুনি নি,

এই ভুলটা কি এতদিনেও নেতাদের চোখে পড়ে নি, পড়ল কি না আজই।

কায়েমীশাসকদের নগ্নতার এই পরিচয় পেয়ে জনতা স্তম্ভিত। তাদের আশা-আকাঙ্খা মুহূর্তে ধূলিসাৎ হ'লো। সভা ভেঙে গেল। ফিরে চলেছে জনতা। কিন্তু আসার সময়কার সেই উল্লাসধ্বনি কই? বিষাদমগ্ন জনতার নীরব মিছিল চলেছে দিকে দিকে।

২৪ মার্চ। সকালবেলা। সমাবর্তন উৎসবে ঢাকার সুধী সমাবেশ হ'য়েছে কার্জনহলে। শেরোয়ানি আচকান আর জিন্নাহ্-টুপির ছড়াছড়ি। কায়েদ-ই-আজম এবারে বলছেন ইংরেজিতে। শ্রোতারা নীরবে শুনে যাচ্ছে জিন্নাহ্‌র বক্তৃতা। রেসকোর্স ময়দানের কথাটার পুনরাবৃত্তি ক'রলেন জিন্নাহ্, 'Urdu and urdu only can be the state language of Pakistan'.

তখুনি শ্রোতাদের মাঝখান থেকে গম্ভীর এবং ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কে বলে উঠল, 'না।'

কায়েদ-ই-আজম স্তম্ভিত হ'য়ে বক্তৃতা থামিয়ে খুঁজছেন, কে এই দুঃসাহসী? সারা হ'ল থম্ থম্ ক'রছে। কার্জনহলের দেওয়ালে দেওয়ালে অনেকক্ষণ ধরে প্রতিধ্বনি চলল, না—না—না। গভর্নর জেনারেলের মুখের ওপর এমন কথা বলার সাহস কা'র? লৌহমানব বলে যাঁর খ্যাতি, যাঁর ব্যক্তিত্ব শিক্ষিত-সমাজের আলোচনার বিষয়, সেই জিন্নাহ্‌র মুখের উপর কথা বলার এই দুঃসাহস কা'র?

জিন্নাহ্‌কে দ্বিগুণ চমকিত ক'রে এবার অনেক কণ্ঠের আওয়াজ উঠল: না—না—না। এই আওয়াজ সেদিনকার কয়েকটি যুবকের নয়। কায়েদ-ই-আজমের কথার প্রতিবাদ সেদিন যাঁরা করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন আবদুল মতিন এবং এস. এম. আহসান। এই আওয়াজ সারা বাংলার যুব-সমাজের। এই আওয়াজ অন্যায়ের প্রতিবাদ। জিন্নাহর সুর এবার খানিক নরম হলো।

ওইদিনই সন্ধ্যে সাড়ে ছয়টার সময় কায়েদ-ই-আজম রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে চীফ সেক্রেটারি আজিজ আহম্মদের বাসায় সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন শামসুল হক, কমরুদ্দীন আহমদ, আবুল কাসেম, তাজউদ্দীন আহমদ, শামসুল আলম, মোহম্মদ তোয়াহা, আজিজ আহমদ, অলি আহাদ, নঈমুদ্দীন আহমদ এবং নজরুল ইসলাম।

আলোচনার শুরুতেই কায়েদ-ই-আজম বললেন, নাজিমউদ্দীনের সঙ্গে তাদের যে চুক্তি হয়েছে তা তিনি স্বীকার করেন না। কারণ জোর করে নাজিমউদ্দীনের কাজ থেকে চুক্তিতে সই করানো হয়েছে।

১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন।

ছাত্ররা বিভিন্ন অফিস-আদালতে পিকেটিং করে সেইদিন। রমনা ডাকঘরের সামনে যেসব ছাত্র পিকেটিং করছিল, পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে সামনের একটা গাছতলায় নিয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে। দলটিতে তের-চৌদ্দজন ছাত্র ছিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তোয়াহাভাই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট গফুর বললেন, দেখেন এরা কিভাবে পিকেটিং করছে।

জবাবে তোয়াহাভাই বলেন, স্ট্রাইকের সময় পিকেটিং হবেই, সেটা খুব স্বাভাবিক। এই নিয়ে গফুরসাহেবের সঙ্গে তোয়াহা ভাইয়ের জোর তর্কাতর্কি চলে।

হাইকোর্ট এবং সেক্রেটারিয়েটের সামনেও ছাত্ররা পিকেটিং করেন। শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ প্রভৃতি কয়েকজন পিকেটেং করেন সেক্রেটারিয়েটের প্রথম গেটে (আবদুল গণি রোড), দ্বিতীয় গেটে পিকেটিং করেন কাজী গোলাম

মাহবুব, শওকত আলী, বরকত এবং অন্য দুই জন। পিকেটিং চলাকালে দ্বিতীয় গেটে এক সময় হাজির হন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট চ্যাথাম, ইন্সপেক্টর জেনারেল জাকির হোসেন এবং ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল ওবায়দুল্লাহ্। তাঁরা তিনজনে গাড়ি বাইরে রেখে সেক্রেটারিয়েটের ভিতর ঢোকেন। সে সময় কেউ তাঁদের বাধা দেয় নি। মিনিট পাঁচেক বাদেই তাঁরা তিনজন বেরিয়ে এসে গাড়ি নিয়ে ঢোকার চেষ্টা করলে শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুবরা বাধা দেন। চ্যাথাম গোলাম মাহবুব ও বরকতকে গ্রেপ্তার করলেন। তখন শওকত আলী গাড়ির সামনে লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়লেন। জাকির হোসেন তখন বললেন, তোমাকেও গ্রেপ্তার করা হলো। এই বলে তিনি শওকত আলীর একটি হাত ধরেন। শওকত আলী অন্য হাতে গাড়ির বাম্পারটি ধরে রাখেন। গাড়ি এগুতে থাকে, তিনিও ছেঁচড়াতে থাকেন মাটিতে।

প্রথম গেট থেকে শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ এবং অন্যান্যদের গ্রেপ্তার করে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে গিয়েছিল। পরে সকলকে ঢাকা জেলখানায় নিয়ে যায়।

১৯৫২ সালের একুশে ফেবরুয়ারির ভাষা-আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হ'লো সেইদিন—সেই ১১ মার্চ।

পুলিশী অত্যাচার এবং গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পরদিন থেকে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলল।

স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বেরিয়ে এলো তারা রাস্তায়; পুলিশের মুখোমুখি।

সেই দুর্ধর্ষ যুবশক্তিকে রোধ ক'রে কা'র সাধ্য? তাদের মনে তখন অপমানের আগুন জ্বলছে দাউ দাউ।

'ওরা আমার মুখের কথা
কাইরা নিতে চায়।

তারা কথায় কথায় শিকল পরায়
আমার হাতে পায়॥

কইতো যাহা আমার দাদায়
কইছে তাহা আমার বাবায়
এখন, কও দেখি ভাই মোর মুখে কি
অন্য কথা শোভা পায়॥

সইমু না আর সইমু না
অন্য কথা কইমু না
যায় যদি ভাই দিমু সাধের জান।'

এই জীবন-পণ প্রতিজ্ঞার কাছে লাঠি, বন্দুক, টিয়ারগ্যাস তো তুচ্ছ। সাধের জান দেওয়ার জন্য হাজার হাজার ছেলে বেরিয়ে এলো রাস্তায়, সরব মিছিলে। স্লোগানে স্লোগানে সচকিত হলো জনতা।

আবার স্লোগান! ব্রিটিশকে তাড়াতে কতো স্লোগান দিয়েছি। ভেবেছিলাম, আর স্লোগানের দরকার হবে না। দরকার হবে না বিক্ষোভ-মিছিলের। কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়ার সাত মাস যেতে-না-যেতেই আবার স্লোগান! জনতা দেখল, ছাত্রদের প্ল্যাকার্ডে লেখা—রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। মুখে সেই একই আওয়াজ।

পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেল ঢাকা শহর। একনাগাড়ে চার দিন ধরে চলল বিক্ষোভ-মিছিল। দাবি ওই একটি—রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়ালেন পরিষদ-সদস্য খয়রাত হোসেন, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, কুমিল্লার তফাজ্জল আলী। কুষ্টিয়ার ডাক্তার আবদুল মোত্তালিব মালিকও সেই সময় ছাত্রদের হ'য়ে কথা বলেছেন। কিন্তু সেটা যে তাঁদের গদি আদায়ের একটা চাল মাত্র,

বোঝা গেল ক'দিন বাদেই। তফাজ্জল আলী আর আবত্নল মোত্তালিব হ'লেন মন্ত্রী আর মোহম্মদ আলী চলে গেলেন বার্মায়, সেখানকার রাষ্ট্রদূতের পদটি হাতিয়ে।* ছাত্রদের দাবি সেদিন মেনে নিতে বাধ্য হ'য়েছিল সরকার। সামান্ত বন্দুক আর টিয়ারগ্যাসে যে তাদের কণ্ঠরোধ করা যাবে না বুঝতে পেরেছিল লীগ-সরকার। ১৫ মার্চ নাজিমউদ্দীন নিজে উত্তোগী হ'য়ে ছাত্র-প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইলেন।

ছাত্র প্রতিনিধিদের মধ্যে নাজিমউদ্দীনের সঙ্গে যাঁরা আলোচনা করতে যান তাঁদের মধ্যে ছিলেন আবুল কাসেম, কমরুদ্দীন আহমদ, মহম্মদ তোয়াহা, নইমুদ্দীন আহমদ, নজরুল ইসলাম, আজিজ আহমদ, আবত্নর রহমান চৌধুরী প্রমুখ।

নাজিমউদ্দীনের সঙ্গে ছাত্র-প্রতিনিধিদের তুমুল তর্ক-বিতর্ক চলে। কিন্তু ছাত্ররা তাদের দাবির প্রতি অনমনীয় থাকার ফলে নাজিমউদ্দীন শেষ পর্যন্ত তাদের সব কটি দাবি মেনে নেন। আট-দফা চুক্তিতে সই করেন সরকারের পক্ষে নাজিমউদ্দীন এবং সংগ্রাম-পরিষদের পক্ষে কমরুদ্দীন আহমদ। চুক্তিটি এই :

এক। ২৯শে ফেবরুয়ারি, ১৯৪৮ সাল হইতে বাংলাভাষার প্রশ্নে যাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দান করা হইবে।

ত্নই। পুলিশ কর্তৃক অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করিয়া এক মাসের মধ্যে এ-বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করিবেন।

তিন। ১৯৪৮ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববাঙলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী আলোচনার জন্তে যে-দিন নির্ধারিত হইয়াছে, সেইদিন বাংলাকে অন্ততম রাষ্ট্রভাষা করিবার এবং তাহাকে পাকিস্তান গণ-পরিষদে এবং কেন্দ্রীয়

সরকারের পরীক্ষা দিতে সমমর্যাদা দানের জন্তে একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

চার। এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে যে, প্রদেশের সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরেজি উঠিয়া যাওয়ার পরই বাংলা তাহার স্থলে সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃত হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যমও হইবে বাংলা। তবে সাধারণভাবে স্কুল-কলেজগুলিতে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দান করা হইবে।

পাঁচ। আন্দোলনে যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের কাহারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

ছয়। সংবাদপত্রের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে।

সাত। ২৯শে ফেবরুয়ারি হইতে পূর্ববাঙলার যে-সকল স্থানে ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে, সেখান হইতে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে।

আট। সংগ্রাম-পরিষদের সাথে আলোচনার পর আমি এ-ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে, এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই। (এই দফাটি নাজিমউদ্দীন নিজের হাতে লেখেন)

ছাত্ররা সেদিন আশ্বস্ত হ'য়েছিল। তাদের প্রথম জয়ে উল্লসিতও হ'য়েছিল। যাক্, অল্পতেই দাবি আদায় হ'য়েছে। কিন্তু নাজিমউদ্দীন এবং কেন্দ্রীয় মুসলিমলীগ কর্তারা বোধ হয় মনে মনে হেসেছিলেন সে-সময়। এখন তো শান্ত হও বাপধনরা। পরে দেখা যাবে। বলে কি না বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ক'রতে হবে। হুঃ। মাঠ-ঘাটের ভাষাকে কি আর রাষ্ট্রভাষা করা চলে। রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু—বাদশাহ্‌দের ভাষা। রাষ্ট্রভাষা হবে নবাববাড়ির ভাষা,

কায়েদ-ই-আজম কায়েদ-ই-মিল্লাতের পরিবারের ভাষা। বাংলা? ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা…

মুসলিমলীগ নেতাদের নির্লজ্জরূপটি প্রকাশ পেল মাত্র আট দিন বাদেই। প্রতিশ্রুতি খেলাপ ক'রলেন তাঁরা। যেমন ক'রে ক'রেছেন লাহোর-প্রস্তাবের খেলাপ। এ যেন মধ্যপ্রাচ্যের নৃপতিদের সঙ্গে ব্রিটিশ-সরকারের চুক্তি ; লঙ্ঘন করার জন্যই চুক্তি-সম্পাদন।

জিন্নাহ্ এই চুক্তি মেনে নিতে অস্বীকৃত হলেন। মহম্মদ তোয়াহা কায়েদ-ই-আজমকে ২৪ তারিখের ওই বৈঠকে জোর দিয়ে বলেন, আমরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

কায়েদ-ই-আজম যুক্তি দেখালেন, একাধিক রাষ্ট্রভাষা হ'লে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন হবে। তিনি একাধিক রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটিকে নজিরবিহীন বলে অভিহিত করেন।

সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদ তোয়াহা তাকে বলেন, যে কানাডা সুইজার-ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রভাষা আছে।

কথাটি নিয়ে জিন্নাহ্‌র সঙ্গে তোয়াহাভাই এবং অলিআহাদ ভাইয়ের মধ্যে জোর তর্ক বেধে যায়। কায়েদ-ই-আজম শেষে খুব রেগে যান। পরে তিনি ছাত্রনেতাদের আলাদা আলাদা ডেকে ধর্মের দোহাই পেড়ে আন্দোলন বানচাল করার চেষ্টা করেন।

৬ এপ্রিল নাজিমউদ্দীন পূর্ববঙ্গের ব্যবস্থাপক পরিষদে ভাষার প্রশ্নে একটি প্রস্তাব আনলেন। তাতে বাংলাকে পূর্ববাঙলার সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে সুপারিশ করতে অস্বীকৃত হ'লেন।

প্রস্তাবটি ছিল এই :

(ক) পূর্ববাঙলা প্রদেশে ইংরাজীর স্থলে বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে ; এবং (খ) পূর্ববাঙলার শিক্ষা-

প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার মাধ্যম হইবে বাংলা অথবা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশ স্কলারদের ভাষা।

প্রস্তাবটি নিয়ে পরিষদে তুমুল বিতর্ক হয়। বিতর্কের পর আহমদ আলী মৃধার ১৬ নম্বর সংশোধনী প্রস্তাবটি নাজিমউদ্দীন সরকার স্বীকার করে নেন। সংশোধনের পর প্রস্তাবটির পাঠ দাঁড়ায় এইরূপ :

(ক) পূর্ববাঙলা প্রদেশে ইংরাজীর স্থলে বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হইবে; এবং যত শীঘ্র বাস্তব অসুবিধাগুলি দূর করা যায়, তত শীঘ্র তাহা কার্যকর করা হইবে। (খ) অংশে 'স্কলার' শব্দের পরিবর্তে 'ছাত্রের' শব্দ ব্যবহৃত হয়।

এরপর নানান কারণে সাময়িকভাবে ভাষা-আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ল।

১৯৫০ সালে নবাবজাদা লিয়াকত আলীর মন্ত্রিসভার শাসনতন্ত্রের মূলনীতি নির্ধারক কমিটী সুপারিশ ক'রলেন, উর্দু'ই হবে পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় ভাষা। কায়েদ-ই-আজমের সুর ধরে কেন্দ্রীয় মুসলিমলীগ নেতারা বললেন, নাজিমউদ্দীনকে ভয় দখিয়ে ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করা হ'য়েছিল। ভারতীয় এবং কম্যুনিস্ট এজেন্টদের সঙ্গে যোগসাজসে কিছু লোক নিয়ে যে-আন্দোলন করা হ'য়েছে তা কোনো জাতীয় আন্দোলন নয়, তার কোনো মূল্যও নেই। সেই সময় আন্দোলনের তোড়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা বানচাল হবার উপক্রম হ'য়েছিল, তাই রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কথা ভেবে সেই চুক্তিতে সেদিন সই ক'রেছিলেন খাজা নাজিমউদ্দীন। আমরা সেই চুক্তি এখন মেনে নিতে পারি না।

বেঈমান! সারা পূর্ববাঙলার ছাত্র-সমাজের ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল সঙ্গে সঙ্গে। ৪৮-এর মার্চের আন্দোলন বৃথা যায় নি।

ছাত্রনেতারা জমায়েত হ'লো ইউনিভারসিটিতে, মধুর ক্যান্টিনে। কর্মসূচী তৈরী হ'লো। চলল আন্দোলন, মিছিল। দেওয়ালে দেওয়ালে আবার পড়ল পোস্টার, কার্টুন।

এবার আর ছাত্ররা একা নয়, তাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন শিক্ষকরাও। দাঁড়ালেন সাংবাদিক আর শিক্ষিত সমাজ। শুধু তাই নয়, নিরক্ষর চাষী-মজুররাও গর্জে উঠল এই অন্যায়ের প্রতিবাদে।

ঢাকা জেলাবোর্ড-হলে ডাকা হ'লো সর্বস্তরের প্রতিনিধিদের মহাসম্মেলন 'Grand National Convention'. সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন প্রথমে আতাউর রহমান, পরে কমরুদ্দীন আহমদ। তিল ধারণের স্থান নেই হলে। বাইরেও শ'-শ' প্রতিনিধির চলছে জটলা। সম্মেলন শেষে বুকভরা জ্বালা নিয়ে ফিরল প্রতিনিধিরা। সে জ্বালা মাতৃভাষার এবং মায়ের অপমানের।

পূর্ববাঙলার সাড়ে চার কোটি অধিবাসীর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হ'লো—উর্দুর পাশে বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে হবে।

রাস্তায় রাস্তায় মিছিল বেরুল। ধ্বনি উঠল: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। মুসলিমলীগ সরকার নিপাত যাক্।

এদিকে কেন্দ্রীয় মুসলিমলীগ নেতাদের মধ্যে তখন ক্ষমতা দখলের লড়াই সুরু হ'য়ে গেছে। অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত মুসলিমলীগ নেতারা প্রমাদ গুনলেন। লিয়াকত-রিপোর্ট নাকচ হ'লো। কিন্তু এক জিন্নাহ্-লিয়াকতআলী-নাজিমউদ্দীন যায়, আর-এক জিন্নাহ্-লিয়াকতআলী-নাজিমউদ্দীন আসে। কায়েমী শাসকেরা যে রক্তবীজের ঝাড়। তাঁদের বিনাশ নেই।

লিয়াকতআলীর পর এলেন ফজলুল রহমান। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুল রহমান। তাঁর মাথা থেকে আর-এক শয়তানি প্যাঁচ বেরুল, বাংলাভাষা লেখা হবে আরবী হরফে। এতদিন কেন্দ্রের চেষ্টা ছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ক'রতে দেবেন না। কিন্তু

এবারে যে গোটা ভাষাটাই সমূলে বিনাশ করার চক্রান্ত। রাষ্ট্র-ভাষার মর্যাদা দেওয়া তো দূরের কথা, বাংলাকে আর বাংলাই রাখা হ'বে না।

ফজলুল রহমান বোঝালেন, এতে আঞ্চলিক বিরোধ দূর হবে। ভাষা তো ঠিকই থাকছে, শুধু হরফের পরিবর্তন হ'লো। বাংলা হরফ তো হিন্দুদের। আরবী ইসলামী হরফ; আরবী হরফেই আমাদের লেখা উচিত।

ফজলুল রহমানের জলের মতো সোজা যুক্তির তাৎপর্য বুঝতে সেদিন কারুই বাকি রইল না। এ যে মাথা কেটে মাথাব্যথা দূর করা!

আবার চলল আন্দোলন, মিছিল, বিক্ষোভ, স্লোগান।

আরবী হরফে বাংলা লেখার বিরুদ্ধে আন্দোলন তখনও স্তিমিত হয় নি, নাজিমউদ্দীন প্রধানমন্ত্রী হ'য়েই আবার দৃঢ়স্বরে ঘোষণা ক'রলেন, উর্দু ই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ঢাকায় নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের অধিবেশনে ওই কথা বললেন তিনি। আবার স্বমূর্তিতে দেখা দিলেন নাজিমউদ্দীন। দিনটি ছিল ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি।

কিন্তু বাংলার ছাত্রদের নাজিমউদ্দীনের তখনো চিনতে বাকি ছিল। তারা যে আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত লাভা জানতে বাকি ছিল মুসলিমলীগ নেতাদের।

এতদিন যে আন্দোলন হ'য়েছে তা তো আগ্নেয়গিরির গুম্ গুম্ ধ্বনি। উত্তপ্ত লাভা উদ্গীরণ তখনো সুরু হয় নি। বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, বার বার সে প্রতিশ্রুতি ভেঙেছে মুসলিমলীগ নেতারা। অসহ্য এই শয়তানি! ছাত্র-সমাজ রোষে ক্ষিপ্ত হ'লো। শিরায় শিরায় প্রবাহিত হ'লো আগুনের হল্‌কা।

সুরু হ'লো মহাসংগ্রামের প্রস্তুতি।

২৭ জানুয়ারি ডাকসুর নেতারা জমায়েত হ'লো মধুর ক্যান্টিনে—ঐতিহাসিক মধুর ক্যান্টিনে। পূর্ববাঙলার বহু ঐতিহাসিক ছাত্র-আন্দোলনের জন্মের নীরব সাক্ষী এই ক্যান্টিন। এখানকার লোহার চেয়ার-টেবিলগুলো বহু শহীদ আর দেশপ্রেমিকের স্পর্শে ধন্য।

সেদিন বায়ান্ন সালের ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলনেরও জন্ম হ'লো এই ক্যান্টিনে। ভাষা-আন্দোলনের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ '৪৮ সনের আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল ফজলুল হক হল। সভা সুরু হ'লো গাজিউল হকের বক্তৃতা দিয়ে।

বুকভরা জ্বালা নিয়ে জ্বালাময়ী ভাষায় গাজিউল হক বলে চলল, 'ভাইসব, ফ্যাসিস্ট লীগ-সরকার আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। নাজিমুদ্দীন কাল বলেছেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। বেঈমান! বেঈমানের দল বার বার আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, চুক্তি করেছে—বাংলাকেও পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। বার বার সে-চুক্তি ভেঙেছে। আজ ওদের কথার জবাব দেবার সময় এসেছে।

'ওরা আমাদের প্রাণের ভাষা, বাপ-দাদার মুখের বলি কেড়ে নিতে চায়। এদেশের মাঝি আর মনের আনন্দে ভাটিয়ালি গান গাইতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-মাইকেল-সুকান্ত আমাদের কাছে হয়ে যাবে ইতিহাসের বস্তু, মায়ের কাছে চিঠি লিখব—উর্দুতে ঠিকানা লিখতে হবে। উর্দু না জানার অপরাধে সরকারি চাকরি-বাকরি থেকে বঞ্চিত থাকবে বাঙলাদেশের ছেলে-মেয়েরা। পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে এসে উর্দুভাষীরা ছেয়ে ফেলবে বাঙলাদেশ। আমাদের বুকের উপর দাঁড়িয়ে আমাদেরই খবরদারি ক'রবে তারা। সোনার বাঙলাকে দেউলে ক'রবে, শুষে নেবে সমস্ত সম্পদ। বাঙালীকে ভিখিরীর জাত বানিয়ে ওরা আমাদের তাদের তাঁবে রাখবে। কেন না ওরা জানে, কায়েমীশাসন বজায় রাখতে হ'লে

বাঙালীকে দমন না করলে চলবে না। বাঙলাদেশ কখনো অন্যায় অবিচার সহ্য ক'রে না। তাই বাঙালীকে আগে শায়েস্তা ক'রো। একটা জাতিকে ধ্বংস করার প্রধান উপায় হ'লো তার ভাষা কেড়ে নেওয়া। ভাষা কেড়ে নিয়ে ওরা আমাদের তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিতে চায়। বজ্রকণ্ঠে আজ তার প্রতিবাদ করার সময় এসেছে। পূর্ববাঙলার সাড়ে চার কোটি লোক আজ ছাত্রসমাজের দিকে উন্মুখ হ'য়ে চেয়ে রয়েছে। মায়ের সম্মান রাখতে এগিয়ে আসুক ছাত্রসমাজ। ঝাঁপিয়ে পড়ুক মহাসংগ্রামে। লীগ-সরকার দেখুক, বাংলার ছাত্রজনতা তথা সাড়ে চার কোটি বাঙালীর অমিত শক্তি। আমরা যদি সকলে মিলিত আওয়াজ তুলি—রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, ফ্যাসিস্ট লীগ-সরকার নিপাত যাক—তাহ'লে শুধু সেই প্রচণ্ড গর্জনের তোড়েই লীগ-সরকার ভেসে যাবে।

একদমে এতগুলি কথা বলে গাজিউল এবার একটু থামল। তাঁর চোখ দিয়ে যেন আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে। চুল উস্কুখুস্কু।

উত্তেজনার দপ্ দপ্ করে জ্বলছে অন্যান্যদের চোখগুলোও। এখনই ঝাঁপিয়ে প'ড়ে শয়তানদের ছিন্নভিন্ন ক'রতে ইচ্ছে ক'রছে। বাইরে আলো প'ড়ে গেছে। শীতের বেলা। কতক্ষণই-বা তার আয়ু।

গাজিউল এবার-গলার স্বর নামিয়ে একই সুরে বলে চলে, 'আমাদের কর্মসূচী তৈরী ক'রতে হবে। শুধু আমাদের আন্দোলনে হবে না। সকল দলের সমর্থন ও সহযোগিতা না পেলে এ আন্দোলন জোরদার হ'য়ে উঠবে না। সব দলের সম্মেলন ডাকা প্রয়োজন। আমাদের সংগ্রাম-কমিটীকে আবার জাগিয়ে তোলা দরকার। প্রত্যেক স্কুল থেকে, প্রত্যেক কলেজ থেকে প্রতিনিধি নিতে হবে। আমরা অলিআহাদভাই, তোয়াহাভাই, মাহবুব-ভাই —এঁদের কাছে যাব, বলব, সর্বদলীয় সংগ্রাম-কমিটী গঠন করবার কথা।'

সকলেই গাজিউল হকের কথায় সায় দিল। সেই সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'লো নাজিমউদ্দীনের কথার প্রতিবাদে ৩০ তারিখে স্কুল-কলেজে ধর্মঘট পালন করা হবে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০ জানুয়ারি ছাত্ররা ধর্মঘট ক'রল। প্রাইমারী স্কুলের কচি কচি শিশুরা পর্যন্ত সেদিন আওয়াজ তুলল: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। আমাদের দাবী মানতে হবে। নইলে গদী ছাড়তে হবে। ঢাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে ধর্মঘট ক'রে ছাত্ররা এসে জমায়েত হ'লো বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে। বেলতলায় দাঁড়িয়ে ছাত্রনেতারা জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে চলল। মাথার ওপরে সূর্য তাপ ছড়াচ্ছে। স্কুলের কচি কচি ছেলেমেয়েদের মুখগুলো রোদের তাপে লাল হ'য়ে উঠেছে। মেয়েরাও আজ চুপ ক'রে ঘরে বসে নেই। ওরাও সাড়া দিয়েছে সে-ডাকে। ছেলেদের পাশে পাশে এগিয়ে চলার সঙ্কল্প আজ ওদের মনে। আলুথালু চুল। চোখে-মুখে তাদের জ্বলন্ত উনোনের গনগনে আঁচ, শপথের দৃঢ়তা। নেতারা বক্তৃতা দিয়ে সে আঁচে হাওয়া দিল। সে হাওয়ায় হৃদয়ে তুফান উঠল। এক সর্বনাশা আক্রোশে মহাসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক এলো। বাঙলার দামাল ছেলেমেয়েদের সে যে কী আগুন ছড়ানো বক্তৃতা! শরীরের রোম শিউরে উঠছে। কানের পর্দায় একের পর এক আঘাত ক'রছে কথার পর কথা: ভাইসব আজ আমাদের শপথ নেবার দিন। আমরা জান দেবো তো মান দেবো না। বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলতে হবে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই···ফ্যাসিস্ট লীগ-সরকারকে দেখিয়ে দিতে হবে আমাদের শক্তি। ওরা জানে না যে, আমরা হাসিমুখে রক্ত দিতে পারি। লীগ-সরকারের টিয়ারগ্যাস আর রাইফেলের ক্ষমতা নেই আমাদের আন্দোলন দমিয়ে দেয়। বাংলা হিন্দুর ভাষা নয়, মুসলমানের ভাষা নয়, বাংলা বাঙালীর ভাষা।···নাজিমউদ্দীন-লিয়াকত আলী নিপাত যাক।

কখনো 'শেম্ শেম্' ধ্বনি, আবার কখনো সহর্ষ করতালিতে মুখরিত হ'লো বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণ।

একসময় সভা শেষ হ'লো। ছেলে-মেয়েরা হৃদয়ে অসহ্য জ্বালা নিয়ে থম্‌থমে মুখে ঘরে ফিরল। সর্বনাশা ঝড়ের আশঙ্কায় সেদিন অনেক মায়ের প্রাণ দুলে উঠেছিল।

৩০ জানুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় ছাত্রপরিষদের সংগ্রাম-কমিটীর ডাকে সাড়া দিয়েছিল নারায়ণগঞ্জের মরগ্যানের ছাত্রীরাও। মমতাজআপার ডাকে বেরিয়ে এসেছে তারা রাস্তায়। উঁচু পাঁচিল-ঘেরা সবুজঘাসে-ঢাকা মরগ্যান গার্লস স্কুলের চত্বরে দাঁড়িয়ে মমতাজআপা অগ্নিবর্ষী ভাষায় ছাত্রীদের সেদিন বলেছিলেন, 'যে-ভাষায় তুমি-আমি কথা বলছি, যে-ভাষায় তোমার আমার মা কথা বলেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে-ভাষায় আমাদের বাপ-দাদারা কথা বলে এসেছেন, লীগ-সরকার আজ আমাদের মুখ থেকে তা কেড়ে নিতে চায়। এই যে মিষ্টি ক'রে তোমরা আজ বাংলা বলছ, বলতে পারবে না। সঙিন উঁচিয়ে ছুটে আসবে সেপাইরা। বলবে উর্দু মে বাত ক'রো। উর্দু পড়তে হবে, লিখতে হবে, বলতে হবে। রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের গান, আব্বাস-উদ্দীনের গানও প্রাণ খুলে তোমরা গাইতে পারবে না।' একটু থেমে মমতাজআপা ছাত্রীদের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন একবার।

সূর্যটা তেতে উঠেছে। থম্ থম্ করছে মেয়েদের ফর্সা মুখ-গুলো। ওরা ওদের প্রিয় মমতাজআপার কথা শুনে চলেছে। কী যেন জাদু আছে সে কথায়। কোথাও টুঁশব্দটি নেই। মমতাজআপা আবার সুরু ক'রলেন, 'আমরা বাঙালী। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। বাঙালী বলে সারা বিশ্বে আজ আমরা গর্ব বোধ করি। বাঙলাদেশে জন্মেছেন সূর্যসেন ক্ষুদিরাম নির্মলসেন বিনয় বাদল দীনেশের মতো ছেলেরা, জন্মেছেন রবীন্দ্রনাথ নজরুল

জসিমউদ্দীন সুকান্ত, জন্মেছেন সুভাষচন্দ্র বসু, জন্মেছেন আব্বাস-উদ্দীন আলাউদ্দীন খানের মতো গায়ক। এমনি আরও কতো সোনার ছেলে বাঙলার মাটিতে জন্মেছেন। ওঁরা আমাদের গর্ব। উর্দু রাষ্ট্রভাষা হ'লে বাঙালী বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে গর্ব করার আর কিছুই থাকবে না।

'একদিন বাঙলার হাজার হাজার ছেলেমেয়ে দেশ স্বাধীন ক'রতে হাসিমুখে ফাঁসিতে ঝুলেছে, আজ তার চেয়েও বড়ো দুর্দিন। ইংরেজের আমলে আমরা অন্তত নিজেদের বাঙালী বলে পরিচয় দিতে পারতুম, লীগ-সরকারের আমলে আমাদের কোনো পরিচয়ই থাকবে না। মাতাপিতার পরিচয়হীন একদল এতিমে পরিণত হবো আমরা। তোমরা কী এর প্রতিবাদ ক'রবে না। মায়ের এতো বড়ো অসম্মান চুপ ক'রে সয়ে যাবে। ছেলেরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। ওরা আওয়াজ তুলছে, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। তোমরাই-বা তুলবে না কেন। এই দুর্দিনে বোরখার আড়ালে থাকলে চলবে না। রাস্তায় বেরিয়ে আসতে হবে। তোমরা যদি আজ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ছেলেদের পাশে গিয়ে না দাঁড়াও তাহলে পূর্ববাঙলার মেয়ে-জাতটার আর মুখ দেখাবার জায়গা থাকবে না। তোমরাও আওয়াজ তোল, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।'

আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে শ'য়ে শ'য়ে মেয়েলি কণ্ঠ চিরে আওয়াজ উঠল : রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

রাস্তায় বেরিয়ে এলো ওরা। স্লোগানে স্লোগানে সারা শহরের লোকের মনে তপ্ত শিহরণ জাগিয়ে দিল। একটু বাদে ছাত্ররাও এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। বাঙলার দামাল ছেলেদের পাশে আজ বাঙলার দামাল মেয়েরাও এসে দাঁড়িয়েছে। নতুন উন্মাদনা, নতুন উত্তেজনায় সকলে চনমনিয়ে উঠেছে। মিছিলের পুরোভাগে রয়েছে মমতাজআপা—ছেলে মেয়ে সকলের মমতাজআপা।

দিনের পর দিন মমতাজআপা আর মোস্তফা সারওয়ারের জ্বালা-ধরানো বক্তৃতায় নারায়ণগঞ্জ শহরটা জেগে-ওঠা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতো গর্জন ক'রতে থাকল। সুপুরুষ বলতে যা বোঝায় মোস্তফা সারওয়ার তাই। সবচেয়ে আকর্ষণীয় তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর দু'টি চোখ। মনে হয়, কোনো শিল্পী তুলি দিয়ে চোখ দুটো এঁকে দিয়েছে। তাঁর ডাকে ঘুমন্তও জেগে ওঠে। কথাশিল্পী মনোজ বসু একবার নারায়ণগঞ্জ গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন আরও কয়েকজন সাহিত্যিক। রহমতুল্লা ক্লাবে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মোস্তফার বক্তৃতা শুনে তিনি বলেছিলেন, 'তুমি নিজেও কাঁদলে, আমাদেরও কাঁদালে।' এমনি ছিল মোস্তফার কণ্ঠের জাদু। ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জে ঢুকবার মুখেই মোস্তফাদের সুন্দর দোতলা বাড়ি। গেট দিয়ে ঢুকতেই পড়ে দুটো পামগাছ। এই বাড়িতে পাকিস্তানের কতো যে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'য়েছে ঠিক নেই। সোহ্‌রাওয়ার্দী, শেখ মুজিব থেকে সুরু ক'রে অনেক নেতার স্মৃতিজড়িত এ-বাড়ি। ভাষা-আন্দোলনে নারায়ণগঞ্জে সবচেয়ে বড়ো দান মোস্তফাদের। ওঁদের পরিবারের ছেলে মেয়ে-বুড়ো-সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে আন্দোলনে। ওঁদের মতো এত নির্যাতিতও আর কেউ নয়।

বিকেলে ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট বার-লাইব্রেরী হলে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হ'লো। হলে মাছি গলবার জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই। বাইরেও অগণিত শ্রোতা দাঁড়িয়ে। যুবনেতাদের জ্বালাময়ী কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে মাইকে। পথ-চলতি মানুষেরাও কাজকর্ম ভুলে শুনছে সেকথা। কথা তো নয় যেন আগুনের ফুল্‌কি।

একসময় মাইকে ভেসে এলো: 'আমাদের সংগ্রাম ফ্যাসিস্ট লীগ-সরকারের বিরুদ্ধে। আমাদের দাবী শুধু বাংলাভাষার

নয়; আমাদের দাবি সকল ভাষার জন্য। আমরা চাই বালুচ, সিন্ধী, উর্দু, পাঞ্জাবী, বাংলা—সব ভাষাই সমান রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করুক। একটি জাতির বিকাশের প্রথম সর্ত হ'লো ভাষার স্বাধীনতা। লীগ-নেতারা বলেন, পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষা। এতগুলো ভাষায় রাষ্ট্রের কাজ চলতে পারে না। তার জন্য একটি ভাষার প্রয়োজন। আর সে প্রয়োজন মেটাবার ক্ষমতা আছে উর্দুর।

'ভাইসব, এটা লীগ-সরকারের একটা ওজর মাত্র। রাশিয়ার মতো দেশে যদি ষোলটি ভাষায় রাষ্ট্রের কাজ চলতে পারে, দলিলপত্র এবং সার্কুলার ষোলটি ভাষায় ছাপা হতে পারে, সেখানে পাকিস্তানে মাত্র ছয়টি ভাষায় কেন রাষ্ট্রের কাজ চলতে পারবে না। অতগুলো ভাষায় রাষ্ট্রের কাজ চলছে বলে সেখানে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে এমন কথাও তো শুনি নি। তবে আমাদের দেশেই-বা মাত্র ছয়টি সরকারি ভাষায় কাজ চলতে পারবে না কেন?

'আমরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। তার মানে এই নয় যে, আমরা শুধু উর্দু আর বাংলাকেই রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানাচ্ছি। আমরা চাই বাংলার সঙ্গে অন্য সব ভাষাও সমান মর্যাদা লাভ করুক।'

শ্রোতাদের মুহুর্মুহু করতালিতে অভিনন্দিত হ'লেন বক্তারা।

সেই সম্মেলনেই আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, খিলাফতে রব্বানী, ছাত্রলীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম-পরিষদ থেকে দু'জন দু'জন ক'রে প্রতিনিধি নিয়ে সর্বদলীয় সংগ্রাম-কমিটী গঠন করা হ'লো। আহ্বায়ক হ'লেন গোলাম মাহবুব। কমিটীতে আবুল হাসেম, আতাউর রহমান খান, কমরুদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল মতিন, খালেক নওয়াজ খান, সামসুল হক প্রমুখ নেতাদের নেওয়া হ'লো।

আটচল্লিশ সালের ভাষা-আন্দোলনের অন্যতম নেতা মুজিবুর

রহমান তখন জেলে। '৪৯ সালের মার্চ মাস থেকে তাঁকে জেলে আটকে রেখেছেন লীগ-সরকার। 'বড্ড বাড়াবাড়ি ক'রছে ছোঁড়াটা। কমুনিস্টদের সঙ্গে মিশে মিশে গোল্লায় গেছে। একপাল ছেলে-ছোকরা জুটিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ক'রছে।' সেই সঙ্গে একটু তাচ্ছিল্যের 'হুঁ' ক'রে জেলে পুরেছেন মুজিবুর রহমানকে। ভেবেছেন, দেখি এবার আন্দোলন ক'রে কে? ভুল ক'রেছেন লীগ-সরকার। বাঙলাদেশে হাজার হাজার মুজিবুর রহমান র'য়েছেন যাঁরা হাসতে হাসতে মৃত্যুবরণ ক'রতে পারেন দেশের কাজে। লীগ-সরকার ভুলে গেছেন যে, বাঙলার ছেলেরা সূর্যসেন-ক্ষুদিরাম-বিনয়-বাদল-দীনেশের উত্তরসূরী। মুজিবুর রহমানকে আটক রেখেও তাই আন্দোলন দমানো গেল না। চাপা দেওয়া গেল না অসন্তোষের আগুন।

চার দিনের চেষ্টায় তৈরী হ'লো বিরাট এক সংগ্রামী ছাত্রজনতা। পরের দিন কর্মসূচী নির্ধারণের জন্য সর্বদলীয় সংগ্রাম-কমিটীর বৈঠক বসল।

সভায় 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' না 'অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' —এ নিয়ে সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল।

আসলে 'রাষ্ট্রভাষা' শব্দটাই স্বৈরাচারী শা-ন-ব্যবস্থার ফল। সাধারণের থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র বলে জাহির করার জন্য শাসক-গোষ্ঠী ভাষার বেড়াজাল সৃষ্টি করেন। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ভাষাকে রাজভাষার মর্যাদা দিয়ে অন্যদের দূরে সরিয়ে রাখেন। নবাবী আমলে বাঙলাদেশের রাজভাষা ছিল ফার্সী। রাজভাষা প্রবর্তন করার উদ্দেশ্যই, সাধারণকে অশিক্ষিত রেখে তাদের ওপর নিজেদের আধিপত্য কায়েমী করে রাখা। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীও তাই চায়। লীগ-শাসনকর্তারা উর্দুভাষী তারা চায় সামান্য কয়েকজনের ভাষা সাড়ে পাঁচকোটি জনতার ওপর চাপিয়ে দিতে। পাকিস্তানের

বিভিন্ন ভাষার লোকেদের শোষণ ক'রে নিজেদের পেট মোটা করার এবং শাসন-ক্ষমতা কায়েমী ক'রবার জন্যই মুসলিমলীগ-সরকার এই জঘন্য ষড়যন্ত্রে মেতেছে।

একজন বললেন, 'অনেকের ধারণা, রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু আর বাংলা—এই আমাদের দাবি। আসলে তা নয়। আমরা চাই প্রত্যেক ভাষাই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করুক। অন্য ভাষার ওপর বাংলা ও উর্দু চাপিয়ে দিলে তাও হবে স্বৈরাচার ও গণতন্ত্র বিরোধী। অনেকে বলেন, পূর্ববঙ্গে উর্দু এবং পশ্চিমপাকিস্তানে বাংলা আবশ্যিক পাঠ্য করা হোক। এটাও অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারের অভিব্যক্তি।

'জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা সে দাবি তুলি নি, বা তুলব না। কারণ আমাদের সংগ্রাম সে নীতির ওপর ভিত্তিশীল নয়, আমাদের সংগ্রাম চলবে লাহোর-রেজুলেশনের নীতি অনুসারে। আমরা চাই পাকিস্তানের প্রত্যেক অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাধিকার।

আর-একজন দাঁড়িয়ে বললেন, 'সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পাঠান এবং বালুচরা যখন নিজেদের ভাষার দাবী তুলছে না তখন আমরা কেন তা নিয়ে মাথা ঘামাই? ওঁরা দাবি তুললে আমরা সমর্থন জানাবো।'

যুবলীগ-নেতা অলি আহাদ জবাব দিলেন, 'আমাদের নেতৃবৃন্দ যখন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে ছিলেন, ব্রিটিশও তখন বলেছিল, ওটা জনসাধারণের দাবি নয়। ওতো মুষ্টিমেয় কয়েক-জনের দাবি। জনসাধারণ চাইলে আমরা বিষয়টা বিবেচনা করতে পারি। কোনো দেশে কোনো কালে সারা দেশের মানুষ প্রথমেই তাদের দাবি জানাতে ছোটে না। নেতারা জনগণের প্রতিনিধি। নেতাদের দাবিই জনসাধারণের দাবি। ব্রিটিশদেরও তাই আমরা

জবাব দিয়েছিলাম, আমরা সারা দেশের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত ক'রেছি। জনতার কল্যাণের জন্যই পূর্ণস্বাধীনতা প্রয়োজন বলেই আমরা এই দাবি তুলেছি।'

'আমাদের উত্তরও হবে তাই। নিপীড়িত সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পাঠান, বালুচ আজও ভাষার ক্ষেত্রে তাদের ন্যায্য দাবী কী, কী তাদের পাওনা তাই জানে না। তাই চুপ করে আছে তারা। শাসকগোষ্ঠী তাদের মরফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে।

'ভাষার অধিকার প্রত্যেক জাতির জন্মগত অধিকার। কাজেই সে দাবি উঠল কি না সে বিবেচনা অবান্তর। ওরা চাইলে আমরা ওদের সমর্থন ক'রব এটা প্রতিক্রিয়াশীলদের কথা হ'লো। ওদেরকে সজাগ করার দায়িত্ব আমাদের। আমাদের কণ্ঠেই ওরা ওদের দাবি শুনে সচেতন হবে। ওদের অন্ধকারে রেখে দেশের যথার্থ উন্নতি কখনোই হ'তে পারে না। তাই আমাদের আওয়াজ তুলতে হবে, সকল ভাষার সমান মর্যাদা চাই। অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।'

'কিন্তু সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পশতু, বালুচের মতো অনগ্রসর ভাষাকে কী রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া ঠিক হবে? এগুলো আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে থাকাই বোধ হয় ভালো।' বললেন জনৈক সদস্য।

অলি আহাদ ভাই তারই জবাব দিতে যাচ্ছিলেন। তার কথা কেড়ে নিয়ে মোহম্মদ তোয়াহা দৃপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তার জন্য দায়ী কে? বালুচ, পাঠান, সিন্ধী এবং পাঞ্জাবীরা, না দেশের সরকার। অতীতে ব্রিটিশ তাদের ভাষা বিকশিত হ'তে দেয়নি আর এখন দিচ্ছে না মুসলিমলীগ-সরকার। দেশ আজ স্বাধীন হ'য়েছে। আজও কি লাখ লাখ সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পাঠান, বালুচ নিজেদের বাঁচার অধিকার পাবে না? রাষ্ট্রের কাজে যোগ দিতে পারবে না? সিন্ধু, পাঞ্জাব,

বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের বেশিরভাগ লোকই কৃষক। তারা নিজেদের মাতৃভাষা ছাড়া অন্যভাষা বোঝে না। তারা না জানে উর্দু, না বাংলা। তাদের ওপর জোর ক'রে বাংলা বা উর্দু চাপিয়ে দিলে ঘোরতর অন্যায় হবে। প্রত্যেক জাতির বিকাশের অপরিহার্য সর্ত হ'লো তার ভাষার স্বাধিকার। ওইসব ভাষা অনগ্রসর বলেই তাদের ভাষা বিকাশের সুযোগ দিতে হবে বেশি যাতে লাখ লাখ জনতার সামনে আলোর দুয়ার খুলে যায়। অন্যদের পাশে তারাও দেশের কাজে এগিয়ে আসতে পারে। তাহ'লেই তো উন্নত হবে, শক্তিশালী হবে দেশ। সকল অঞ্চলের শক্তির উপরই যে দেশের শক্তি নির্ভরশীল। তাই আমাদের দাবি হওয়া উচিত, অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।'

নীতিগত ভাবে ওই ধ্বনি তোলারই সিদ্ধান্ত হ'লো। পোস্টার প্ল্যাকার্ডে ওই কথাই লেখা হ'লো। কিন্তু আন্দোলন যখন দুর্বার হ'য়ে উঠল, তখন সকলের অজান্তে কখন যে 'অন্যতম' শব্দটি খসে পড়ল কেউ জানে না। হয়তো স্লোগান দেবার অসুবিধার জন্যেই তা বাদ পড়েছিল। যাক সে কথা। সভায় ঠিক হ'লো, ৪ ফেবরুয়ারি ঢাকার সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ডাকা হবে। শোভাযাত্রা আর সভা-অনুষ্ঠান ক'রে আমাদের দাবি জানাতে হবে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৪ ফেবরুয়ারি ছাত্ররা ধর্মঘট পালন ক'রল। 'ভাষার উপর হামলা চলবে না। ফ্যাসিস্ট নাজিম নিপাত যাও। নাজিম চক্রান্ত ব্যর্থ করুন। সভা-শোভাযাত্রায় যোগ দিন। বাংলাভাষা জিন্দাবাদ।'—এইসব স্লোগান দিতে দিতে ছাত্ররা দুপুরের গলানো পিচের রাস্তা দিয়ে শোভাযাত্রা ক'রে গেল। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত নেমে এসেছে রাস্তায়। পুলিশ সেদিন নীরবে দেখে গেল সব। কিছুই বলল না।

বিকেলে সংগ্রাম-কমিটীর তরফ থেকে জনসভা ডাকা হ'য়েছিল।

সভায় মওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম ও অন্যান্যরা তীব্রভাষায় লীগ-সরকারের নিন্দা ক'রলেন। বাংলাভাষার দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'লো সভায়। ঠিক হ'লো একুশে ফেবরুয়ারি ভাষা-দিবস হিসাবে পালন করা হবে। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে প্রদেশব্যাপী ডাক দেওয়া হবে সর্বাত্মক হরতালের।

ছাত্রসংগ্রাম-পরিষদ সংগ্রাম পরিচালনার জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১১ ও ১৩ ফেবরুয়ারি পতাকাদিবস ঘোষণা ক'রল। কৌটো নিয়ে বের হ'লো হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে। পথেঘাটে ট্রেনে বাসে যাত্রীদের বুকে তারা পরিয়ে দিল 'অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'—লেখা কাগজের ব্যাজ। জনসাধারণ স্বতস্ফূর্তভাবে সাড়া দিল। ব্যাজ পরবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। ছাত্রদের কৌটোয় পয়সা ফেলে তারা ধন্য হতে চায়। জানতে চায়, এ সংগ্রামের পিছনে আছে সাড়ে চার কোটি জনতার অকুণ্ঠ সমর্থন। মাভৈঃ। এগিয়ে চলো।

এতদিন ভাষা-আন্দোলনের বড়ো সহায় ছিল পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকা। ১৩ ফেবরুয়ারি পত্রিকাটির প্রকাশন বন্ধ ক'রে দিল লীগ-সরকার। পত্রিকার সম্পাদক আবদুস সালাম সাহেবকে গ্রেপ্তার ক'রলেন সরকার। অবজারভার বন্ধ হওয়াতে প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে গণ-আন্দোলনের খবরাখবর পৌঁছানোর বেশ অসুবিধা হ'লো। তখন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একমাত্র মুখপত্র রইল সাপ্তাহিক ইত্তেফাক। কিন্তু একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা আর কতো ক'রবে। তবে সুবিধে ছিল যে, তার আগেই সারা দেশের লোকের কাছে একুশে ফেবরুয়ারির ডাক পৌঁছে গেছে। শহরে, বন্দরে, গ্রামে, একুশের প্রস্তুতি চলছে। সে ডাকে সাড়া দেবার জন্য তৈরী হচ্ছে সবাই।

ছাত্রদের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে চাষী, মজদুর আর সাধারণ মানুষ। আওয়াজ তুলছে : রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। আমাদের দাবি মানতে হবে। মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়া চলবে না—চলবে না।

দেখতে দেখতে একুশে ফেবরুয়ারি এগিয়ে এলো। ওই দিনই প্রাদেশিক পরিষদে বাজেট অধিবেশন। সারা শহর পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাব।

আগের দিন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ঢাকা বেতার থেকেও একশ' চুয়াল্লিশ ধারা জারির কথা ঘোষণা করা হ'লো।

ঘোষণা শুনে সারা শহরটা থম্ থমে হ'য়ে উঠল। রিক্সাওয়ালা থেকে দোকানদার পর্যন্ত রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে দ্রুত ঘরে ফিরে চলল।

দোকান-পাট সকাল-সকাল বন্ধ হ'য়ে গেল। আটটার মধ্যে ঢাকা শহরে গভীর নীরবতা নেমে এলো।

ফোনে যোগাযোগ ক'রে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই সর্বদলীয় সংগ্রাম-কমিটীর সভা বসল। এ অবস্থায় কী করা উচিত? কর্তব্য নির্ধারণ নিয়ে সদস্যদের মধ্যে তীব্র মত-পার্থক্য দেখা দিল। রাজনৈতিক দলের নেতারা জানালেন, এ অবস্থায় আমাদের একশ' চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করা উচিত নয়। চুয়াল্লিশধারা ভঙ্গ ক'রতে গেলে ব্যাপক গোলযোগ দেখা দিতে পারে। লীগ-সরকার সেই অজুহাতে আগামী সাধারণ নির্বাচন বন্ধ ক'রে দিতে পারেন।

নির্বাচন বন্ধ হবার ভয়ে ভাষা-আন্দোলন স্থগিত থাকবে! সাড়ে চার কোটি মানুষের প্রাণের দাবি থেকে গদির মোহ বড়ো হ'লো! অবাক হ'লেন অলি আহাদ। কিন্তু তিনি ভুলে গিয়ে ছিলেন দুনিয়ার সকলে মওলানা ভাসানী বা অলি আহাদ নন যে গদির মোহ থাকবে না। '৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট যখন বিপুল ভোটে জয়ী হ'লো ফজলুল হক হ'লেন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার

প্রধান। মন্ত্রিসভা গঠনের সময় শ'খানেক পরিষদ-সদস্য মন্ত্রী হওয়ার জন্য নাওয়া-খাওয়া ভুলে দিন-রাত হকসাহেবের কাছে হাঁটাহাঁটি সুরু ক'রে দিলেন। হকসাহেব এতে খুব অসন্তুষ্ট হ'লেন। এরা কী দেশের কাজ ক'রতে এসেছে না মন্ত্রিত্বলাভই একমাত্র মোক্ষ? কিন্তু লীগ্‌লীগরই হকসাহেব এমন লোকেরও সাক্ষাৎ পেলেন যিনি তাঁকে মন্ত্রী না করার জন্য হকসাহেবের কাছে ধর্না দিয়েছিলেন।

হকসাহেক ঠিক ক'রেছিলেন অলি আহাদকে মন্ত্রিসভায় নেবেন। খবর পেয়েই অলি আহাদ ছুটে এলেন। বললেন, 'আমি কী অপরাধ ক'রেছি হুজুর যে সাধারণ মানুষকে সেবা করা থেকে আমাকে বঞ্চিত ক'রতে চলেছেন, দয়া করে আমাকে মন্ত্রী ক'রবেন না। আমাকে জনসাধারণের কাছ থেকে নির্বাসিত ক'রবেন না।' আনন্দে হক সাহেবের চোখ দু'টি জলে ভরে উঠল। বললেন, 'অলি আহাদের মতো ছেলেও তাহ'লে এ-দেশে আছে যারা মন্ত্রিত্ব দিতে চাইলেও নিতে চায় না! আমি যেন নতুন আলো দেখতে পাচ্ছি।'

সেই অলি আহাদ কী ক'রে মেনে নেবে ওই যুক্তি? তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, 'নির্বাচন পণ্ড এবং গুলি একশ' চুয়াল্লিশ ধারার ভয়েই যদি আমরা আমাদের আন্দোলন থেকে পিছিয়ে পড়ি তা'হলে কোনদিনই আমাদের দাবি আদায় হবে না। লীগ-সরকারের বেঅনেট আর টিয়ারগ্যাসকে ভয় ক'রলে আন্দোলনে নামা বৃথা। আমরা তো আগেই জানি লীগ-সরকার আমাদের ওপর সব রকম দমন-নীতিই চালাবে। বিনা সংঘর্ষে আমাদের দাবি তারা মেনে নেবে যদি কেউ মনে ক'রে থাকি তা'হলে মূর্খের স্বর্গে বাস ক'রছি।

'১৪৪ ধারা কাল অমান্য ক'রতেই হবে। তা অমান্য না করার

অর্থ হবে, সরকারি দমন-নীতির কাছে বশ্যতা স্বীকার করা এবং জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা।'

এমন সময় সলিমুল্লাহ্ হলে মীটিং সেরে এসে দু'জন ছাত্র-প্রতিনিধি জানাল, তারা কাল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারি দমন-নীতির কাছে কিছুতেই তারা মাথা নোয়াবে না।

কিন্তু সর্বদলীয় কর্মপরিষদের বৈঠকে ১১-৪ ভোটে ১৪৪ ধারা অমান্য না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'লো এবং আরও বলা হ'লো এই সিদ্ধান্ত অমান্য ক'রে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ ক'রলে এই কর্মপরিষদ সঙ্গে সঙ্গে বাতিল বলে ধরে নেওয়া হবে।

ওদিকে ছাত্ররা তাদের সিদ্ধান্তে অটল। গভীর রাত পর্যন্ত হলগুলোতে আলোচনার পর আলোচনা চলল। রক্ত দেওয়ার জন্য ছাত্র উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে। কখন ভোর হয়। কখন একুশে ফেবরুয়ারির সূর্য ওঠে সেই প্রতীক্ষা ক'রছে তারা।

২১ ফেবরুয়ারি।

বেশির ভাগ দোকানপাট বন্ধ রয়েছে। রাস্তায় যানবাহন খুব কম। যে-সব দোকান খুলেছে ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকরা গিয়ে অনুরোধ জানাতেই বন্ধ ক'রে দিচ্ছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যানবাহন চলাচলও কমে এলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ভ্যানের পর ভ্যান পুলিশ এসে জমায়েত হ'তে লাগল। মাথায় হেলমেট। কোমরে টিয়ারগ্যাসের বাক্স। কারো হাতে লাঠি, কারো-বা বেঅনেট লাগানো রাইফেল। সূর্যের আলোয় বেঅনেটগুলি চক চক ক'রছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের রাস্তাটা ব্যারিকেড ক'রে দাঁড়িয়েছে তারা। বেলা দশটা থেকেই একে একে ছাত্ররা জমায়েত হ'তে শুরু ক'রলো বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে। মেয়েরাও

আসছে। দৃঢ় পদক্ষেপে পুলিশের ব্যূহ ভেদ ক'রে চলে আসছে তারা। ভয়-ডর আজ কোথায় উবে গেছে জানি না। রক্তে জেগেছে সর্বনাশা মাতন।

বারোটায় সভা শুরু হ'লো গাজিউলের সভাপতিত্বে। বেলতলায় দাঁড়িয়ে ছাত্রনেতারা বক্তৃতা দিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণ গিসগিস ক'রছে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীতে। সারা শহরের সমস্ত স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ভেঙে পড়েছে আজ এখানে। মহাসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্‌গ্রীব সবাই।

বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটীর আহ্বায়ক আবদুল মতিন দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'ভাইসব, ফ্যাসিস্ট লীগ-সরকার আমাদের দাবি বানচাল করার জন্য ১৪৪ ধারা জারি ক'রেছে। কিন্তু কাপুরুষের মতো আমরা পিছিয়ে যেতে পারি না। নুরুল আমিনের জেলে কতো জায়গা আছে আমরা দেখতে চাই। দেশ আমাদের ডাক দিয়েছে। মায়ের অপমান মুখ বুজে সহ্য করার চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়। মরণে আমাদের ভয় কী? রক্ত ছাড়া কবে কোন্ আন্দোলন হ'য়েছে। বাঙলার সাড়ে চার কোটি লোক আমাদের দিকে উন্মুখ হ'য়ে তাকিয়ে আছে। আম্মা সজল চোখে তাঁর অপমানের প্রতিকার ক'রতে ডাক দিয়েছে।

'বলুন, আপনারা সে ডাকে সাড়া দিয়ে একশ' চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ ক'রবেন, না ঘরে ফিরে যাবেন?'

সহস্রকণ্ঠে চীৎকার ওঠে: 'আমরা একশ' চুয়াল্লিশ ধারা মানি না—মানব না।' উত্তেজনায়, রোদের তাপে রক্ত ফেটে পড়তে চায় তাদের চোখেমুখে।

সেই প্রচণ্ড গর্জনে বাইরে দাঁড়ানো পুলিশদের মনেও বুঝি শিহরণ জাগে।

এমন সময় সর্বদলীয় কর্মপরিষদ থেকে শামসুল হক এলেন।

ছাত্রদের বোঝাতে চেষ্টা ক'রলেন কেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা উচিত নয়।

'কাপুরুষদের কথা শুনতে চাই না। বসে পড়ুন।' হাজার কণ্ঠে চীৎকার ওঠে। কেউ কেউ টিপ্পনী কাটে: 'ঘরে গিয়ে চুড়ি প'রে বসে থাকুন।' শামস্থল হক অগত্যা বসে পড়লেন।

এই সময় ছাত্রনেতা আবছুস সাত্তার একটা প্রস্তাব দিল। বলল, 'দশজন দশজন ক'রে বেরুলে একদিকে আইনও অমান্য করা হবে, অন্য দিকে ব্যাপক গোলযোগও এড়ানো যাবে।'

এ প্রস্তাব মেনে নিতে আপত্তি নেই। সকলেই এতে সায় দিল। দশজন দশজন ক'রে এক-একটা দল তৈরী হ'তে লাগল। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। নাজিম-মুরুল নিপাত যাক্। চুয়াল্লিশ ধারা মানি না—মানব না। চলো চলো এ্যাসেম্বলি চলো।' ধ্বনি দিতে দিতে প্রথম দলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

পুলিশবাহিনী সচকিত হ'য়ে ওঠে। হুইসল বাজে। মাইকে জনৈক পুলিশ অফিসারের কণ্ঠ ভেসে এলো: 'আপনারা বেরুবেন না। বেরুলেই গ্রেপ্তার ক'রব।'

কিন্তু 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ধ্বনির গর্জনে সে কথা ডুবে গেল।

এগিয়ে গেল প্রথম 'দশজনী মিছিলটি।' গেটের বাইরে আসতেই এক ঝাঁক পুলিশ এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তাদের ওপর। টেনে হিঁচড়ে তুলল ট্রাকে। ট্রাকের ওপরে দাঁড়িয়েও ওরা আওয়াজ তোলে: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। সে ধ্বনিতে শিরায় শিরায় তপ্ত তরল স্রোত বয়ে গেল সকলের দেহে।

এবারে দ্বিতীয় দলটি এগিয়ে গেল। এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট, ভেটেনারী স্কুল, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট আর কমার্শিয়াল কলেজের ছাত্ররা যোগ দিয়েছে এবার। গ্রেপ্তার হ'লো তারাও। আবার দশজন বেরুলো। পুরোভাগে টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ছাত্ররা।

মুহুর্মুহু আওয়াজ উঠছে, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। গ্রেপ্তার হবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল, কার আগে কে যাবে। বেরুচ্ছে আর গ্রেপ্তার হ'চ্ছে। প্রত্যেকেরই মুখে একই প্রশ্ন, দেখি, জেলে কতো জায়গা আছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসের ছাত্র থেকে সুরু ক'রে ক্লাস ফোর-এর ছাত্রটি পর্যন্ত নির্ভীক চিত্তে এগিয়ে গেল পুলিশ কর্ডনের দিকে। পা একটুও টলল না। শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি কেউ বাদ গেল না।

মেয়েদের একটা দল এগিয়ে চলল। কোমরে আঁচল গুঁজে দৃপ্ত ভঙ্গিতে এগোচ্ছে তারা। মুখে স্লোগান: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। সে কী দৃশ্য। উত্তেজনায় মাথা দপ্‌দপ্‌ ক'রছে। মেয়েদের এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা বেড়ে গেল আরও। পুলিশের ট্রাকে আর জায়গা নেই।

পর পর কয়েকটা 'দশজনী মিছিল' এগিয়ে গেল। হঠাৎ বিনা প্ররোচনায় একজন পুলিশ-অফিসার বুটের লাথিতে ফেলে দিল একটি স্কুলের ছেলেকে। ছেলেটি ধুলি ছেড়ে উঠে পুলিশ-অফিসারটির মুখে থু থু ছিঁটিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে চার-পাঁচটি পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর হিংস্র নেকড়ের মতো। লাঠি পড়তে লাগল এলোপাথাড়ি। ছাত্ররা ক্রোধে ফেটে পড়ে। হৈ-হৈ চীৎকার ওঠে। ঝাঁকে ঝাঁকে ঢিল ছুটে যায় ওদের দিকে। মুহূর্তে টিয়ার-গ্যাসের একটা শেল এসে পড়ল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে। ধোঁয়ায় ভরে গেল জায়গাটা। সবাই দৌড়চ্ছে পুকুরে। রুমাল আর ওড়না ভিজিয়ে চোখে দিচ্ছে। এক হাতে চোখে রুমাল চেপে অন্য হাতে এলোপাথাড়ি ঢিল ছুড়ছে একদল। পুলিশও অনবরত একটার পর একটা টিয়ারগ্যাস শেল ছুড়ে চলেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে আমগাছটায় সবে গুটি ধরেছিল। তাজা তাজা গুটিগুলো টিয়ারগ্যাসে কালো হ'য়ে গেল। কাঁদুনে গ্যাসের

অসহ্য জ্বালায় ক্রমশ পিছু হটছে। অনেকে ছেলেরা মেডিকেল কলেজে চলে গেল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে পুলিশ আক্রমণ চালাবে ভাবে নি কেউ। সূর্য তখন মাথার ওপর উঠে গেছে। গন্‌গন্‌ ক'রে জ্বলছে। আগুনের মতো তাত ছড়িয়ে পড়ছে নিচে। গরম হয়ে উঠছে সব। মাঠ, রাস্তা, মানুষ।

শেষ বারের মতো ফুঁসে উঠল সকলে: মার শালাদের। ছুটল ঢিল। কিন্তু কতোক্ষণ আর। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্ররা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ল মেডিকেল কলেজে।

রাস্তায় দাঁড়ানো চাপরাশী, রিক্সাওয়ালা এবং সাধারণ মানুষ কতক্ষণ আর মুখ বুজে সইবে নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর পুলিশী জুলুম। ঢিল ছুড়তে সুরু ক'রল তারাও। একদল পুলিশ তাদের পিছু তাড়া ক'রল। নিরস্ত্র জনতা আর সশস্ত্র পুলিশে চলল সংঘর্ষ।

পুলিশ মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসেও টিয়ারগ্যাস ছুড়ল। রোগীদের কথাও ওরা একবারও ভাবল না। রোগীরা কাশছে আর কম্বলে জড়িয়ে নিচ্ছে চোখ।

ডাক্তার আর নার্সরা ওষুধ, সিরিঞ্জ, ব্যাণ্ডেজের কাপড় নিয়ে করিডর দিয়ে দৌড়ুচ্ছেন এক হাতে নাক-মুখ চেপে।

ইমারজেন্সিতে ছোটো-বড়ো-মাঝারি নানা বয়সের ছাত্রছাত্রী গ্যাসের আক্রমণে কাতরাচ্ছে। পেট চাপড়াচ্ছে।

এক জায়গায় দু'জন মেডিকেলের থার্ড-ইয়ারের ছাত্রী ড্রপারে ক'রে চোখে ঢেলে দিচ্ছে লিকুইড প্যারাফিন। চোখ রগড়ে নিয়ে ছাত্ররা আবার এগিয়ে যাচ্ছে রণাঙ্গনে।

পুলিশ মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসে ঢুকে পড়তে চেষ্টা ক'রছে। মরিয়া হ'য়ে সবাই বাধা দিল। সার্ট ভিজে গেছে ঘামে। হাতে ফোস্কা পড়ে গেছে সকলের ঢিল ছুড়ে ছুড়ে।

পুলিশ সমানে টিয়ারগ্যাস ছুড়ে চলেছে। ধোঁয়াটে হ'য়ে গেছে মেডিকেল কলেজের বাতাস।

সমুদ্রতরঙ্গের মতো ফেনায়িত হ'য়ে উঠছে ছাত্রদের বিক্ষোভ। ছুটো পর্যন্ত একটানা সংঘর্ষ চলল।

তিনটায় পরিষদের অধিবেশন। ঠিক হ'লো দশজন দশজন ক'রে ছাত্ররা পরিষদ-ভবনে যাবে। এম. এল. এ.-দের কাছে জানানো হবে বাঙালা দেশের মানুষের দাবি—প্রাণের দাবি।

ঘণ্টাখানেক বিরাম।

তিনটে বাজে প্রায়। অধিবেশন বসার সময় হ'য়ে এসেছে। কয়েকজন সরকারি দলের এম. এল. এ. কে নিয়ে একটা জীপ ছুটে গেল। ছাত্ররা ধ্বনি তুলল: রাষ্ট্রভাষা—বাংলা চাই।

শিমুলগাছটা থেকে টুপ্-টুপ্ ছুটো লাল ফুল ঝরে পড়ল।

স্লোগান শুনে ক্লান্ত পুলিশরা মাটি থেকে আবার উঠে দাঁড়াল। পোশাক ঠিকঠাক ক'রে, বেল্টটা কষে নিল। বারোটা থেকে এক-নাগাড়ে লাঠি চালিয়ে চালিয়ে আর টিয়ারগ্যাস ছুড়ে ছুড়ে ওরাও বড়ো ক্লান্ত। তাই একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল।

ইন্‌জিনীয়ারিং কলেজ গেটেও ছাত্ররা জমায়েত হ'ল এবার। আওয়াজ উঠছে, রাষ্ট্রভাষা—বাংলা চাই।

ছাত্রদের কণ্ঠে মুহুর্মুহু ধ্বনি: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই—চলো চলো এ্যাসেমব্লি চলো।

একজন পুলিশ-অফিসার চীৎকার ক'রে বললেন, ছু'জন প্রতিনিধি গিয়ে আপনাদের বক্তব্য এ্যাসেমব্লিতে বলে আস্থন।

ছাত্ররা থমকে দাঁড়াল। একে অন্যের দিকে জিজ্ঞাস্থ দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর ফিস ফিস গুঞ্জন উঠল।

একজন চীৎকার ক'রে বলে উঠল, 'ভাইসব, আন্দোলন বানচাল করার এটা একটা চাল। ওরা আমাদের নিষ্ক্রিয় ক'রে রেখে নিজেরা

তৈরী হ'য়ে নিতে চায়। প্রতারকদের কথায় ভুলবেন না। আওয়াজ তুলুন, রাষ্ট্রভাষা—বাংলা চাই…'

সঙ্গে সঙ্গে টিয়ারগ্যাসের শেল ফাটল অদূরে। ধোঁয়ায় সব কিছু অস্পষ্ট। ছুটো-ছুটি পড়ে গেল। চোখে রুমাল চেপেও আওয়াজ তুলল ছাত্ররা, পুলিশী জুলুম চলবে না—রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। মুহূর্তে সেই কথা ছাপিয়ে বাজ পড়ার মতো একটা গর্জন উঠল। এ কী! এ তো টিয়ারগ্যাস শেল ফাটার শব্দ নয়। কিসের আওয়াজ তবে! কে যেন চীৎকার ক'রে বলল: বেইমানের দল গুলি চালিয়েছে, সাবধান। রাশি রাশি ইটের খোয়া এনে ছুড়ছে সকলে পুলিশদের দিকে। পুলিশরা এবারে ঢুকে পড়ছে হোস্টেলে।

ওপরে উঠে ঢিল ছুড়ছিল অনেকে। টিয়ারগ্যাস শেল ফাটল আবার। ধোঁয়ায় ভরে গেল জায়গাটা। চোখ জ্বালা ক'রছে সকলের। আবার আওয়াজ উঠল, গুড়ুম্…

গুলি চালাবার আগে 'লাল ফ্লাগ' দেখানোর কথা। কই সেই সিগন্যাল! ওরা ছাত্রদের সতর্ক হ'তে দিতে চায় না। মারতে চায়। মেরে তাদের কণ্ঠ রোধ ক'রতে চায়। কতো মারবে ওরা? পাঁচ কোটি মানুষকে কী মারতে পারবে ওরা? অত বুলেট কী আছে লীগ-সরকারের?

দেখা গেল, কয়েক জনে একটি অল্প বয়স্ক ছেলেকে ধরাধরি ক'রে দ্রুত ছুটে যাচ্ছে ইমার্জেন্সি রুমের দিকে। বোধহয় সিক্স-সেভেনের ছাত্র হবে। মায়া মাখানো কচি মুখটি তার যন্ত্রণায় বিকৃত হ'য়ে পড়েছে। গায়ের সার্ট রক্তে ভিজে সপ্‌সপে হ'য়েও রক্ত পড়ছে বড়ো বড়ো ফোঁটায়, মাটিতে।

ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়ে পড়ে কাঁকর-বিছানো পথের ওপর দীর্ঘ মালা গাথা হ'য়ে চলেছে।

আবার গুলির আওয়াজ শোনা গেল।

ইমারজেন্সি-রুমে ভিড় ঠেলে সকলে গেলাম। যাদের শরীর ছড়ে গেছে বা কেটে গেছে এবং যারা চোখে প্যারাফিন লাগাবার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল সকলের কণ্ঠে চীৎকার ওঠে: 'এ কি! গুলি ছুড়েছে!' মিনতি ভরা গলায় নার্স আর ডাক্তারদের তারা বলে, আমাদের দেখতে হবে না, একে দেখুন।'

বলতে হয় না। তার আগেই নার্স আর ডাক্তাররা ছুটে এসেছে। নার্সদের কাছে মৃত্যু জিনিসটা খুবই স্বাভাবিক হ'য়ে গেছে। সর্বদাই দেখছে কতো কতো লোকের মৃত্যু। মৃত্যু দেখে ওঁরা বিচলিত হন না। কিন্তু জব্বারের রক্তাক্ত দেহ দেখে স্থির থাকতে পারছে না তাঁরাও। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল একজন নার্স। জানি না কান্নার আবেগে অথবা আক্রোশে।

জব্বারের দেহ ততক্ষণে নিথর হ'য়ে গেছে।

পরক্ষণেই আরও কয়েকটি ছেলে নিয়ে এলো গুলিবিদ্ধ আর-একটি ছেলের দেহ। তাজা রক্ত গলগল ক'রে পড়ছে মাথার খুলি থেকে। সে দেহেও প্রাণ নেই। নাম জানা গেল, রফিক।

বাইরে তখনো চোখ জ্বালা ধরানো টিয়ারগ্যাসের ঝাঁজ। ছাত্রাবাসের ভিতরের কলে অনেকে রুমাল ভিজিয়ে নিচ্ছে, ছাত্রীরা শাড়ির আঁচল ভিজিয়ে নিচ্ছে। গলগল ক'রে জল পড়ে চলেছে। কলের কাছে ভিড় জমে উঠেছে।

গেটের দিকে আওয়াজ শোনা গেল।

গুড়ুম-দড়াম্-ফুস্স গুড়ুম্-দড়াম্-ফুস্স—গুলি আর টিয়ারগ্যাস শেল ফাটার আওয়াজ মিলিমিশে একাকার। ধোঁয়ায় কাছের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। শেষে জলে ভেজানো রুমালও শুকিয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে শুধু ছাত্রছাত্রীরা বলছে, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

কিছুক্ষণ বাদে ইমারজেন্সি-রুমে গিয়ে দেখা গেল, গুলি লেগেছে

আরো অনেকের। ডাক্তার, নার্স আর মেডিকেল স্টুডেন্টরা মেসিনের মতো কাজ ক'রে চলেছে। অবিচলিত অথচ দৃঢ় হস্তে অপারেশন ক'রে গুলি বের ক'রে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে একের পর এক।

একের পর এক আসছে গুলিবিদ্ধ দেহ। লাঠির ঘায়ে মাথা ফেটেছে কারু। অতিরিক্ত টিয়ারগ্যাসের যন্ত্রণায় ছটফট ক'রতে ক'রতে আসছে কেউ। হু হু ক'রে আহতদের সংখ্যা বেড়ে চলে। বেড নেই আর। মেঝেতে কম্বল পেতে দিয়ে শয্যার ব্যবস্থা করা হ'লো শেষে।

দাবাগ্নির মতো ছড়িয়ে পড়ল গুলির খবর। রিকসাওয়ালা আর পথচারিদের মুখে মুখে খবর ছড়িয়ে পড়ে শহরের একপ্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে। রাস্তায় চলছে জটলা। মানুষ ভুলে গেছে একশ' চুয়াল্লিশ ধারার কথা। কিংবা মনে থাকলেও সাধারণ মানুষ আজ ছাত্রদের মতো লীগ-সরকারের আইন ভঙ্গ ক'রবার জন্ম ক্ষিপ্ত হ'য়ে গেছে।

যেতে যেতে কোনো পথচারি জটলার মাঝে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে, কোথায় গুলি ছুড়েছে? কয়জন মারা গেছে?

কে কার উত্তর দেয়। কেউ বলে দশজন, কেউ বলে পাঁচ জন, কেউ-বা বলে সতের জন মারা গেছে। একজন তো বলে, আমার সামনেই তো পাঁচ জনকে নিয়ে যেতে দেখেছি হাসপাতালে। উঃ সে কী রক্ত!

আর-একজন বলে ওঠে, 'আহা রে, কচি কচি ছেলেদের এমনি মারে! কশাই কশাই! ওরা কশাই।'

একজন রিকসাওয়ালা আর-একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস ক'রে, একঠো রিকসাওয়ালা ভি মরিস্ গুলিমে?

কিছুক্ষণ থেকে গুলির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল না। অনেকেই

ভাবল সেদিন বোধ হয় পুলিশ আর গুলি ছুড়বে না। কিন্তু ভুল ভাঙল পর মুহূর্তে, গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ শুনে। বারান্দায় ছুটে গেল অনেকে। ভয়ে আর্ত চীৎকার ক'রতে ক'রতে পাখিরা বাসা ছেড়ে নীল আকাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে।

মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের শেডের নিচে দাঁড়ানো একটি ছেলেকে গুলি ক'রেছে উরুতে। মুখ থুবড়ে সে মাটিতে পড়ে আছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চকচকে বারান্দা।

কয়েকজন ছেলে ধরাধরি ক'রে দ্রুত সরিয়ে নিল তাঁকে।

এবার তো কোনো প্ররোচনা ছিল না! কোথায়ও সামান্য স্লোগানটুকু পর্যন্ত নেই! ওরা খুনে! খুনের নেশায় মেতে উঠেছে।

ধরাধরি ক'রে ইমার্জেন্সি-রুমে নিয়ে এলো তাঁকে। আঘাত গুরুতর। রফিক আর জাব্বার ছাড়া আর এত গুরুতর আঘাত কারো লাগি নি। গলগল ক'রে রক্ত পড়ছে। মেঝে ভেসে যাচ্ছে। মুমূর্ষু অবস্থা। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হ'য়ে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে।

ফিস ফিস ক'রে কাছের ছেলেটাকে সে বলল, 'আমাদের বাড়িতে একটু খবর পাঠাবেন? বিষ্ণুপ্রিয়া ভবন···পল্টন লাইন।' একটু দম নিয়ে বলল, 'একটু পানি।'

একজন মেডিকেলের ছাত্রী ছুটে গ্লাসে জল গড়িয়ে নিয়ে এলো। খাইয়ে দিল সযত্নে।

তারপর দ্রুত তাঁকে অপারেশন-রুমে নিয়ে যাওয়া হ'লো। দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে অনেকে।

এম. এ. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র বরকত। বুড়ো বিধবা মায়ের বড়ো আদরের ধন। তাকে ঘিরে কতো তাঁর আশা। ছেলে পাশ ক'রবে, ভালো চাকুরি ক'রবে, টুকটুকে বউ আসবে, তিনি নিজে পছন্দ ক'রে বউ আনবেন ঘরে। বরকত বড়ো ভালো ছেলে। মা-অন্ত প্রাণ। মায়ের কথা ছাড়া কিছু করে না। তিনি জানেন

তাঁর পছন্দ-করা বউ বরকতের অপছন্দ হবে না। কতো রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে প্রহরের পর প্রহর স্বপ্নসুখে বিভোর হ'য়ে থেকেছেন বরকত-জননী।

কিন্তু তাঁর আদরের বরকতকে, তিনি আর দেখতে পেলেন না। মুর্শিবাদে এক গাঁয়ে আজও ছেলের কথা মনে ক'রে বরকত জননীর চোখের জল ঝরে নীরবে। ছেলের স্মৃতি ধরে রেখেছেন নিজের বাড়িতেই। বাড়ির নাম দিয়েছেন বরকত মঞ্জিল।

বরকতের মৃত্যুর খবরে তড়িতাহত হবার মতো সকলে প্রথমটায় স্তব্ধ হ'য়ে যায়। তারপর ফেটে পড়ে সাগরের মতো গর্জন ক'রে। সরকারী কর্মচারি, রিকসাঅলা, পথচারি, শ্রমিক, দোকানদার সকলেরই কণ্ঠে আওয়াজ ওঠে: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। জালিম মুসলিমলীগ সরকার নিপাত যাক্।

পরিষদকক্ষেও পৌঁছোয় সে খবর। মনোরঞ্জন ধর এবং গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম পরিষদকক্ষে ঝড়ের বেগে ঢুকে খবর দিলেন, পুলিশের গুলিতে ছাত্র মারা গেছে। বিরোধীদলের সদস্যরা ফেটে পড়ে উত্তেজনা আর ক্রোধে। এই হত্যাকাণ্ডের জবাব চান নুরুল আমিনের কাছে। মুলতবী প্রস্তাবের দাবি ওঠে।

নুরুল আমিন তো প্রথমে স্বীকারই ক'রতে চাইলেন না যে, পুলিশ ছাত্রদের ওপর গুলি চালিয়েছে। বললেন, 'ইটস্ এ ফ্যানটাসটিক স্টোরি।' বিরোধীদের চাপে কথাটা শেষে স্বীকার ক'রে নিলেও নির্লজ্জের মতো আত্মপক্ষ সমর্থন ক'রে বললেন, 'পুলিশ ঠিকই ক'রেছে। উচ্ছৃঙ্খলতা দমানোর জন্যই তো পুলিশ। এর পিছনে কমুনিস্টদের উস্কানি আছে। আমরা তাদের নির্মূল ক'রবই।'

টেবিল চাপড়ে হৈ-হৈ ক'রে উঠল বিরোধীদলের সদস্যরা। সরকার-পক্ষের অনেক সদস্যও নুরুল আমিনের এই নির্লজ্জ উক্তির

নিন্দা ক'রলেন। সরকারি দলের সদস্য মওলানা তর্কবাগীশ এবং 'আজাদ'-সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিনও খয়রাত হোসেনের মুলতবী প্রস্তাব সমর্থন ক'রলেন। তীব্রভাষায় নিন্দা ক'রলেন পুলিশের গুলি চালনার। ছাত্রদের ওপরে পুলিশী নির্যাতনের এবং মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের নির্লজ্জ উক্তির প্রতিবাদে মুসলিমলীগ পার্টি থেকে সেই মুহূর্তে পদত্যাগ ক'রলেন তাঁরা। পরিষদকক্ষে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে মুসলিমলীগের মৌলানা তর্কবাগীশ বললেন, আমাদের ছাত্রগণ যখন শাহাদত বরণ ক'রছেন, আমরা তখন আরামে পাখার হাওয়া খেতে থাকব এ বরদাশত্ করা যায় না। চলুন, মেডিকেল কলেজে চলুন। মেডিকেল কলেজ আজ পাঁচ কোটি জনতার তীর্থস্থান। শহীদের রক্তে পবিত্র হ'য়েছে সেখানকার মাটি।' তারপর তর্কবাগীশ এবং শামসুদ্দিন সাহেব খয়রাত হোসেনের সঙ্গে পরিষদকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। শামসুদ্দিন সাহেব পরে পরিষদের সদস্যপদেও ইস্তফা দেন।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তখন অভূতপূর্ব দৃশ্য। রোড-স্ট্রীট-লেন-বাইলেন থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনতার স্রোত এসে মিশছে জনসমুদ্রে। মেডিকেল কলেজের সামনের রাস্তায় বয়ে চলেছে জনতার স্রোত। হাজারে হাজারে লোক এসে ঢুকছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভিতরে, বারান্দায়, বাইরে। শহীদের তাজা রক্তে স্নাত মাটি আর ধুলি দেখছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কতোজনা। চোখে বেদনা আর শ্রদ্ধা। কয়েকজন রক্তমাখা ধুলি তুলে কপালে ছোঁয়াল।

সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। যে দিকে তাকানো যায়, চোখে পড়ে আবছায়া অন্ধকারে কালো কালো মাথা, অগণিত। কাতারে কাতারে আরও লোক আসছে শেষ বারের মতো বরকত রফিক আর জাব্বারকে এক পলক দেখে নিতে, দেখে নিতে সেই সব বীর সন্তানদের যারা আহত হ'য়ে শুয়ে আছে হাসপাতালের বেডে,

মেঝেতে। সারা ঢাকা নারায়ণগঞ্জের লোক ভেঙ্গে পড়েছিল সেদিন মেডিকেল কলেজে।

মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ভবনে তোলা হ'য়েছে শহীদের রক্তে ছোপানো পতাকা। হোস্টেলের মাইকগুলো থেকে ভেসে আসছে খবরের পর খবর, বক্তৃতা। আগামীকালের কর্মসূচী আর শহীদের নাম-ঠিকানা ঘোষণা চলেছে বার বার, মাঝে মাঝে দিচ্ছে হত্যাকাণ্ডের বিবরণ :

'পুলিশ আমাদের ওপর গুলি চালিয়েছে, নৃশংসভাবে হত্যা ক'রেছে রফিক জাব্বার আর বরকতকে। লাঠি আর বেঅনেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ক'রেছে শ'য়ে শ'য়ে ছাত্রছাত্রীকে। কুকুরের মতো রাস্তায় ফেলে পুলিশ পিটিয়েছে শত শত ছাত্রকে। আমাদের অপরাধ আমরা বলতে গেছিলাম আমাদের মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়া চলবে না।

'কিন্তু ওরা জানে না গুলি আর টিয়ারগ্যাসে আমাদের দমাতে পারবে না। কতো রক্ত নেবে ওরা। বাংলার ছেলেমেয়েরা রক্ত দিতে ভয় পায় না। আমাদেব আন্দোলন চলবে—এগিয়ে আমরা যাবই। লিয়াকত-নাজিমকে আমরা বাঙলা-ছাড়া ক'রবই। আমরা জানি, আপনারা, দেশের পাঁচ কোটি লোক আমাদের পিছনে আছেন। আমরা সবাই মিলে যদি আওয়াজ তুলি, কারও সাধ্য নেই সে দাবি নস্যাৎ ক'রে দেয়। সকলে আওয়াজ তুলুন, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।'

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল অযুত জনতা। গর্জে উঠল : রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। আজ তাদের মন থেকে সব ভয়-ত্রাস চলে গেছে। চোখে মুখে ফুটে উঠেছে সংগ্রামের দৃঢ় শপথ।

সর্বদলীয় সংগ্রাম-পরিষদের সদস্যরা আর মিলিত হ'তে পারে নি। ছাত্র সংগ্রাম-পরিষদের সদস্যদের কেউ গ্রেপ্তার হ'লো,

কেউ-বা আহত, অন্যেরা পলাতক। পুলিশ হন্যে-হ'য়ে ফিরছে তাঁদের পিছনে। কে কোথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে জানি না। কিন্তু সংগ্রাম বন্ধ হ'তে পারে না। মেডিকেল-কলেজ আর ইন্‌জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্ররা সংগ্রামের নেতৃত্ব কাঁধে নিল। সংগ্রাম-পরিচালনার জন্যে মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা হোস্টেলে হোস্টেলে কন্‌ট্রোল-রুম স্থাপন ক'রল। সলিমুল্লাহ্‌ মুসলিম হল, ফজলুল হক হল, ইডেন হোস্টেল, প্রভৃতিতেও কন্‌ট্রোল-রুম স্থাপিত হ'লো। আন্দোলন পরিচালনা আর পুলিশী হামলা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হলো রাতারাতি।

একুশের রক্তে স্নান ক'রে বাইশের সূর্য উঠল। রোজকার মতো তার সেই হাসি ছড়ানো মুখ আর নেই। সূর্যকে বড়ো করুণ, বড়ো বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। ইন্‌জিনীয়ারিং কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় —যতদূর দেখা যায় কালো পিচের রাস্তাটায় ছড়িয়ে রয়েছে ইটের টুকরো।

রাস্তাঘাট ফাঁকা, বড়ো নির্জন। রোজকার মতো সাইকেল-রিকসার ক্রিং ক্রিং শব্দ নেই। বাসের ঝা-ঝা আওয়াজটাও আজ অনুপস্থিত।

ফাল্গুনের মৃদু উতল হাওয়ায় মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসের মাথায় রক্ত-পতাকাটা উড়ছে। মাইক থেকে জ্বালা-ধরানো কথাগুলো ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। আবৃত্তি গান আর বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে চলছে ঘোষণা—সেদিনকার কর্মসূচীর ঘোষণা।

প্রভাতী খবরের কাগজ ততক্ষণে পৌঁছে গেছে শহর ছাড়িয়ে গ্রামে, গঞ্জে। প্রথম পাতায় আট কলম জুড়ে খবরের হেড লাইন: নিরস্ত্র ছাত্রজনতার উপর পুলিশের গুলি। ৩ জন নিহত, ৩০০ জন আহত, ১৮০ জন গ্রেপ্তার। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ।

তারই নিচে লিখেছে : আজ শহীদের লাশ দাফন। মেডিকেল কলেজে গায়েবী জানাজা।

তারপর পাতার পর পাতা জুড়ে পুলিশের নৃশংস অত্যাচারের বিবরণ। শহীদদের সম্পর্কে বিশেষ রচনা। টিয়ারগ্যাস আর লাঠি চার্জের ফটো। ফটো শহীদদের। তার চার পাশে কালো মোটা রেখা।

কাগজ পড়ে স্তম্ভিত, শোকাভিভূত সারা দেশের মানুষ। কারো চোখে দেখা দেয় জল। কারো চোখে ক্রোধ, ঘৃণা। বুকে জ্বালা, চোখে আগুন নিয়ে হাজারে হাজারে মানুষ ছুটে চলেছে মেডিকেল কলেজের দিকে। খালি পা। বুকে কালোব্যাজ। মেয়েরা পড়েছে কালোপাড় শাড়ি। বুকে লাগিয়েছে কালো-ব্যাজ। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এমন কি দূর দূর অঞ্চল থেকে লক্ষ জনতার স্রোত এসে মিলছে মেডিকেল কলেজের সামনে। মজুর, কেরানী, রিকসাঅলা, ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক কেউ বাদ নেই—সবাই এসেছে।

আতোয়ারের জ্ঞান ফিরেছে ভোরের দিকে। আলো বলছিল, আমাদের সংগ্রাম সার্থক। দেশের লোক আজ সাড়া দিয়েছে আমাদের ডাকে। লক্ষ লক্ষ মানুষ এসেছে গায়েবী জানাজায়। শোভাযাত্রা বেরুবে পরে। মানুষের কাতার যে কোথায় সুরু আর কোথায় শেষ দেখা যায় না।

লাখো জনতার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি এবং আমার বন্ধুরাও। যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু মানুষের মাথা আর মাথা। ঢাকায় এমন বিশাল জনসমুদ্র এর আগে আর কেউ দেখে নি।

গায়েবী জানাজার সময় হ'লো। হঠাৎ জানা গেল শহীদদের লাশ নেই। লীগ-সরকার লাশ দেবে না। রাতারাতি কোথায় তারা লাশ সরিয়ে ফেলেছে। জনতার সামনে ওরা লাশ বের

ক'রতে ভয় পায়। ওরা জানে শহীদের প্রতিটি রক্তবিন্দু থেকে জন্ম নেবে লাখ লাখ সালাম রফিক-জাব্বার-বরকত।

জনতা ক্ষুব্ধ। ক্রুদ্ধ গুঞ্জন উঠছে জন-সমুদ্রে। শহীদের লাশ দাফনের সুযোগ পাবে না তাঁর আত্মীয়স্বজন আর দেশবাসী—এ হ'তেই পারে না।

কিন্তু অনেক চেষ্টা ক'রেও লাশ পাওয়া গেল না।

লক্ষ জনতা কী তাহ'লে ফিরে যাবে?

না, লাশ ছাড়াই গায়েবী জানাজা হবে?

ইমাম সাহেব হু'হাত তুলে মোনাজাত ক'রলেন, 'আল্লাহ্, জালিমের গুলিতে কচি কচি ছেলেরা মারা গেছে। ওদের খুনে রাঙা হয়েছে ধুলো আর ঘাস। তুমি তো জানো আল্লাহ্, ওরা নিরপরাধ। ওরা শুধু বলেছিল, বাপ-দাদার মুখের ভাষা ওরা কেড়ে নিতে দেবে না। কিন্তু গুলি ক'রে জালিমরা খালি ক'রে দিল কতো মায়ের বুক। তুমি ওদের ক্ষমা ক'রো না। তোমার রোষের আগুনে জালিমদের নিশ্চিহ্ন করো হুনিয়ার বুক থেকে।'

তারপর উপস্থিত জনতার কাছে ভাষণ দেবার জন্যে উঠলেন যুবলীগ নেতা অলি আহাদ। অবিন্যস্ত চুল, চোখে আগুনের ঝিলিক। অলি আহাদ বলে চললেন: বাংলাভাষার কণ্ঠরোধ ক'রে পূর্ববাঙলার সাড়ে চার কোটি বাঙালীকে পঙ্গু ক'রে রাখার ষড়যন্ত্র চলছে অনেকদিন থেকে। আমরা সে চক্রান্ত ব্যর্থ ক'রবই। আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবেই। পুলিশের গুলি আর টিয়ারগ্যাসকে বাঙলার ছেলেরা ভয় পায় না। রফিক-জাব্বার-বরকতের রক্ততিলক নিয়ে আজ আপনারা শপথ নিন—শয়তানদের চক্রান্ত আমরা ব্যর্থ ক'রবই—বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ক'রতেই হবে—না হ'লে রফিক-জাব্বার-বরকতের আত্মা শান্তি

পাবে না। পাঁচ কোটি বাঙালীর বজ্র নির্ঘোষ দাবির আওয়াজে মুসলীমলীগের কায়েমীশাসন টলে উঠবে নিশ্চিত।'

একটু থেমে জনতার উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার। এতক্ষণ মাইকে যেন তিনি আগুনের ফুল্‌কি ছড়িয়ে যাচ্ছিলেন। এবারে ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'এখন আমাদের শোক মিছিল বেরুবে। এখান থেকে বেরিয়ে নবাবপুর রোড হ'য়ে চকবাজার দিয়ে ফিরে আসব এখানে। শাসকরা আমাদের শক্তির পরিচয় নিক।'

মিছিল বেরুবে, এমন সময় খবর পাওয়া গেল বিরাট এক বিক্ষুব্ধ জনতা মর্নিং নিউজ পত্রিকা অফিসে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সদরঘাটে মর্নিং নিউজ পত্রিকার বহ্নি-উৎসব ক'রেছে। ওই দিনের মর্নিং নিউজ পত্রিকার প্রথম পাতার খবর পড়ে জনতা ক্ষেপে গেছে। মর্নিং নিউজের হেডলাইন ছিল সেদিন: "Dhoties roaming Dacca street. Police forced to resort firing on unrully mob. Government brought the situation under control. হিন্দুস্থানের দালালরা ঢাকার রাস্তাঘাট ছেয়ে ফেলেছে এবং পুলিশ বাধ্য হ'য়েই দুষ্কৃতকারীদের ওপর গুলি ছুড়েছে। সরকার দক্ষতার সঙ্গে অবস্থা আয়ত্তে এনেছেন।

কিন্তু সরকারের চালে এবার ভুল হ'লো। হিন্দুরা ভারতের দালাল, কমিউনিস্ট—তারা পাকিস্তানের শত্রু। তারাই পাকিস্তানকে ধ্বংস করবার জন্য রাষ্ট্রভাষার দাবি তুলেছে—এই ধুয়ায় এবারে কাজ হ'লো না। বাংলা হিন্দু-মুসলমান দু'জনেরই ভাষা। দু'জনেই লড়ছে মাতৃভাষার দাবি আদায়ের জন্য। এখানে কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান নয়। সকলেই বাঙালী। এই বিভ্রান্তিকারক সংবাদে সাধারণ লোক ওদের অফিসে আগুন লাগিয়েছে, পত্রিকা পুড়িয়েছে। সকলের মুখে একই কথা, ইংরেজদের 'ডিভাইড এণ্ড রুল' নীতি এখানে চলবে না।

চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ ক'রে লাখো জনতার মিছিল বেরুল পথে। নবাবপুর রোডে গিয়ে পড়েছে মিছিলের প্রথম অংশ, পিছনের অংশ তখনো হাইকোর্টের কাছে। দোকান-পাট যানবাহন, কারখানা সব বন্ধ। এগিয়ে চলেছে মৌন মিছিল। সূর্য তখন প্রায় মাথায় উপরে উঠে গেছে। দুপাশে হেলমেটধারী পুলিশের সার। শোকের ছায়া তাদেরও চোখে। হাতের অস্ত্র শিথিল হ'য়ে এসেছে। কিন্তু তারা তো হুকুমের গোলাম। একজন পুলিশ-অফিসার ওয়ারলেসে সম্ভবত হেড কোয়ার্টার থেকে নির্দেশ এনে অর্ডার দিল : চার্জ। থমকে দাঁড়িয়েছে পুলিশবাহিনী। এই নীরব শান্তিপূর্ণ মিছিলে কী ক'রে লাঠি চার্জ ক'রবে তারা। কী ক'রে এতখানি অমানুষ হবে তারা। অফিসারটির চীৎকার আবার ভেসে এলো : চার্জ।

পরমুহূর্তে মিছিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশ-বাহিনী। লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটল অনেকের, যে যেদিকে পারল, ছুটল; আশ্রয় নিল কার্জনহলে—হাইকোর্টে। আক্রমণ চালিয়েছে মিছিলের মাঝের অংশে। আগের বা পিছনের লোকেরা জানে না সে খবর। শোনা গেল শেরে বাঙলা ফজলুল হক সাহেবও আহত হ' ছেন পুলিশের লাঠিতে। কয়েক মুহূর্ত বাদেই গুলির শব্দে সকলে চমকিত হ'লো। হাইকোর্টের কাছে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ল ক্লাসের একটি ছাত্র—নাম শফিকুর রহমান। কালো পিচের রাস্তা শফিকুরের তাজা রক্তে লাল হ'য়ে গেল। সেখানটায় ওপরের গাছটা থেকে রাশি রাশি রাঙা পলাশ ঝরে ছড়িয়ে ছিল। শফিকুরের রক্তে সেগুলো আরও রাঙা হ'লো।

লোকের মুখে মুখে মিছিলের ~ বাভাগে বিদ্যুতগতিতে সে খবর গিয়ে পৌঁছাল। কিন্তু ফেরার উপায় নেই। নবাবপুর রোড মানুষে মানুষে ছয়লাব। রাস্তার ধারের দালানের ছাদ থেকেও

অগণিত মানুষ দেখছে সেই শোভাযাত্রা। দুপাশের বহু লেন-বাইলেন থেকে আরও মানুষ এসে যোগ দিয়েছে সেই মিছিলে। অসহ্য রাগে কপালের শিরাগুলো দপ্ দপ্ ক'রছে তাঁদের। ঘৃণায় মুখ আরক্ত, কুঞ্চিত। কিন্তু মিছিল থামে না, এগিয়ে চলে। দীর্ঘ পথপরিক্রমা শেষে মিছিল ফের এলো মেডিকেল কলেজে। এসে শুনল শফিকুর আর নেই।

আরও কতো শফিকুর যে সেদিন প্রাণ দিয়েছিল জানি না। পুলিশের ভ্যান মুহূর্তের মধ্যে লাশ সরিয়ে ফেলেছিল। পরের দিন খবরের কাগজে দেখা গেল, ৫ জন নিহত এবং ১২৫ জন আহত হ'য়েছে। গ্রেপ্তার করা হ'য়েছে ৩০ জনকে। 'সংবাদ' অফিসের সামনেও পুলিশ ওই দিন জনতার উপর গুলি চালিয়েছিল।

বিক্ষুব্ধ জনতা ফেটে পড়ল কাঁটাতারে ঘেরা এ্যাসেমব্লির সামনে। বেলা তখন তিনটে। পরিষদের অধিবেশন বসেছে। বিরোধীদল থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দিল। সরকারি দলের কিছু সদস্যও সমর্থন জানালেন সে-প্রস্তাবের।

এদিকে চীফ সেক্রেটারি আজিজ আহম্মদ আর নুরুল আমিনের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে। নুরুল আমিনের আদেশ আজিজ আহম্মদ মানছেন না। কাল রাতেও ফোনে অনেকক্ষণ কথা কাটা-কাটি হ'য়েছে দু'জনের। আজিজ আহম্মদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন খাজা সলিম প্রমুখরা। নুরুল আমিনের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ : তাঁর কোনো শাসনতান্ত্রিক যোগ্যতা নেই। নুরুল আমিনের কোণঠাসা অবস্থা। বেগতিক দেখে তিনিও বিরোধীদলের প্রস্তাবে সায় দিলেন। লীগ-সরকার বাংলাকে প্রদেশের সরকারি ভাষা ক'রতে রাজী হ'লো এবং তা রাষ্ট্রভাষা করার জন্য গণপরিষদের কাছে সুপারিশ ক'রে প্রস্তাব গ্রহণ করতেও বাধ্য হ'লো।

ভাষা-আন্দোলনের দু'টি রক্তাক্ত দিন চলে গেল। আন্দোলন

এখনো শেষ হয় নি, রক্তঝরার আরও দিন আসছে। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের দাবি না মেনে নেওয়া পর্যন্ত এ-আন্দোলন চলবেই। বেইমানদের মিথ্যা স্তোকে ছাত্রসমাজ আর ভুলতে নারাজ। গোলাম মোহাম্মদ অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্তে স্থলেরীকে পাঠালেন ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা ক'রতে। কিন্তু ফল হ'লো না কিছুই। বাঙলার পাঁচ কোটি জনতা এ-দাবি ছাড়তে পারে না—এ যে তাদের প্রাণের দাবি—রাজনৈতিক দর-কষাকষি নয়।

গত দুই দিন ধরে নিরস্ত্র জনতার উপর পুলিশ গুলি চালিয়েছে। শহীদদের লাশগুলো পর্যন্ত গায়েব ক'রেছে ওরা। আত্মীয়-স্বজন এবং দেশবাসীকে শেষ বারের মতোও সে-লাশ দেখতে দেওয়া হয় নি। ২৩ ফেব্রুয়ারির 'দৈনিক মিল্লাদ' সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখল: ইসলামী বিধান অনুসারে লাশ খুবই পবিত্র। অত্যন্ত তাজিমের সঙ্গে সে লাশ দাফন করা বিধেয়। কিন্তু গত দুই দিনে পুলিশের গুলিতে শাহদাত প্রাপ্ত লাশগুলি তাদের অভিভাবকের হাতে দেওয়া হয় নি। জানি না, শরিয়ত মোতাবেক শেষকৃত্য হ'য়েছে কী না। এ যে কতো বড়ো মর্মান্তিক, অনৈসলামিক এবং গুনহ্‌ার বিষয় তা বলে বোঝানো যায় না। সরকার ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার ক'রছেন, পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র। এই কি ইসলামিক রাষ্ট্রের পরিচয়?

জনসাধারণ এ-ঘটনায় আরও ক্ষুব্ধ হ'লো। ধর্মভীরু মানুষরা, যারা এতদিন নীরব ছিলেন এই কথা পড়ে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলেন।

মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের গেটের কাছের মাটি আর ঘাসের মতো পবিত্র আর কিছু পূর্ববাঙলায় নেই। বরকতের রক্তে পুণ্য হয়েছে সে মাটি। জাব্বার-রফিকের তাজা রক্তের তিলক পড়েছে সেখানকার ধূলিতে। শহীদ-মিনার গড়ার এই তো যথার্থ স্থান।

সকাল থেকেই ইট বালি চুন সুরকি নিয়ে এলো ছাত্ররা।

কোনো রাজমিস্ত্রি নেই। নিজেরাই কুর্নি নিয়ে বসে গেছে। প্রতিটি ইট শ্রদ্ধা আর তপ্ত অশ্রুতে ভিজিয়ে গেঁথে তুলল শহীদ-মিনার।

মিলিটারি ভ্যান টহল দিচ্ছে শহরময়। কিন্তু মানুষের মনে ভয় নেই। বহু ছাত্রছাত্রী, শিল্পী, সাহিত্যিক আর সাংবাদিক হাজির হ'লো শহীদ-মিনারের সামনে। কে উদ্বোধন ক'রবেন এই মিনার? এই পুণ্যমন্দিরের আবরণ উন্মোচন করার মতো পুণ্যবান মহাজন কে আছেন? রাজনৈতিক নেতা, সাহিত্যিক, সাংবাদিক থেকে অনেকের নাম উঠল। কিন্তু ঠিক মনঃপূত হ'চ্ছে না। হঠাৎ একজন ছাত্র প্রস্তাব ক'রল, শফিকুরের বাবাই এই আবরণ উন্মোচনের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। সত্যিই তো। তার চেয়ে পুণ্যবান আজ আর কে আছেন? শফিকুরের মতো সন্তানের যিনি জনক তাঁর মতো পুণ্যাত্মা আর কয়জন আছেন? আজকের মহৎ অনুষ্ঠানের যোগ্যতম ব্যক্তি তো তিনিই।

ছাত্রদের নিজহাতে গড়া স্মৃতিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন ক'রতে গিয়ে শফিকুরের পিতা বললেন, 'আমার শফিক আজ নেই। বাংলাভাষার জন্যে সে শহীদ হ'য়েছে। শফিকুরের আত্মা, বরকত, রফিক, জাব্বারের মতো আরো অনেকের আত্মা তৃপ্ত হবে সেদিনই যেদিন বাংলা রাষ্ট্রভাষা হবে। ওরা আজ তোমাদের দিকে চেয়ে আছে, চেয়ে আছে বাংলার পাঁচ কোটি জনতার দিকে। ওই দেখ, দু'চোখে তাদের আকুল প্রতীক্ষা।' তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হ'য়ে এলো। একটু থেমে আবার বললেন, 'হে খোদা, এই সব কচি কচি ছেলেদের বুকের রক্ত যারা ঝরিয়েছে, সেই সব জালিমদের তুমি ক্ষমা ক'রো না।' বলতে বলতে ঝরঝর ক'রে কাঁদতে কাঁদতে মিনারের উপর দু'হাত ভরে ছড়িয়ে দিলেন একরাশ ফুল। সাদাফুল।

ছেলেমেয়েরাও ছড়িয়ে দিল হাতের ফুলগুলি। এতক্ষণে

যেন সত্যিকারের পূজা হ'লো সারা। মনটা তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে। আনন্দে ভিতর থেকে কান্না ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

হোস্টেলের কাঁকর-ছড়ানো পথের উপর দিয়ে কয়েকবন্ধু নীরবে হেঁটে চলছিলাম। খালি পা। পায়ের চাপ দিয়ে ঘি-রঙের নুড়িগুলি সরে সরে যাচ্ছে। শব্দ উঠছে দেখে আরও সাবধানে পা ফেলছি সকলে। শব্দ যেন না ওঠে। কোনো শব্দ আজকের সকলে দিনে বড়ো বেমানান।

হঠাৎ অনেককে ছুটোছুটি ক'রতে দেখা গেল। কিছু বোঝবার আগেই দেখলাম একদল মিলিটারি ঢুকে পড়েছে মেডিকেল কলেজের ভিতরে। ছুটলাম।

ছাত্রাবাস তছনচ ক'রে মুহূর্তে মাইকটা কেড়ে নিল ওরা। রাইফেলের কুঁদোর ঘায়ে শুয়ে পড়ে কাতরাচ্ছে কতো ছেলে অনেককে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে। শুনলাম, ফজলুল হক হল, সলিমুল্লাহ্ হলের মাইকও নিয়ে গেছে। অত্যাচার ক'রেছে ওখানেও।

রাস্তায় দোকান-পাট সেদিনও খোলে নি। গাড়ি-ঘোড়া নেই বললেই চলে। কেউ ডাক দেয় নি। মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবেই হরতাল ক'রে চলেছে।

বিকেলে সর্বদলীয় সংগ্রাম-পরিষদের ছাত্ররা আবার মধুর ক্যান্টিনে মিলল। সভায় ঠিক হ'লো—আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে। ২৫ ফেবরুয়ারি প্রতিবাদ-দিবস পালন করা হবে—নিরস্ত্র জনতার উপর লীগ-সরকারের জুলুমের প্রতিবাদে।

রাতারাতি মিলিটারির সংখ্যা বেড়ে কয়েক গুণ হ'লো। গদি আঁকড়ে থাকার জন্য নুরুল আমিন হন্যে হ'য়ে উঠে'ছন। কেন্দ্র শাসনতান্ত্রিক অযোগ্যতার অপবাদ দিচ্ছে। পদস্থ সরকারি কর্মচারিরা উঠে-পড়ে লেগে গেছেন আন্দোলন দমাতে—গোলাম

মহম্মদ আর নাজিমউদ্দীনকে খুশি ক'রতে। গভীর রাতে অতর্কিতে হানা দিয়ে নেতাদের গ্রেপ্তার ক'রল পুলিশ। গ্রেপ্তার ক'রল আবুল হাশিম, খয়রাত হোসেন, মওলানা তর্কবাগীশ, অধ্যাপক মুজাফফ্র আহম্মদ চৌধুরী, অধ্যাপক অজিত গুহ, অধ্যাপক মুনির চৌধুরী, অধ্যাপক পুলিন দে, গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীন সেন প্রমুখকে। তাঁদের অপরাধ? তাঁরা ছাত্রদের দাবি সমর্থন ক'রেছেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ক'রতে বলেছেন। মওলানা ভাসানীকে গ্রামের বাড়ি থেকে ধরে আনা হ'লো।

কলকারখানা, অফিস-আদালত, যান-বাহন সব বন্ধ। পরিস্থিতি এমন হ'য়ে উঠল যে, শেষে অনন্যোপায় হ'য়ে গভর্নরকে ২৪ ফেবরুয়ারি প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী ক'রে দিতে হ'লো।

পরিষদ ভেঙে যাবার কিছুক্ষণ বাদেই সরকার আবার নবোদ্যমে হামলা চালাল। ছাত্রাবাসগুলোতে ঢুকে পড়ল শ'য়ে শ'য়ে সৈন্য। হাতে স্টেনগান আর রাইফেল। ঘরে ঘরে ঢুকে হামলা চালাল। বিছানাপত্তর ছত্রখান ক'রে ছাত্রদের কুকুরের মতো পিটাতে লাগল। আত্মরক্ষার জন্য যে যেখানে পারল ছুটল। আর্তচীৎকারে ভরে উঠল ছাত্রাবাসগুলো। মিলিটারির হাতে মেয়েরাও লাঞ্ছিত হ'লো। সলিমুল্লাহ্ হলে অত্যাচার হ'লো সব থেকে বেশি। মিলিটারিরা হলের ভিতর ঢুকে পড়তেই ছাত্র আর হোস্টেলের কর্মচারিরা ছুটল পশ্চিম দিকের গেটের কাছে। হঠাৎ সেদিকের দরজা ভেঙে ঢুকল আর-একদল মিলিটারি। বহু ছাত্র-ছাত্রী আর হলের কর্মচারিকে ধরে নিয়ে গেল ওরা। পরে জেনেছিলাম ৮০ জন। আন্দোলন পরিচালনার জন্য সলিমুল্লাহ্ হলে যে সেকরেটারিয়েট বসেছিল সেখানকার কাগজপত্র নিয়ে নিল ওরা, আসবাবপত্র ভেঙে-চুরে ফেলল।

ইন্‌জিনীয়ারিং কলেজের ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে মেডিকেল কলেজে ঢুকে পড়লাম। এখন সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হ'চ্ছে হাসপাতালের ওয়ার্ড। পিছনে অনেকটা দূরে দেখলাম দশ-বারোজন মিলিটারির ছুটে আসছে—হিংস্র হ'য়ে উঠেছে ওরা। ছাত্রাবাসের গেটের কাছে ঢুকে পড়েছে। থমকে দাঁড়ালাম। রাইফেলের কুঁদোর ঘায়ে ভেঙে তছনচ ক'রে ফেলছে শহীদ-মিনার। শহীদ-মিনারের ওপর প্রতিটি রাইফেলের ঘা এসে পাঁজরে লাগছে। ভিতরটা যেন রক্তাক্ত হ'য়ে যাচ্ছে। ফুলগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে অনেকটা জায়গা জুড়ে।

আলাউদ্দীন আল আজাদ পরে যা লিখেছিলেন সেই মুহূর্তে মন যেন সেই কথাটিই বলতে চাইছিল :

ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক। একটি মিনার গড়েছি আমরা
চার কোটি কারিগর

বেহালার সুরে, রাঙা হৃদয়ের বর্ণলেখায়।
পলাশের আর
রামধনুকের গভীর চোখের তারায় তারায়
দ্বীপ হয়ে ভাসে যাঁদের জীবন, যুগে যুগে সেই
শহীদের নাম
এঁকেছি প্রেমের ফেনিল শিলায়, তোমাদের নামে।
তাই আমাদের
হাজার মুঠির বজ্র-শিখরে সূর্যের মতো জ্বলে শুধু এক
শপথের ভাস্কর।

ওরা এবারে ছাত্রাবাসের ভিতরে ঢুকে পড়ল। ছুটল সকলে।

পরের দিন সংবাদপত্রের খবর : বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ। হলগুলো থেকে ছাত্রদের জোর ক'রে বের ক'রে দেওয়া হ'চ্ছে। ৫ মার্চ শহীদ-দিবস—সর্বদলীয় সংগ্রাম-পরিষদের ডাক। সংগ্রাম-পরিষদ ৭৫ ঘণ্টার চরম পত্র দিয়েছে সরকারকে—তার মধ্যে দাবি মেনে না নিলে প্রশাসন বিকল ক'রে দেওয়া হবে।

গত দুই-তিন দিনে ৩৯ জন শহীদ হ'য়েছেন বলে সংগ্রাম-পরিষদ থেকে দাবি করা হ'লো। ৯-দফার ভিত্তিতে তদন্ত-কমিশন গঠনের দাবিও জানিয়েছেন নেতারা।

প্রভাতী খবরের কাগজে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের 'চরমপত্র' দেখে লীগ-সরকার ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো হিংস্র হ'য়ে উঠল। সংগ্রাম-পরিষদের প্রধান নয় জন নেতার উপর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হ'লো। খবরটা আগেই জেনে গেছিল অলি আহাদ ভাই। তোয়াহাভাই। তারা 'আণ্ডার গ্রাউণ্ডে' চলে গেলেন।

মিলিটারি বাড়ি-বাড়ি তল্লাস ক'রে রোজ শ'য়ে শ'য়ে ছাত্র আর রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেপ্তার সুরু ক'রল। বাড়ির মেয়েরাও লাঞ্ছিত হ'লো।

৫ মার্চ 'শহীদ-দিবস' পালিত হ'লো বটে কিন্তু আগের মতো সাড়া মিলল না এবারে। আন্দোলনের দুই প্রধান নেতা অলি আহাদ ও মহম্মদ তোয়াহা ২৭ তারিখে গ্রেপ্তার হ'লেন। অতর্কিতে হানা দিয়ে ঢাকার একটা পুরানো বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হ'লো আরও ৬ জনকে। একই সঙ্গে ছিলেন ওঁরা। ছাত্রাবাসগুলোও খালি। মিলিটারির কড়া প্রহরায় ঢাকায় ছাত্ররাও আর একত্রিত হ'তে পারছে না। ঢাকা শহরের আন্দোলনে তাই ভাঁটা পড়ল।

২৪-২৫ তারিখ থেকেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে ঢাকার বাইরে সারা পূর্ববাঙলার শহর গাঁ গঞ্জে। সে-আন্দোলন সবচেয়ে দুর্বার হ'য়ে উঠল নারায়ণগঞ্জে। পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে

সারাটা শহর। রক্তের আঁখরে লেখা হ'য়ে গেছে শহীদ বরকত-সালাম-রফিক-জাব্বার শফিকুরের নাম।

২৪ ফেবরুয়ারি মীটিং চলছে নারায়ণগঞ্জ রহমতুল্লাহ্ ক্লাবে। নবীগঞ্জ থেকে শীতলক্ষ্যা—শহরের দুই প্রান্ত ভেঙে ছাত্ররা এসেছে আজ। প্রত্যেকের বুকে কালোব্যাজ। মোস্তাফা তার উদাত্ত কণ্ঠে বলে চলেছে: 'আমরা শুধু নিজেদের ভাষায় কথা বলতে চেয়েছি, রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তের লেখা পড়তে চেয়েছি, প্রাণভরে মাকে মা বলে ডাকতে চেয়েছি, আর ওরা বুলেট দিয়েছে। কতো মায়ের বুক খালি ক'রে রক্ত ঝরিয়েছে ঢাকার রাজপথে জালিম লীগ সরকার তার ঠিক নেই, বরকত-সালাম-শফিকদের মৃত্যু নেই। নাজিম-নুরুল জানে না যে ওরা আমাদেরই মধ্যে বেঁচে উঠেছে। ওদের রক্ত-দেওয়া আমরা ব্যর্থ হ'তে দেবো না। আমাদের লড়াই চলবে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ক'রতেই হবে। ওরা আমাদের জেলে পুরবে, গুলি ক'রবে, বেঅনেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ক'রবে দেহ —করুক। সূর্যসেন ক্ষুদিরামের উত্তরসূরী আমরা। মৃত্যু-ভয় আমাদের নেই। এগিয়ে আমরা যাবই।' বলতে বলতে মোস্তাফার ফর্সামুখে রক্ত জমে ওঠে। উত্তেজনায় তাঁর দুটি সুন্দর চোখে আগুন ঝরে। একটু থেমে আবার বক্তৃতা সুরু ক'রতে যাচ্ছিল, এমন সময় রব ওঠে, পুলিশ পুলিশ। মুহূর্তে যে-যার পালাতে থাকে। রহমতুল্লার পিছন দিক দিয়ে দৌড়তে থাকলাম। কেউ-বা পাঁচিল টপকিয়ে পাশের সিনেমাহলে গিয়ে পড়ে। অল্পবয়সী কয়েকটি ছাত্র ধরা পড়ল। জীপে ক'রে নিয়ে চ'লে গেল ওদের।

পরের দিন ১৪৪ ধারা থাকা সত্ত্বেও মরগ্যানের মেয়েরা স্কুলে গেল। মমতাজআপা যেতে বলেছে। সে ডাক উপেক্ষা ক'রতে পারে এমন কেউ নেই। মমতাজআপা বললেন, '১৪৪ ধারা ভঙ্গ ক'রেই মিছিল বের ক'রতে হবে। গ্রেপ্তার ক'রে করুক।'

মেয়েরা গেট থেকে বেরুতে থাকে। পুলিশ আগে থেকেই গেটের বাইরে দাঁড়িয়েছিল। বেরোতেই তাদের নিয়ে তোলে পুলিশের ট্রাকে। মমতাজআপাকেও ধরল। মেয়েদের কণ্ঠ চিরে মুহুর্মুহু স্লোগান উঠছে: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই—নাজিম-নুরুল নিপাত যাক্। ট্রাকে উঠেও স্লোগান দেয় মেয়েরা। মমতাজ-আপাকে নিয়ে গেল কোর্টে।

দাবাগ্নির মতো সে খবর ছড়িয়ে পড়ল সারা শহরে। মমতাজ-আপাকে গ্রেপ্তার ক'রেছে'! থানার চারদিকে ছাত্র আর যুবকরা আস্তে আস্তে জমতে থাকে। পুলিশকে হঠাৎ সচকিত ক'রে স্লোগান ওঠে: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। মমতাজআপার মুক্তি চাই। পুলিশী জুলুম বন্ধ কর। একদল পুলিশ ছুটে আসে। দৌড়াদৌড়ি পড়ে যায়। পুলিশ-ছাত্রে খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়। রাস্তার লোকও এসে যোগ দেয় আমাদের সঙ্গে।

খবর পাওয়া গেল, সন্ধ্যের পর মমতাজআপাকে ঢাকায় নিয়ে যাবে। তাছাড়া আজ রাতেই শহর মিলিটারির হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে।

মোস্তাফাদের বাড়িতে মীটিং বসল ছাত্র এবং যুবনেতাদের। সকলেই বলল: মমতাজআপাকে কিছুতেই নিয়ে যেতে দেব না। মিলিটারিও ঢুকতে দেবো না আমাদের শহরে।

কী ক'রে বন্ধ করা হবে মিলিটারি আসার, কী ভাবে বাধা দেওয়া হবে মমতাজআপাকে নিয়ে যাওয়ার!

ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জে ঢুকবার সড়ক পথ একটিই। পথের দু'পাশে সারি সারি অনেক গাছ। ঠিক হ'লো ফতুল্লা, মানে নারায়ণগঞ্জের তিন-চার মাইল আগে থেকে পথের ওপর গাছ কেটে ফেলে রাখা হবে।

করাত আর কুড়ুল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ছেলেরা। শ'য়ে

শ'য়ে ছেলে গাছ কাটছে ফতুল্লা থেকে চাষাড়া পর্যন্ত। মড়্ মড়্ ক'রে বিশাল গাছগুলো রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। শাখাপ্রশাখা নিয়ে পথ আটকে দাঁড়াচ্ছে একের পর এক। ছেলেদের মধ্যে সে কী উত্তেজনা।

ইলেকট্রিক লাইনের তারও কেটে দেওয়া হ'লো। মিলিটারি ঢুকে পড়লেও অন্ধকারে যাতে কিছু বুঝতে না পারে।

শীতের সন্ধ্যা। ছ'টা বাজতে-না-বাজতেই সারা শহর গাঢ় অন্ধকারে ডুব দিল। কুয়াসায় কয়েক গজ দূরের জিনিসও ভালো দেখা যাচ্ছে না।

হাজার হাজার ছাত্র আর যুবক কিন্তু বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। অন্ধকারে ঘাঁপটি মেরে আছে।

গোটা সাতেকের দিকে খবর পাওয়া গেল মিলিটারি আসছে। ফতুল্লার কাছে মিলিটারি ভ্যানগুলো থমকে দাঁড়ালো। তারপর গাছ সরাতে লাগল একটার পর একটা। এর মধ্যে একদল মিলিটারি রাস্তার ঢাল দিয়ে চলে আসছে শহরের দিকে। অন্ধকারে ওঁৎ পেতে ছিলাম সবাই। শ্মশানের কাছে আসতেই খোয়ার বৃষ্টি সুরু হ'লো। প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল সৈন্যরা। এরকম ভাবে বাধা পাবে ভাবতেই পারে নি বোধ হয়। একটু বাদে ফায়ারিং-এর আওয়াজ হ'লো। রাত্রির নীরবতা খান্ খান্ ক'রে সে শব্দ এসে পৌঁছল চাষাড়ায়।

মিলিটারি হুড়মুড়িয়ে ছুটে আসছে চাষাড়ার দিকে। পুলিশ-ফাঁড়িতে এসে শেল্টার নিল ওরা। রেললাইন থেকে রাশি রাশি পাথর গিয়ে পড়ছে পুলিশফাঁড়িতে।

গাছ সরিয়ে সরিয়ে মিলিটারির ভ্যানও এসে পড়েছে ততক্ষণে। সার্চলাইট ফেলছে চারদিকে। সার্চলাইটের আলোয় আর আত্মগোপন করা সম্ভব হ'লো না। ছুটোছুটি পড়ে গেল।

ছুটে আসছে ওরা বেঅনেট উঁচিয়ে। একদল ছেলে ঢুকে পড়ল মোস্তফাদের বাড়ি। আমি অদূরে, পুরনো বার-একাডেমি স্কুলটা আগে যেখানটায় ছিল সেই খানটায় একটা কাঠের পুলের নিচে গিয়ে লুকোলাম।

মোস্তাফাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ল মিলিটারি। সারা বাড়ি তছনছ ক'রে ফেলছে। ঝন্‌-ঝন্‌ ঝন্‌-ঝন্‌ ক'রে কাপ-ডিশ ভাঙার শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে রাত্রির নৈঃশব্দ ভেদ ক'রে। বাড়ির মেয়েদের আর্ত চীৎকার উঠছে। ছেলে মেয়ে বুড়ো কাউকে রেহাই দেয় নি ওরা। চৌবাচ্চায় গিয়ে লুকিয়েছিল একটি ছেলে। রেহাই পায় নি। চুলের মুঠি ধরে বাড়ির মেয়েদের ছুড়ে ফেলে দিয়েছে সিঁড়ির নিচে। মোস্তফার বাবা খানসাহেব ওসমান আলী বড়োভাই জোহাসাহেবকে মারতে মারতে এনে তুলল মিলিটারির ট্রাকে।

কে কোথায় ছিল জানি না। হঠাৎ অন্ধকার থেকে চীৎকার ক'রে উঠল: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। মিলিটারির জুলুম চলবে না।

মিলিটারির সার্চলাইট চারপাশের প্রতিটি ইঞ্চি জমি চষে ফেলছে। মোস্তাফাদের বাড়ির পিছনের চাঁদমারিতে লুকিয়ে ছিল অনেকে। দৌড়ল। রেললাইন ধরে ছুটছে একদল তল্লার দিকে। আমার প্রায় সামনে থেকেই ছোট শাহাবউদ্দীনকে মারতে মারতে উঠিয়ে নিয়ে গেল জীপে। শীতের রাতেও কনকনে কচুরি-পানা ভর্তি ঠাণ্ডা জলে গলা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। মিলিটারি টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, উঠবার উপায় নেই। অথচ থাকাও যাচ্ছে না। কাদায় পা ঢুকে যাচ্ছে।

একটু বাদে দেখলাম, মমতাজআপা আর কয়েকটি মেয়েকে নিয়ে একটা জীপ ছুটে চলছে ঢাকার দিকে। তাঁরা জীপ থেকে চীৎকার ক'রে চলেছে: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। মিলিটারির অত্যাচার চলবে না।

কুয়াসায়, গাঢ় অন্ধকারে জীপটা মিলিয়ে গেল। মমতাজ-আপনার কণ্ঠস্বরটাও ক্ষীণ হ'তে হ'তে আর শোনা গেল না শেষে।

জানি না মমতাজআপা এখনো বেঁচে আছেন কিনা। পাক-সৈন্যর হাত থেকে বাঁচতে পেরেছেন কিনা। মাঝে কঠিন অসুখে পড়েছিলেন তিনি। আওয়ামীলীগ থেকে যে-সাতজন মহিলা প্রতিনিধি এবার জাতীয় পরিষদে মনোনীত হ'য়েছিলেন তার মধ্যে মমতাজআপার নামও ছিল।

মোস্তফা সারওয়ারের পরিবারের সঙ্গে আওয়ামীলীগ এবং ছাত্র-লীগের সম্পর্ক দীর্ঘ দিনের, জন্ম-লগ্ন থেকেই। তিনি এখন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটীর সাংস্কৃতিক সম্পাদক। শুনেছি সৈন্যরা কামানের গোলায় তাদের চাষাড়ার বাড়ি বিধ্বস্ত ক'রে ফেলেছে। নিজের পরিশ্রমে গড়া ডকইয়ার্ড জুটমিল সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে মোস্তফা সারওয়ার আজ রাইফেল হাতে পাক-সৈন্যের মুকাবিলা ক'রে চলেছেন, নারায়ণগঞ্জে মুক্তিফৌজের নেতৃত্ব দি'চ্ছেন।

জানিনা ফিরে গিয়ে আবার সকল বন্ধুদের দেখতে পাব কি না। সারওয়ার, তারা চুনকো, আফজাল, সিরাজ এদের বুকে জড়িয়ে ধরতে পারবে কি না। কতদিনের কত সুখস্মৃতি, কত টুকরো ছবি যে আজ মনের পর্দায় উঠছে, পড়ছে আবার সরছে।

কর্ণফুলি-পদ্মা-মেঘনা-করতোয়া দেশের সাড়ে সাত কোটি শোষিত, বঞ্চিত মানুষের এই যে মুক্তি-সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম, বেঁচে থাকা এবং টিকে থাকার সংগ্রাম তার শুরু কিন্তু রাষ্ট্রটির জন্মলগ্ন থেকেই।

বিংশ-শতাব্দীর গোড়া থেকেই ওপরতলার একদল মুসলমান ভাবলেন, মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন। সেই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই মুসলমানদের দাবি-দাওয়া এবং চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন ঘটবে। ঢাকার বুড়ি গঙ্গার তীরে আহ্‌সান মঞ্জিলে বসে নবাব সলিমুল্লাহ্‌ একদিন এই স্বপ্ন দেখলেন। নবাব বাহাদুর তাঁর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত ক'রবার জন্য আবুল কাসেম ফজলুল হকের সহায়তা গ্রহণ ক'রলেন। ফজলুল হক ওপরতলার লোক ছিলেন না; ছিলেন সাধারণ ঘরের সন্তান। জন্মেছিলেন বরিশালের সাতুরিয়াতে। নিজেদের বাড়ি ছিল চাখারে। সাধারণ ঘরের ছেলে বলেই বাংলার মাঠ-ঘাটের মানুষের সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় আত্মীয়তা। তাদের সুখ-দুঃখ হকসাহেবের হৃদয়কে নাড়া দিত। সাধারণ মানুষও তাদের ঘরের ছেলে ফজলুকে ভালোবাসত প্রাণভরে। নবাব সলিমুল্লাহ্‌র পরিকল্পনাকে রূপ দিতে দিনের পর দিন তিনি ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত চষে বেড়িয়েছেন। নামী নামী মুসলমান নেতাদের বাড়ি গিয়ে তাদের বুঝিয়েছেন। গিয়েছেন মহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র কাছে। জিন্নাহ্‌ তখন কংগ্রেসে। জিন্নাহ্‌ এলেন না। তবু মুসলিমলীগের জন্ম হ'লো ১৯০৫ সালে। সাধারণের মনে সেই শিশু প্রতিষ্ঠানটির কিন্তু তখনো কোনো

প্রভাব ছিল না। তার কাজকর্ম সীমাবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন অর্থশালী মুসলমান নেতার মধ্যে।

মুসলিমলীগের সৃষ্টির কারণ যতটা না সাধারণ মুসলমানের তাগিদে এবং প্রয়োজনে, তার চেয়ে বেশি বৃটিশ ষড়যন্ত্রের ফল। বৃটিশ কংগ্রেসের প্রভাব ক্ষুণ্ণ ক'রে নিজেদের কায়েমী শাসন বজায় রাখার জন্য হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াসে, এবং মুসলমান সংস্কৃতি রক্ষার নাম দিয়ে বাঙলাকে মুসলমান এবং হিন্দুপ্রধান অধ্যুষিত দুই অঞ্চলে খণ্ড করার সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্তটি তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড কার্জনের।

বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা হিন্দু-মুসলমান দুইয়ের মধ্যেই প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি ক'রল। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ্ গোড়ায় বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাব সমর্থন করেন নি। নবাব সলিমুল্লাহ্‌র মতামতের একটা বিশেষ মূল্য ছিল। ধূর্ত বৃটিশ এক লক্ষ পাউণ্ড ঋণ দিয়ে নবাবকে নিজেদের পক্ষে টানলেন। এবং তার পরে-পরেই বাঙলাকে ভাগ করলেন লর্ড কার্জন। তারিখটা ১৬ অক্টোবর, ১৯০৬। শুধু তাই নয়, নবাবকে দিয়ে ইতিমধ্যেই মুসলিমলীগের গোড়াপত্তন করালেন তিনি। বৃটিশসরকার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, ভারতীয়দের দুর্বল ক'রে রাখার উদ্দেশ্যে, সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াতে লাগলেন। মোগল আমলে, সুলতানী শাসনে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিতে বাস ক'রেছে, সাম্প্রদায়িতার বিষ কখনো ঢোকে নি। বৃটিশ প্রথম এই সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপণ ক'রল। পরবর্তীকালে লক্ষ লক্ষ নিরীহ লোক হ'লো তার বলি। এপার-বাঙলার-ওপারবাঙলার এবং পাঞ্জাবের লক্ষ লক্ষ পরিবারকে পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছাড়তে হ'লো। বৃটিশ-সরকার সাম্প্রদায়িকতার এই বীজ বপণের কাজটা করিয়ে ছিলেন আলিগড় কলেজের

বৃটিশ অধ্যক্ষ আর্কবোল্ডের সহায়তায়। আর্কবোল্ড নিজে আলিগড়ের ছাত্রদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াতেন। তিনি ভাইসরয়ের সেক্রেটারি কর্নেল স্মিথের সঙ্গে সলাপরামর্শ ক'রে মুসলমান-সম্প্রদায়ের মূল দাবি নাম দিয়ে একটা দরখাস্ত লিখলেন। তাঁরা তখন আলিগড় কলেজের সেক্রেটারি নবাব মহসিন্-উল-মুল্ক বাহাদুরের সাহায্যে আগা খানের নেতৃত্বে ৭০ জন মুসলমানের এক প্রতিনিধি-দলকে ওই দরখাস্ত দিয়ে ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর ভাইসরয়ের কাছে পাঠালেন। লেডি মিণ্টো তাঁর ডায়েরিতে ওই দিনটাকে ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা বলে উল্লেখ ক'রেছেন।

কিন্তু আর্কবোল্ড এবং নবাবের হাজার চেষ্টা সত্বেও মুসলিমলীগ সাধারণের প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে উঠল না। বলতে গেলে কিছু স্বার্থান্বেষী লোকের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান হ'লো মুসলিমলীগ। ১৯০৭ সালের ২৯ ডিসেম্বর করাচি মুসলিমলীগের প্রথম সম্মেলন হয়। ওই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন আদমজী পীরভাই নামে বোম্বের একজন খোজা বণিক। বৃটিশ সেনাবাহিনীতে তিনি জিনিসপত্র সরবরাহ ক'রতেন। আগা খানের যদিও কোনো রাজ্য ছিল না, তবু বৃটিশ 'হিজ হাইনেস' উপাধি দিলেন তাঁকে হাত করবার জন্য। আগা খান মুসলিমলীগের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। তখন মুসলিমলীগের নীতি ছিল 'to project among the Muslims of India, feelings of loyalty to the British Government and to remove any misconception that may arise as to the intention of the Government with regard to any of its members.'

মুসলিমলীগের ঢাকা শাখার সভাপতিকে এক চিঠিতে আগা খান লিখেছিলেন 'The Leaque recognises British rule essential for India.'

মুসলিমলীগ স্বরাজ এবং স্বদেশী আন্দোলনের তীব্র নিন্দা করেন।

যাই হোক, বৃটিশ সরকার পরবর্তীকালে বঙ্গবঙ্গ রদ করতে বাধ্য হ'লেন। কিন্তু বাঙলা এবং আসামকে এমনভাবে বিন্যস্ত ক'রলেন যাতে করে বাঙলাদেশ মুসলমান প্রধান অঞ্চল হ'য়ে দাঁড়ায়। এমন কি রাজধানী পর্যন্ত কলকাতা থেকে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হ'লো।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা মহম্মদ আলী, মৌলানা জাফর আলী, ডক্টর এস. ইউ. কিছলু প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতা বৃটিশের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তারা মুসলিমলীগে যোগ দিয়ে মুসলীম লীগের উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচী পাল্টানোর চেষ্টা ক'রলেন। ফলে ১৯১৩ সালে মুসলিমলীগের গঠনতন্ত্রে কিছু পরিবর্তন সাধন করা হ'লো।

১৯১২ সালে ফজলুল হকের চেষ্টায় জিন্নাহ্ মুসলিমলীগের সঙ্গে যুক্ত হলেন। তিনি ছিলেন বামপন্থী বা প্রগতিশীল জিন্নাহ্র রাজনীতির হাতে-খড়ি দাদাভাই নওরোজীর কাছে। জিন্নাহ্র বাবা ছিলেন বোম্বের একজন চামড়া-ব্যবসায়ী। তাঁদের পূর্বপুরুষ ছিলেন মূলতানের হিন্দু। জিন্নাহ্ নিজে হিন্দু খোজা মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। নাম তার অমিয়া বাঈ। লনডনে আইন পড়তে গিয়ে ১৮৯৩ সালে জিন্নাহ্ দাদাভাই নওরোজীর সংস্পর্শে আসেন। ১৯০৬ সালে দাদাভাই নওরোজী যখন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট, তখন জিন্নাহ্ তাঁর সেক্রেটারির কাজটা পেলেন।

১৯১৭ সালে জিন্নাহ্ 'হোম-রুল লীগের' বোম্বে শাখার সভাপতি হ'লেন। গান্ধী সর্বভারতীয় 'হোম-রুল লীগের সভাপতি হ'য়েই বললেন, প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হবে পূর্ণ স্বাধীনতা আদায় করা। জিন্নাহ্ বললেন, গঠনতন্ত্র পাল্টানোর অধিকার হোমরুল-লীগের নেই। এ নিয়ে জিন্নাহ্ গান্ধীর মতবিরোধ তীব্র হ'লো। গান্ধীজী

বললেন, তাঁদের সঙ্গে ওই প্রশ্নে একমত না হ'তে পারলে জিন্নাহ্ পদত্যাগ ক'রতে পারেন। জিন্নাহ্ পদত্যাগ ক'রলেন। এ ব্যাপারে জিন্নাহ্ তার সমর্থক পেলেন না একজনও। এমন কি ফজলুল হক, মৌলানা আজাদ, মহম্মদ আলী, শওকত আলীও গান্ধীজীকে সমর্থন করেন। মুসলিমলীগেও তিনি সুবিধা ক'রতে পারলেন না। হতাশ হ'য়ে তিনি ইংলণ্ডে গিয়ে বসবাস ক'রতে থাকলেন। পারিবারিক কারণেও তার মন তখন খুব বিপর্যস্ত ছিল। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর মামলা-মোকদ্দমা ক'রে একজন পারসী মেয়েকে বিয়ে ক'রলেন। একটি মেয়ে হ'লো। কিন্তু পারিবারিক জীবন সুখের হল না। চার বছর বাদে তাঁর স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়ে বোম্বের তাজমহল হোটেলে রইলেন কিছুদিন। তারপর সেখান থেকে বাবা-মার সঙ্গে তিনি চলে গেলেন ইউরোপে। জিন্নাহ্ তার কয়েক মাস আগে থেকেই লনডনে গিয়ে বাস করছিলেন। হঠাৎ খবর পেলেন, স্ত্রী প্যারিসে আত্মহত্যা ক'রতে গিয়ে অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। জিন্নাহ প্যারিসে গিয়ে কাছে থেকে তাঁকে সুস্থ ক'রে তুললেন। কিন্তু দুজনের মিল আর হ'লো না। তার স্ত্রী সেখান থেকে চলে এলেন বোম্বে, তাজমহল হোটেলে। তারপর রহস্যজনক ভাবে তাজমহল হোটেলেই তিনি নিহত হন।

পরবর্তীকালে জিন্নাহ্‌র মেয়েও একটি পারসী ছেলেকে বিয়ে ক'রে চলে যায়। তারপর জিন্নাহ্ একেবারে নিঃসঙ্গ হ'য়ে পড়লেন।

১৯৩৩ সালে লিয়াকত আলী তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে লনডনে জিন্নাহ্‌র সঙ্গে দেখা ক'রলেন। লিয়াকত আলী তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে এলেন ভারতে। জিন্নাহ্ কংগ্রেসের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে চাইলেন। গোলটেবিল বৈঠক চলাকালে লনডনে রিপোরটারদের বলেছিলেন, পাকিস্তান গঠনের পরিকল্পনা ছেলেমি চিন্তা। জিন্নাহ্ নিজে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলেন না। কিন্তু

লিয়াকত আলী-খালিকুজ্জামান চক্রের ফাঁদে পড়ে তাঁকে বৃটিশের চক্রান্ত কার্যকরী ক'রতে হ'য়েছিল।

জিন্নাহ্ এসে ১৯৩৬ সালের পর মুসলিমলীগকে সজীব ক'রে তোলার চেষ্টা চালান। ১৯৩৬ সালে ইস্পাহানীর বাসভবনে কিছুসংখ্যক নেতার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর নবাব হাবিবুল্লাহকে সভাপতি করে একটি প্রাদেশিক কমিটি গঠন ক'রলেন। ১৯৩৭ সালে নির্বাচনের মুখে আবার নতুন করে কমিটি গঠিত হ'লো।

মৌলানা আকারাম খান হ'লেন তার সভাপতি। সম্পাদক হলেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রওয়ার্দী।

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার পর ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত মুসলিমলীগ মহলে কিছুটা উৎসাহের সঞ্চার হলেও তখনও পর্যন্ত প্রাদেশিক বা জেলা পর্যায়ে তাদের সংগঠন বলতে কিছুই ছিল না। শ্রেণীগত দিক বিচারে মুসলিমলীগ ছিল একটি সামন্ত-বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান।

১৯৪৩ সালের ৬ নভেম্বর প্রাদেশিক কাউন্সিলের সভায় আবুল হাসিম বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিমলীগের সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি গ্রামে গ্রামে ব্যাপক ঘুরে দলে দলে মুসলমান যুবককে মুসলিমলীগের সক্রিয় সদস্য করেন।

১৯৪৪ সালের ৯ এপ্রিল। ঢাকার ১৫০ মোগলটুলিতে প্রাদেশিক মুসলিমলীগের একটি শাখা অফিস হ'লো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কয়েক বছর এই অফিসকে অবলম্বন ক'রেই গড়ে ওঠে পূর্ববাঙলার নতুন নেতৃত্ব, নতুন যুবসমাজের নতুন সংগ্রামী চেতনা। মোগলটুলির অফিসে যুবকদেরই প্রাধান্য ছিল। তাদেরই চেষ্টায় মুসলিমলীগ থেকে নবাববাড়ির প্রভাব খর্ব হয়। ঢাকাজেলা মুসলিমলীগের নির্বাচনে নবাববাড়ির নাজিউদ্দীন, খাজা শাহাবউদ্দীন

প্রমুখকে পরাজিত ক'রে মাণিকগঞ্জের আওলাদ হোসেন সভাপতি এবং মুন্সীগঞ্জের সামসুদ্দীন আহমদ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

মোগলটুলির অফিসকে কেন্দ্র পূর্ববাঙলার নতুন নেতৃত্ব জন্ম নেয়। তাঁদের মধ্যে মহম্মদ তোয়াহা, সামসুল হক, কমরুদ্দীন আহম্মদ, অলি আহাদ, শওকত আলী, তাজউদ্দীন আহমদ, আতাউর রহমান, সামসুজ্জোহা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী কালে কলকাতা থেকে শেখ মুজিব গিয়েও তাদের সঙ্গে ভিড়লেন।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে কমরুদ্দীনের নেতৃত্বে 'গণ-আজাদী লীগ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ওই বছরই অগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে মোগলটুলির অফিসের কর্মীরা 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ' গঠনের কাজ চালান।

দেশ ভাগ হ'লো।

যুবক কর্মীরা দেখল, কয়েকজন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির চক্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে মুসলিমলীগ বিক্ষোভ থাকলেও মুসলিমলীগের বামপন্থী যুবকর্মীর প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলীমলীগ থেকে বেরিয়ে আসার সাহস পেলেন না। কারণ, তখন মুসলিমলীগের দোর্দণ্ড প্রতাপ। মুসলিমলীগের ভিতরে থেকেই তারা নিজেদের শক্তি সংহত ক'রতে চাইছিলেন। এবং সেই উদ্দেশেই শামসুল হক এবং শেখ মুজিবুর রহমান 'ওয়ার্কার্স ক্যাম্প' জন্মে দিয়ে মুসলিমলীগের কর্মীদের একটি সম্মেলন আহ্বান করে মৌলানা আকরাম খাঁর কাছে রশিদ-বই চাইলেন। আকরাম খান ভাবলেন, এরা তার বিরুদ্ধে যাবে। তাই তিনি সেই সব যুবকদের রাষ্ট্রদ্রোহী অ্যাখ্যা দিয়ে তাদেরকে রসিদ-বই দিতে অস্বীকার করেন; ফলে প্রবীণে নবীনে দ্বন্দ্ব শুরু হ'লো। তখনই একটি নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের আলোচনা চলতে থাকে যুবকর্মীদের মধ্যে।

১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইল দক্ষিণ-কেন্দ্রে প্রাদেশিক সরকার নতুন ক'রে নির্বাচনের ব্যবস্থা ক'রলেন। মুসলিমলীগ খুররম খান পন্নীকে মনোনয়ন দিলেন। যুবকর্মীরা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করালেন সামসুল হককে। ওই কেন্দ্রে মৌলানা ভাসানীর নিকট আগেও পন্নী হেরে গিয়েছিলেন। পন্নীর আবেদনে গভর্নর সেই নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা করেন। তাছাড়া নির্বাচনে ব্যয়ের হিসাব দাখিল না করার অপরাধে মৌলানা ভাসানী, পন্নী এবং আরও দু'জনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি ক'রে বলা হয় যে, তারা ১৯৫০ সাল পর্যন্ত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রতে পারবেন না। কিন্তু '৪৯ সালে সামসুল হকের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য সরকার এক বিশেষ আদেশ বলে পন্নীর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন। মুসলিমলীগের এটি একটি নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত। পয়সা ছিল না। কিন্তু যুবকর্মীরা পায়ে হেঁটে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছেন। যুবকর্মীদের অক্লান্ত চেষ্টায় মুসলিমলীগের ভণ্ডামীর জবাব দিলেন জনসাধারণ। সামসুল হক জয়ী হ'লেন। এই জয়ের একটা বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। এত দিন লোকের মনে মুসলিমলীগের ক্ষমতা সম্পর্কে যে অহেতুক ভীতি ছিল তা দূর হ'য়ে গেল। জনসাধারণ ধীরে ধীরে মুসলিমলীগের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ভরসা পেলেন।

১৯৪৯ সালের ২৩ এবং ২৪ জুন মৌলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ঢাকার রোজ গার্ডেনে মুসলিমলীগ-কর্মীদের এক সম্মেলন ডাকা হয়। আড়াইশ-তিনশোর মতো কর্মী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রথম অধিবেশনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শামসুল হক, আবদুল জাব্বার খদ্দর, খয়রাত হোসেন, আনোয়ারা খাতুন, খোন্দকার মুস্তাক আহমদ, শওকত আলী, ফজলুল কাদের চৌধুরী, আতাউর রহমান খান, আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ। কিছুক্ষণ ফজলুল হকও সেদিন ছিলেন সেখানে।

ওই দিনই 'পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ'-এর জন্ম হ'লো। সভাপতি হ'লেন মৌলানা ভাসানী, সম্পাদক শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান এবং খোন্দকার মুস্তাক আহমদ হ'লেন যুগ্ম-সম্পাদক।

আওয়ামী মুসলিমলীগের সাম্প্রদায়িক চরিত্রের জন্য কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কর্মী মহম্মদ তোয়াহা, কমরুদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ, তাজউদ্দীন আহমদ ওই নতুন সংগঠনটিই সঙ্গে যুক্ত না-হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

পরবর্তীকালে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে সংগঠনকে একটি অসাম্প্রদায়িক চেহারা দেওয়া হয়। পরে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়াদী এই দলটির সঙ্গে যুক্ত হন। এর আগে পর্যন্ত তিনি কলকাতায়ই ছিলেন।

দেশ ভাগের আগে পূর্ববাঙলায় কমুনিস্ট পার্টির যেসব সদস্য ছিলেন, দেশ ভাগের পর তার সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেলো। প্রথম কারণ, ওখানকার বেশির ভাগ সদস্যই ছিলেন হিন্দু। দেশভাগের পর তাদের অনেকেই চলে এলেন ভারতে। তাছাড়া পূর্ববাঙলায় পার্টি-সভ্যরা তখনো পর্যন্ত অধিকাংশ হিন্দু হওয়ায় তাদের পক্ষে খোলাখুলি কাজ করা অসুবিধা ছিল। যদিও প্রতিষ্ঠানটি ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না।

অগাস্টে দেশ স্বাধীন হ'লো। ভবানী সেন, আবদুল্লাহ্‌ রসুল, এবং মনসুর হাবিব ঢাকা গিয়ে করোনেশন পার্কে একটি জনসভা করেন।

দ্বিতীয় কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি একটি আলাদা সংগঠন হিসাবে কাজ ক'রে যাবে। পূর্বপাকিস্তানের জন্য আলাদা কমিটী হ'লো।

কার্যক্ষেত্রে নিখিল পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সামান্য যোগাযোগ ছাড়া পূর্বপাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টির কোনো সম্পর্ক রইল না।

১৯৪৮-এর মার্চ মাসে কোর্ট হাউস স্ট্রীটে পার্টির শহর এবং কাপ্তেন বাজারে কেন্দ্রীয় অফিস খোলা হয়। পরবর্তীকালে কাপ্তেন বাজারে ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টির অফিস হয়। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তাই ছিল।

পূর্ববঙ্গের কমুনিস্ট পার্টির প্রথম সারির কয়েকজন সদস্য ছিলেন মুনীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, ফয়েজ আহমদ, বিনয় বসু, অমূল্য সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, ননী চৌধুরী, ধরনী রায়, সত্যেন সেন প্রমুখ।

পাকিস্তানে কমুনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে বেআইনী ঘোষিত না হ'লেও. জননিরাপত্তা আইনের পাইকারি ব্যবহারের ফলে বহু কমুনিস্ট কর্মী গ্রেপ্তার হ'লেন। ফলে পার্টির অধিকাংশ সদস্য আত্মগোপন করেন।

১৯৫১ সালে তারা আওয়ামীলীগ, যুবলীগ প্রভৃতি সংগঠনে অনুপ্রবেশ ক'রে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেয়। ওই বছরই মার্চ মাসে ঢাকায় যুবলীগের জন্ম হয়। যুবলীগ. ভাষা-আন্দোলনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

পূর্ববাঙলার ইতিহাস যেখানে শুরু নতুন রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক চেতনার গণ-উন্মেষে, পশ্চিমপাকিস্তানের ইতিহাস শুরু ক্ষমতা দখলের জন্য প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে।

মহম্মদ আলী জিন্নাহ্ হ'লেন পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল। লিয়াকত আলী খান হ'লেন উজির-ই-আজম অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী। শুরু থেকেই জিন্নাহ্-লিয়াকত আলীর সম্পর্কে চিড় খেল। জিন্নাহ্ পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি রক্ষা ক'রতে চাইলেন, আর লিয়াকত আলী দাঙ্গা বাধালেন। করাচিতে

রক্তপাতের জন্য দায়ী ডন পত্রিকার আলতাফ হোসেন, পাঞ্জাবের মামদোত এবং তাঁর দলবল। তাছাড়া সব কিছুর মূলে ছিলেন লিয়াকত আলী এবং তার সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীবৃন্দ। করাচির দাঙ্গার সময় জিন্নাহ্ নীরবে কেঁদেছেন পর্যন্ত। জিন্নাহ্ পাকিস্তানকে কখনো ঐসলামিক রাষ্ট্ররূপে গড়ে তুলতে চান নি। পাকিস্তানে ভারতের প্রথম হাইকমিশনার প্রকাশবীর শাস্ত্রীর কাছেও জিন্নাহ্ তাঁর এই ইচ্ছা প্রকাশ ক'রেছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুমতি ছাড়াই লিয়াকত আলী বলে বেড়াতে শুরু ক'রলেন, পাকিস্তান হবে ঐসলামিক রাষ্ট্র। এক মাস যেতে-না-যেতেই লিয়াকত আলীর প্ররোচনায় মুসলমান উদ্বাস্তুরা লাহোরে '৪৭-এর ১১ সেপ্টেম্বর 'জিন্নাহ্-দৌলতানা নিপাত যাক' বলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তাঁরা জাতির পিতার কুশপুত্তলিকাও দাহ করে।

শুধু তাই নয়। পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই একবছর সময়ের মধ্যে জিন্নাহ্‌কে আততায়ীরা চার-চারবার হত্যা করার চেষ্টা করে। আততায়ীরা সকলেই ছিল মুসলমান। জিন্নাহ্ একটু ঘাবড়ে গেলেন। করাচির গভর্নর হাউসের চারপাশে জোরালো আলোর ব্যবস্থা হ'লো। জিন্নাহ্‌কে হত্যা ক'রতে যাওয়ার খবর করাচির সকলেই জানত, কিন্তু কাগজগুলো কোনো এক অলক্ষ্য লোকের নির্দেশে খবরটা চেপে গিয়েছিল। কে সেই লোক বা চক্র যার নির্দেশে জিন্নাহ্‌কে হত্যা করার চেষ্টা চলছিল? জিন্নাহ্ ক্রমে ক্রমে লিয়াকতআলী-খালিকুজ্জামান চক্র দ্বারা বলতে গেলে প্রাসাদবন্দী হ'য়ে পড়লেন। তাঁর নিজের হাতে কোনো ক্ষমতা ছিল না। সেনাবাহিনী সম্পর্কে নিজের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না বলেই জিন্নাহ্ বিষয়টা লিয়াকত আলীর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাছাড়া লিয়াকত আলীর পরামর্শে শাসন-বিভাগের সব গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলিতে বৃটিশ-অফিসারদের নিযুক্ত ক'রে রেখেছিলেন তিনি।

লিয়াকত আলী ছিলেন বৃটিশের হাতের লোক। তাই শাসন-বিভাগের চাঁইরা ছিলেন লিয়াকত আলীরই নিজস্ব লোক।

জিন্নাহ্ এই চক্রান্তের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু ওই সময় ধরা পড়ে জিন্নাহ্ গ্যালোপিং যক্ষায় আক্রান্ত। বাইরে থেকে অবশ্য তার কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। তিনি শুধু অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন। কোনো সরকারি ডাক্তার না ডেকে ফাতিমা জিন্নাহ্ ব্যক্তিগত ভাবে ডাক্তার বকস্‌কে আনালেন। কারণ, জিন্নাহ্ এবং ফাতিমা জিন্নাহ্ চাইছিলেন না যে জিন্নাহ্‌র অসুখের খবরটা রাষ্ট্র হ'য়ে পড়ুক। অন্তত কী অসুখ এটা যেন জানতে না পারে তাঁর শত্রুপক্ষ, তার জন্যেই এই সতর্কতা।

লিয়াকত আলী দেখা ক'রতে এলেন গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে। ডাক্তারকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলেন, কী অসুখ? 'আমি এখনো ঠিক করে উঠতে পারিনি।' ডাক্তার বক্‌স জবাব দেন।

'তবুও, কী সন্দেহ করেন আপনি।' লিয়াকত আলী জিজ্ঞাসা করেন।

ডাক্তার বক্‌স তবু জবাব এড়িয়ে যান। বলেন, 'দশটা রোগের কথাই আমি ভাবছি। কোন্‌টা সঠিক হবে, ঠিক ক'রে উঠতে পারিনি। আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন।

লিয়াকত আলীর সঙ্গে ছিলেন ক্যাবিনেট সেক্রেটারি মহম্মদ আলী। তিনি একটু রাগত স্বরে বললেন, 'আপনার উচিত প্রধানমন্ত্রীকে সবকিছু জানানো। তাঁকে যে-কোনো-পরিস্থিতির জন্যে তৈরী থাকতে হবে।'

ডাক্তার বক্‌স মৃদু হেসে জবাব দেন, 'নিশ্চয়ই। আমি আপনার কথা সমর্থন করি। তবে রোগীর অনুমতি ছাড়া তাঁর রোগ নিয়ে কারু সঙ্গে ডাক্তাররা আলোচনা ক'রতে পারেন না। এটা ডাক্তারদের ধর্ম।'

লিয়াকত আলীর খবর জানার চেষ্টা ব্যর্থ হ'লো।

জিন্নাহ্ পরে ডাক্তারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁর অসুখ সম্পর্কে লিয়াকত আলীকে কিছু না জানানোয়।

ঘটনাটা ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসের।

২৪ অগস্ট জিন্নাহ্ ডক্টর বক্সকে বললেন, 'ডাক্তার আমি এতদিন বাঁচতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন না বাঁচি, দুঃখ নেই।' তাঁর চোখে জল চিক চিক ক'রছিল।

কী এমন ঘটল যার জন্য জিন্নাহ্ মনের মধ্যে এমন সোয়াস্তি পেয়েছিলেন?

১১ সেপ্টেম্বর বিকেল চারটে বেজে পনের মিনিটের সময় সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ বিমান কোয়েটা থেকে এসে নামল করাচির মৌরীপুরে। বিমান থেকে স্ট্রেচারে ক'রে নামানো হ'লো মুমূর্ষু জাতির পিতাকে। জিন্নাহ্কে দেখবার জন্য, নেবার জন্য বিমানবন্দরে তখন কেউ ছিল না। সেনাবাহিনীর একটা এ্যাম্বুলেন্সে তাঁকে তোলা হ'লো। জিন্নাহ্র একমাত্র সঙ্গী ছিলেন তখন সিস্টার ডানহাম।

পথে গাড়ি বিগড়ালো। কিছুতেই ঠিক করা গেল না। খবর দেওয়া হ'লো আর-একটা এ্যাম্বুলেন্স পাঠাবার জন্যে। এক ঘণ্টারও ওপর একটা দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে সিস্টার ডানহাম জিন্নাহ্র পাশে বসে হাওয়া ক'রে ক'রে জিন্নাহ্র মুখ থেকে মাছি তাড়ালেন। এ্যাম্বুলেন্সটা বিগড়ে ছিল একটা বস্তীর কাছে। তাই ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি এসে বসছিল জিন্নাহ্র মুখে, এবং গায়ে। পাখা নেই। সিস্টার ডানহাম পাশের বস্তী থেকে খুঁজে-পেতে নিয়ে এলেন এক টুকরো কার্ডবোর্ড। তাই দিয়ে কোনোমতে হাওয়া ক'রে তিনি মাছি তাড়ালেন।

গভর্নর হাউসে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যে ছ'টা বেজে দশ মিনিট

হ'য়ে গেল। জিন্নাহ্‌কে তাঁর ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'লো; ডাক্তার ডাকা হ'লো। ডাক্তার চাঙা করার ওষুধ দিলেন। ওষুধ জিন্নাহ্‌র দু'কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

জাতির পিতার যখন এই অবস্থা, তখন সেই রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী তাঁর ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের নিয়ে ফ্রেন্চ এ্যাম্বেসিতে ককটেল পার্টিতে মশগুল। আশ্চর্য!

রাত দশটায় জিন্নাহ্‌ মারা গেলেন।

লিয়াকত আলী নাকি মাঝরাত্তিরের দিকে জিন্নাহ্‌র মৃত্যু সংবাদ পান। খবর পেয়েই লিয়াকত আলী ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের ডাকালেন! ভোর চারটে পর্যন্ত জিন্নাহ্‌র উত্তরাধিকারী নির্বাচন নিয়ে আলোচনা চলল। শেষে ঠিক হ'লো, খাজা নাজিমউদ্দীন হবেন জিন্নাহ্‌র উত্তরাধিকারী। পূর্ববাঙলার মুখ্যমন্ত্রী হ'লেন পাকিস্তানের ২ নম্বর গভর্নর জেনারেল। জরুরি খবর পাঠানো হ'লো তার কাছে সেই রাতেই। বিশেষ বিমানে পরদিনই নাজিমউদ্দীন করাচি গিয়ে পৌঁছলেন।

জিন্নাহ্‌ মারা যাবেন বা গেছেন লিয়াকতআলী-চক্র নিশ্চয়ই তা জানতে পেরেছিলেন। খবরটা কোনো-না-কোনো সূত্রে দিল্লীতে জবাহরলাল নেহেরুর কানে এসে উঠেছিল? তিনি কেন সেদিন পার্লামেন্টের লবীতে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'আপনারা কেউ কি শুনেছেন জিন্নাহ্‌ মারা গেছেন?'

পরে আর-একথা কারু অজানা থাকেনি যে, জিন্নাহ তাঁর বোন ফাতিমা জিন্নাহ্‌কে তাঁর উত্তরাধিকার মনোনীত ক'রেছিলেন। কিন্তু লিয়াকতআলী-চক্রের কারসাজির ফলে সেই ঘোষণা তিনি ক'রে যেতে পারেন নি।

১৯৫১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জিন্নাহ্‌র মৃত্যু স্মরণে ফাতিমা জিন্নাহ্‌ একটা বেতারভাষণ লিখলেন। প্রচার-অধিকর্তা জেড. এ.

বোখারী ভাষণটা পড়ে ছুটো লাইন কেটে দিতে বললেন। মিস জিন্নাহ্ রাজী হ'লেন না।· অনেক টালবাহার পর ফাতিমা জিন্নাহ্‌র বেতার-ভাষণ প্রচার হ'লো। কিন্তু দেখা গেলো ওই নির্দিষ্ট লাইন ছুটিতে এসে শব্দ অস্পষ্ট এবং ফিকে হ'য়ে গেল। জনসাধারণ লাইন ছু'টি বুঝতেই পারলেন না।

শুধু তাই নয়, লিয়াকত আলী ফাতেমা জিন্নাহ্‌র পিছনে সারাক্ষণ গুপ্তচর লাগিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর টেলিফোন ট্যাপ করা এবং চিঠিপত্র খুলে-খুলে দেখা হ'তো।

জিন্নাহ্‌র মৃত্যুর পর সোহ্‌রাওয়ার্দী পাকিস্তানে গিয়ে তাঁর রাজনীতি শুরু ক'রবার মতলব ক'রলেন। জিন্নাহ্ থাকাকালে সোহ্‌রাওয়ার্দীর পাকিস্তানে ঠাঁই হয় নি। জিন্নাহ্ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে পছন্দ ক'রতেন না। কলকাতায় দাঙ্গা বাধাবার জন্ম জিন্নাহ্ মনে মনে সোহ্‌রাওয়ার্দীকে ঘৃণা ক'রতেন। পাকিস্তানে গিয়ে সোহ্‌রাওয়ার্দী কিন্তু জিন্নাহ্‌র বোন ফাতিমা জিন্নাহ্‌রই আশ্রয় নিলেন। ফাতিমা জিন্নাহ্‌র আশীর্বাদ নিয়ে তিনি 'জিন্নাহ্ আওয়ামী লীগ' গঠন ক'রলেন। লিয়াকত আলীকে জব্দ করার জন্মই ফাতিমা জিন্নাহ্ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে সমর্থন ক'রলেন। পাঞ্জাবের নবাব মামদোত, মিয়া ইফতেখারউদ্দীন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের পীর মানকি শরীফ, সিন্ধুর জি. এম. সৈয়দ এবং আবছুল মজিদ সিন্ধী, পূর্ববাঙলার মৌলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে সাদরে গ্রহণ ক'রলেন। কয়েকটি বিখ্যাত পত্রিকা নওয়াই-ওয়াক্ত, পাকিস্তান টাইমস, ইমরোজ, চাত্তন তাঁকে রাতারাতি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরলেন। লিয়াকত আলী প্রমাদ গুণলেন। তিনি সোহ্‌রাওয়ার্দীকে 'দেশের শত্রু' আখ্যা দিয়ে দাবিয়ে রাখতে চাইলেন। কিন্তু ফাতিমা জিন্নাহ্ যাঁর সমর্থক, তাঁকে জনসাধারণের সামনে শত্রু প্রতিপন্ন

করা কঠিন। কারণ, ফাতিমা জিন্নাহ্ সম্পর্কে লোকের বরাবরই উচ্চ ধারণা।

ইতিমধ্যে লিয়াকত আলীর আর এক বড়ো শত্রু দাঁড়ালেন কায়ুম খান। কায়ুম খান সাতচল্লিশের গোড়ায়ও কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেস দলের ডেপুটি নেতা ছিলেন। তিনি দেশভাগের বিরুদ্ধে 'গোল্ড এণ্ড গান' নামে একটা বইও লিখেছিলেন। অনেকের ধারণা কায়ুম খান পাঠান। তিনি নিজেও তাই দাবি করেন। আসলে তা নয়, তিনি কাশ্মীরী। খালিকুজ্জামান কায়ুম খানকে মুসলিমলীগে নিয়ে আসেন। মুসলিমলীগে এসে কায়ুম খান বৃটিশের হাতের লোক হ'য়ে গেলেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের বৃটিশ গভর্নরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে একটা জাল দলিলের সাহায্যে সেখানকার কংগ্রেস-নেতাদের হাজতে পুরে, ডাক্তার খান সাহেবের কংগ্রেস-মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়ে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হ'লেন। এ-ব্যাপারে এস্কান্দার মীর্জাও তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তিনি তখন পেশোয়ারের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। কায়ুম খান একটা প্রদেশের মন্ত্রী হয়েই তুষ্ট রইলেন না। তিনি চাইলেন, লিয়াকত আলীকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল ক'রতে। কায়ুম খান নিজের ক্ষমতা বাড়িয়ে চললেন দ্রুত। লিয়াকত আলী চেষ্টা ক'রেও তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলে না।

এদিকে লিয়াকতআলী খালিকুজ্জামানকে মুসলিমলীগের পদ থেকে সরিয়ে প্রেসিডেণ্ট হ'লেন। আর জেনারেল সেক্রেটারি ক'রলেন কায়ুম খানের ঘোরতর শত্রু ইউসুফ খাট্টককে। উল্লেখ্য, কায়ুমখানের মতো খালিকুজ্জামানও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছিলেন।

সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রী খুহ্‌রো ছিলেন সেখানকার সবচেয়ে বড়ো জমিদার। তিনি ছিলেন জিন্নাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তি। জিন্নাহ্ মারা

যাবার পর লিয়াকত আলী তাঁকে সরিয়ে তাঁর নিজের লোক পীর ইলাহি বক্সকে মুখ্যমন্ত্রী করলেন। কিন্তু খুহ্রোকে রাজনীতি থেকে একেবারে হটিয়ে দিতে পারলেন না তিনি।

পাঞ্জাবের প্রাদেশিক মুসলিমলীগের সভাপতি ছিলেন মামদোতের নবাব। তিনি জিন্নাহ্র প্রিয়পাত্র ছিলেন। দৌলতানা এবং তার মধ্যে যখন ক্ষমতার দখল নিয়ে লড়াই শুরু হ'লো তিনি সেই সুযোগে নবাবের মন্ত্রিসভা ভেঙে দিলেন। নবাব তখন তাঁর দলবল নিয়ে সোহ্রাওয়ার্দীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে 'জিন্নাহ্ আওয়ামী লীগ' গ'ঠন করেন।

অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যায় জড়িত হ'য়ে লিয়াকত আলী ক্রমাগত সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে গেলেন, চালিয়ে গেলেন ভারত-বিরোধী জিগির। 'ঐসলামিক রাষ্ট্র ঐসলামিক রাষ্ট্র' বলে চেঁচালেও নিজে রোজা-নামাজের ধার ধারতেন না। ধর্মীয় আচার-আচরণ একেবারেই পালন ক'রতেন না। প্রথম স্ত্রী বেঁচে থাকতেই লিয়াকত আলী দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী উত্তর-প্রদেশের এক ব্রাহ্মণ-পরিবারের মেয়ে। পন্থ তাঁদের উপাধি। শুধু লিয়াকত আলীই নন, মামদোত, দৌলতানার পরিবারের ছেলেমেয়েরাও ইসলামের রীতিনীতি মানেন না কখনও।

লিয়াকত আলীকে নিজের ফাঁদেই পড়তে হ'লো। জামাতে ইসলাম, জমিয়ত-উলেমা-ই-ইসলাম, খাকসার প্রভৃতি দল থেকে পাকিস্তানকে যথার্থ ঐসলামিক রাষ্ট্র করার চাপ এলো। ইসলামের বিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী বলে কিছু নেই। সেখানে আমিরই সর্বেসর্বা। মদ্যপান, নাচগান নিষিদ্ধ। জবাব দিতে হিমসিম খেয়ে গেলেন লিয়াকত আলী খান।

লিয়াকত আলী পূর্ববাঙলার জন্য কিছু তো ক'রলেনই না, বরং

পূর্ববাঙলার ওপর শোষণ চালাতে থাকলেন। পূর্ববাঙলার মুসলিম-লীগের সদস্যরাই অভিযোগ ক'রতে থাকলেন, প্রধানমন্ত্রী এবং পশ্চিমাশাসকগোষ্ঠী পূর্ববাঙলাকে উপনিবেশ বানাবার চেষ্টা ক'রছেন।

লিয়াকত আলীর বিরুদ্ধে ক্রমে পশ্চিমের একটি শক্তিশালী চক্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এবং তাদেরই হাতে তিনি নিহত হলেন শেষ পর্যন্ত। তারিখটা ১৬ অক্টোবর, ১৯৫১ সাল।

লিয়াকত আলী যাকে এনে গভর্নর জেনারেল ক'রেছিলেন, লিয়াকত আলী নিহত হবার পর সেই খাজা নাজিমউদ্দীন গভর্নর জেনারেলের পদ ছেড়ে নেমে এলেন প্রধানমন্ত্রীর গদিতে। গভর্নর জেনারেল হ'লেন পাঞ্জাবের গোলাম মহম্মদ। লিয়াকত আলীর মতো তিনিও নানান সমস্যার সম্মুখীন হ'লেন।

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী তখন মিয়া মমতাজ দৌলতানা। তিনি দাবি তুললেন আহম্মদী-সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু ঘোষণা ক'রতে হবে এবং আহম্মদী-সম্প্রদায়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাফরউল্লাহ্ খানকে বরখাস্ত ক'রতে হবে। শিগ্‌গীরই লাহোর. শিয়ালকোট, রাওয়ালপিণ্ডি, মুলতান এবং করাচিতে আহম্মদী-বিরোধী দাঙ্গা শুরু হ'লো। আহম্মদী-সম্প্রদায়ের প্রচুর লোক মারা গেল। ৩ মার্চ (১৯৫৩) ওয়াজির খান মসজিদের সামনে লাহোরের ডেপুটি পুলিশ-সুপারিনটেনডেণ্ট ফেরদৌস শাহকে গুলি ক'রে হত্যা করা হ'লো। আইনশৃঙ্খলা বলতে কিছুই রইল না সেখানে। মৌলানা আবদুল সাত্তার নিয়াজীর নেতৃত্বে আহম্মদী-বিরোধী সম্প্রদায় স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রল। তাদের হেড কোয়ারটার স্থাপিত হ'লো কাশ্মিরী-গেট মসজিদে। এমন কি তাদের একজন নেতা শেখ হিশামউদ্দীন দিল্লী এসে নেহেরুর সঙ্গে দেখা ক'রে এ ব্যাপারে সাহায্য পর্যন্ত চেয়েছিলেন। নেহেরু তার

প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ নাকচ ক'রে দেন। পাকিস্তানে ফেরা মাত্রই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ..

অবস্থা আয়ত্তে আনতে সরকারকে শেষটায় সামরিকশাসন জারি করতে হ'লো। মেজর জেনারেল আজম খান ছিলেন তখন সেখানে জি. ও. সি। দৌলতানাকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে পাক-সেনাবাহিনীর দশম ডিভিসনের ওপর শাসন কর্তৃত্ব দেওয়া হ'লো। লাহোরকে ছ'টা সেকটরে ভাগ করে, এক-একটা সেকটরে এক-একজন ব্রিগেডিয়ারের অধীনে সৈন্য মোতায়েন করা হ'লো। বিদ্রোহীরা ১০ মার্চ আত্মসমর্পণ ক'রতে বাধ্য হ'লো। ১৫ মে পর্যন্ত সেখানে সামরিকশাসন বজায় ছিল। সেনাবাহিনীর গুলিতে কয়েকদিনে দু'হাজারের মতো লোক হতাহত হ'য়েছিল।

১৯৫৩ সালের ১৭ এপ্রিল গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ প্রধানমন্ত্রী নাজিমউদ্দীনকে বরখাস্ত ক'রে বসলেন অকস্মাৎ। পার্লামেণ্টে অধিবেশন্ হ'লো না, অনাস্থা প্রস্তাব উঠল না, অথচ নাজিমউদ্দীন গদী হারালেন। পাকিস্তান তখনো বৃটিশ ডোমিনিয়ন। নাজিমউদ্দীন তাই মরিয়া হ'য়ে একবার রানীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা ক'রলেন। কিন্তু ফোন ক'রতে গিয়ে দেখলেন লাইন কাটা। নাজিমউদ্দীনও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হ'লেন।

অনেকেই হয়তো লক্ষ্য ক'রেছিলেন, তিনদিন আগে মধ্যপ্রাচ্য থেকে তিনজন আমেরিকান দেখা ক'রতে এসেছিলেন গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে। কিন্তু তখন হয়তো অনেকেই অনুমান ক'রতে পারেন নি যে, এই প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে তাঁরা জড়িত। নাজিমউদ্দীন যেদিন বরখাস্ত হ'লেন তার আগের দিন ওয়াশিংটন থেকে বগুড়ার চৌধুরী মহম্মদ আলী হঠাৎ এসে পৌঁছলেন করাচি। তিনি ওয়াশিংটনে পাকিস্তানের

রাষ্ট্রদূত ছিলেন। গোলাম মহম্মদ নাজিমউদ্দীনকে সরিয়ে সে জায়গায় মহম্মদ আলীকে বসালেন। অবাক কাণ্ড। রাষ্ট্রদূত থেকে রাতারাতি প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভ!

১৯৫৩ সালের গোড়ায় কৃষকনেতা হাজী দানেশের নেতৃত্বে পূর্ব-পাকিস্তানে প্রথম অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল গঠিত হ'লো; নাম —'পূর্ব-পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল'। ঢাকা আরমানিটোলা ময়দানে ওই দলের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'লো। গণতন্ত্রীদলের ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম সাহেব হকসাহেবকে শোনালেন নতুন দলের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য। কর্মকর্তাদের নামও বললেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে রফিকুল ইসলাম সাহেব নিজের নাম বলতেই হকসাহেব হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। বললেন, 'তুই যার ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেটা আবার একটা দল নাকি? তবে হ্যাঁ, একটা মানুষ আছে বটে তোদের দলে; হাজী দানেশ।'

সারা দেশ তখন মুসলিমলীগের বিরুদ্ধে রোষে ফেটে পড়ছে; দাবি উঠছে সাধারণ নির্বাচনের। পাকিস্তান হবার পর ছয় বছর কেটে গেছে, নির্বাচনের নামগন্ধ নেই। এমন কি এতদিনে একটা শাসনতন্ত্র পর্যন্ত রচিত হয় নি!

কেন্দ্রীয় সরকার শেষে নির্বাচন ক'রতে রাজী হ'লেন। এই সময় শাসনতন্ত্রের মূলনীতি নির্ধারণের জন্যও একটি কমিটী হ'লো। কমিটী রিপোর্ট দিল যে, উর্ধ্বে পরিষদ গঠিত হবে প্রাদেশিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে। নিম্ন এবং উর্ধ্ব—দুই পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে পাশ হবে বাজেট। তার অর্থ দাঁড়ালো এই, সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্বেও পাকিস্তানের শাসন-কাঠামোয় পূর্বপাকিস্তানীদের কোনো ভূমিকাই থাকছে না। পূর্বপাকিস্তানীরা এই রিপোর্টের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সুরু ক'রলো শেষে বাতিল হ'লো ওই রিপোর্ট। আবার প্রস্তুত

হ'লো নতুন রিপোর্ট। এবারের রিপোর্টে অবশ্য বলা হ'লো জাতীয় পরিষদে পূর্বপাকিস্তানের আসনসংখ্যা পশ্চিম-পাকিস্তানের সমানই হবে। কিন্তু জনসংখ্যা অনুপাতে সদস্য বণ্টনে রাজী হ'লো না তারা কিছুতেই।

নির্বাচন এসে গেছে। ছাত্ররা চায় মুসলিমলীগকে হটাতে। তারা বুঝল, মুসলিমলীগের সঙ্গে লড়াই ক'রতে হ'লে পাকিস্তানের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে এক হ'তে হবে। যুক্তফ্রন্ট করার কথা উঠল। কিন্তু আসন-রফা কিছুতেই হয় না। শেষে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর ছাত্রদের চাপে পড়ে একুশদফার ভিত্তিতে কৃষক-শ্রমিক পার্টি, আওয়ামীলীগ, গণতন্ত্রী দল, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দলের সমন্বয়ে গঠিত হ'লো যুক্তফ্রন্ট। দলের নেতা হলেন মৌলানা ভাসানী, ফজলুল হক এবং এবং হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী।

জনসাধারণের দরবারে যুক্তফ্রন্ট নেতারা 'একুশ-দফার' ওয়াদা ঘোষণা ক'রলেন। তাঁরা বললেন, নির্বাচনে জিতলে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ক'রবেন, ভূমিহীন কৃষকদের উদ্‌বৃত্ত জমি দেবেন, এবং খাজনা হ্রাস ক'রবেন, চাষীদের পাটের ন্যায্য মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থাও ক'রবেন, কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় প্রথা প্রবর্তন এবং কুটিরশিল্প ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন ক'রবেন। তাদের অন্যান্য ওয়াদা ছিল, পূর্বপাকিস্তানকে শিল্পে ও কৃষিতে স্বাবলম্বী করা, অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কালাকানুন বাতিল, নিম্ন বেতনভোগী সরকারি কর্মচারীদের বেতন বাড়ানো, জননিরাপত্তা আইন ও অরডিন্যান্স বাতিল, বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তিদান, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দান, বিচার ও শাসন বিভাগকে পৃথক্ করা, শহীদ-মিনার নির্মাণ করা, নৌবাহিনীর হেডকোয়ারটার পূর্বপাকিস্তানে স্থাপন করা, ২১ ফেবরুয়ারি ছুটি ঘোষণা, ইত্যাদি। হক-ভাসানীর বক্তৃতায়

সারা পূর্ববাঙলায় সারা পড়ে গেল। যেখানেই যান, অভূতপূর্ব সংবর্ধনা পান হক-ভাসানী।

যুক্তফ্রণ্টের জনপ্রিয়তায় মুসলিমলীগ ভীত হ'য়ে পড়লো। কিন্তু তখন আর নির্বাচন বন্ধ রাখার উপায় নেই। নির্বিচারে যুক্তফ্রন্ট কর্মীদের আটক ক'রলেন লীগ-সরকার। চৌদ্দ হাজার কর্মীকে আটক রেখেও কিন্তু শেষ রক্ষা হ'লো না। শোচনীয় ভাবে মুসলিমলীগ হেরে গেলো নির্বাচনে।

যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হ'লো। হকসাহেব হ'লেন তার মুখ্যমন্ত্রী। প্রথমে নিজের দলের কয়েকজনকে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন ক'রলেন তিনি। বাঙালীর একান্ত আপনার জন হকসাহেব পূর্ববাঙলার কর্ণধার হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের লোকেরাও খুশি হ'য়েছিলেন সেদিন। কলকাতায় তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হ'লো। হকসাহেব সাড়া দিলেন সে ডাকে। ১৯৫৪ সালের ৩০ এপ্রিল বেলা সাড়ে তিনটায় ওরিয়েণ্ট এয়ার ওয়েজের একটি বিমানে এসে পৌঁছলেন তিনি দমদমে। সাত দিন ধরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হ'লো। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি যে ভাষণ দেন তার মর্মার্থ হ'লো: রাজনৈতিক কারণে বাঙলাকে দ্বিখণ্ডিত করা হ'লেও বাঙালীর শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং বাঙালীত্বের যে একটা নিজস্ব ধারা আছে, দুই বাঙলায় তা প্রবাহিত হ'য়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। সে দিক থেকে বাঙালীকে কোনো শক্তিই দ্বিখণ্ডিত ক'রতে পারবে না।

ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি জানালেন ভিসা-প্রথা বিলোপ এবং দুই বাঙলার মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর করার চেষ্টা ক'রবেন তিনি।

কেন্দ্রীয় লীগনেতারা হক-মন্ত্রিসভাকে সুনজরে দেখেন নি গোড়া থেকেই। কলকাতায় হকসাহেবের ওইসব বক্তৃতা তাঁকে অপসারণের

সুযোগ এনে দিল কেন্দ্রকে। হকসাহেবের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ তোলা হ'লো। অবিভক্ত বাঙলার সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রধান-মন্ত্রি আবুল কাসেম ফজলুল হক স্বাধীন পূর্ববাঙলায় হ'লেন বিশ্বাস-ঘাতক। আর কথাটা বললেন কিনা বগুড়ার ছেলে মহম্মদ আলী। আশ্চর্য!

করাচির কর্তারা যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা খারিজ করার সুযোগ খুঁজছিলেন, পেয়েও গেলেন পর পর কয়েকটা অজুহাত।

হকসাহেব তাঁর মন্ত্রিসভায় একটা পররাষ্ট্র দফতরও সৃষ্টি ক'রেছিলেন।

পূর্বপাকিস্তান কী আলাদা হ'তে চাইছে। না হ'লে পররাষ্ট্র দফতর কেন?

করাচি থেকে প্রধানমন্ত্রীর জরুরি বার্তা এলো। জানতে চেয়েছেন, পূর্বপাকিস্তানে পররাষ্ট্র দফতর কী প্রয়োজনে?

বার্তা পেয়ে হকসাহেব রাগে উত্তেজনায় থর থর ক'রে কাঁপছেন। অভিভক্ত বাঙলার জাঁদরেল গভর্নর হার্বার্টকে পর্যন্ত যিনি কৈফিয়ত দেন নি তাঁর কাছে কৈফিয়ত চাইছে গোলাম মহম্মদ! পাকিস্তান সৃষ্টির সময় কোথায় ছিল গোলাম মহম্মদ, মহম্মদ আলীর দল? সেকরেটারিকে জবাব দিতে বললেন দু'এক কথায়—প্রয়োজন আছে, ক'রেছি। পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যই এই দফতর।

বার্তা পেয়ে করাচির কর্তারা রেগে গেলেন আরও। পারলে মুহূর্তে খারিজ করেন মন্ত্রিসভা। কিন্তু যুক্তফ্রণ্টের পিছনে যে আছে পাঁচ কোটি মানুষ। তাদের কথা ভেবেই কর্তারা অন্যপথ ধরলেন। সোহ্‌রাওয়ার্দীর ডাইরেক্ট এ্যাকশানের পথ ধরে উত্তেজিত ক'রে তুললেন আদমজীর অবাঙালী শ্রমিকদের। তারা ছোরা আর পেট্রোল নিয়ে আক্রমণ চালাল বাঙালী শ্রমিকদের ব্যারাকে।

কী, এতো বড়ো আস্পর্ধা! বাঙলাদেশে বসে বাঙালী শ্রমিকদের ওপর হামলা! রুখে উঠল বাঙালী শ্রমিকেরাও। দাঙ্গা বেঁধে গেল দুই দলে।

'আদমজী জুট মিল এমন দুর্গ-বিশেষ যে দিন-কয়েক তো সে খবর বহির্জগতে পৌঁছলই না। শেষে খবর পেয়ে মুজিবুর রহমান ভ্যান ভ্যান পুলিশ নিয়ে গেলেন সেখানে। ছুটে এলেন মৌলানা ভাসানী। তিনি যে বাঙালী শ্রমিক ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট। তাঁরা গিয়ে দেখলেন কংক্রিটের রাস্তায় চাপ চাপ তাজা রক্ত। এখনো মৃত দেহ পড়ে রয়েছে এখানে-সেখানে। ছুরির আঘাতে ফেঁসে গেছে ভুঁড়ি। ভিতরের পুকুরটা লাশে গাদ হ'য়ে গেছে। শ'য়ে শ'য়ে নয়, হাজারে হাজারে শ্রমিক মারা গেছিল সে দাঙ্গায়। কেউ জানে না কতো হাজার। শীতলক্ষ্যার জলে ভেসে গেছে কতো হতভাগ্যের দেহ। গোলাম মহম্মদ আর মহম্মদ আলীর ষড়যন্ত্রের বলি ওরা।

দৃঢ়হাতে মুজিবুর রহমান অবস্থা আয়ত্তে আনলেন। তাতে কী? অযোগ্যতা এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে গোলাম মহম্মদ বরখাস্ত ক'রলেন যুক্তফ্রণ্টমন্ত্রিসভা। জারি ক'রলেন ৯৩ ধারা। গ্রেপ্তার ক'রলেন আতাউর রহমান, মুজিবুর রহমান, আজিজুল হক প্রমুখকে। কেন্দ্রের কর্তাদের ভয়, তাঁরা বাইরে থাকলে তাঁদের সব জারিজুরি যাবে ভেস্তে। ঢাকায় কে. এম. দাস লেনের বাড়িতে ফজলুল হককে অন্তরীণ ক'রে রাখা হ'লো।

চৌধুরী খালিকুজ্জামানকে বিশ্বাস নেই। ৯৩ জারি ক'রেই তাঁকে সরিয়ে গোলাম মহম্মদ গভর্নর ক'রে পাঠালেন প্রতিরক্ষা-সচিব এস্কান্দার মির্জাকে। ঢাকার পা ফেলতে-না-ফেলতেই মির্জার মিলিটারি শাসন সুরু হ'য়ে গেল। চার হাজারের মতো

রাজনৈতিক কর্মী আর নেতাকে এনে পুরলেন হাজতে। টুঁ শব্দ করলেই টুঁটি চেপে ধরেন মির্জা।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কিছুদিন বাদেই চৌধুরী মহম্মদ আলী কমাণ্ডার-ইন-চীফ জেনারেল আয়ুব খানকে নিয়ে গিয়েছিলেন আমেরিকাতে। ওই বছরই ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেণ্ট রিচার্ড নিক্সন এলেন করাচিতে। পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকার মিতালি শুরু হ'লো। '৫৪ সালের মে মাসে সামরিক সাহায্য নিয়ে পাকিস্তান এবং আমেরিকার মধ্যে চুক্তি হ'লো। ওই বছরই সেপ্টেম্বর মাসে সিয়াটো (South East Asia Treaty Organisation) এবং '৫৫ সালের ফেবরুয়ারি বাগদাদ প্যাক্টে (এখন তার নাম সেণ্টো) যোগ দিল পাকিস্তান। পরিবর্তে মহম্মদ আলী আমেরিকাকে গিলগিট এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে সামরিক এবং গুপ্তচর ঘাঁটি খোলার অনুমতি দিলেন। একথা বুঝতে বোধহয় আর অসুবিধা থাকার কথা নয় যে, আমেরিকা নিজের স্বার্থে সি. আই. এ'র সাহায্যে বগুড়ার মহম্মদ আলীকে গভর্নর গোলাম মহম্মদের সহায়তায় গদীতে এনে বসিয়েছিলেন। নাজিমউদ্দীনের দ্বারা নিশ্চয়ই তাদের সে স্বার্থসিদ্ধির উপায় ছিল না। থাকলে নাজিমউদ্দীনকে সরিয়ে মহম্মদ আলীকে আনতেন না।

নিজের অবস্থাও যাতে নাজিমউদ্দীনের মতো না হয়, তার জন্য মহম্মদ আলী উত্তর-পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধুর নেতাদের সঙ্গে একটা আঁতাত গড়ে তুললেন। গোলাম মহম্মদ সব খবর পেলেন। পাঞ্জাবী গভর্নর গোলাম মহম্মদ, মহম্মদ আলীর ক্ষমতা বাড়তে দিতে চাইলেন না তিনি। তিনি পশ্চিম-পাকিস্তানের চারটি প্রদেশকে একটা ইউনিট বানিয়ে মহম্মদ আলীর ক্ষমতা

ক্ষুণ্ণ ক'রতে সচেষ্ট হ'লেন। সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের নেতাদের এই ব'লে সাবধান করলেন যে, তারা যদি তাঁর এক ইউনিট গঠনের প্রস্তাব বিরোধিতা ক'রেন তাহলে তা'দের বিরুদ্ধে ডিসকোয়ালিফিকেশন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গভর্নর জেনারেল একদিন করাচির বাইরে ছিলেন। সেই অবসরে মাত্র আধঘন্টা সময়ের মধ্যে মহম্মদ আলী ওই এ্যাক্টটাকে কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেম্বলির সাহায্যে বাতিল করালেন, তারপর ঋণ-চুক্তির অজুহাতে আমেরিকা চলে গেলেন। গভর্নর জেনারেল এতে খুব রেগে গেলেন। তিনি মহম্মদ আলীকে ওয়াশিংটন থেকে ডেকে পাঠালেন। বলতে গেলে, বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে মহম্মদ আলি করাচি ফিরে এলেন।

জরুরি অবস্থা ঘোষণা ক'রে মন্ত্রিসভা বাতিল ক'রলেন গোলাম মহম্মদ। ভেঙে দিলেন গণ-পরিষদ, সেই সঙ্গে ভেস্তে গেল 'প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র'। মন্ত্রিসভা ভেঙে দিল বটে কিন্তু ওই দিন বিকেলেই বিপাকে পড়ে গোলাম মহম্মদকে আবার মন্ত্রিসভা গড়তে হ'লো। প্রধানমন্ত্রী রয়ে গেলেন বগুড়ার মহম্মদ আলীই। তবে তার ক্ষমতা বলতে আর কিছুই রাখলেন না। ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা হলেন সব গোলাম মহম্মদের পছন্দের ব্যক্তি। গোলাম মহম্মদের বার্তা পেয়ে জুরিখ থেকে ছুটে এলেন সোহ্‌রাওয়ার্দী। পেলেন আইন-দপ্তর। অর্থমন্ত্রী হ'লেন চৌধুরী মহম্মদ আলী। মন্ত্রিসভায় আনলেন ডাক্তার খানসাহেবকে। সীমান্তগান্ধী গফ্‌ফার খানের ভাই ডাক্তার খানসাহেব। গফ্‌ফার খান তো লোভে মজবে না। তাই খানসাহেবকে দলে ভিড়িয়ে বানচাল ক'রতে চাইলেন পাখতুন-আন্দোলন। ইস্কান্দার মির্জাকে নিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ক'রে। আনলেন জেনারেল আয়ুব খানকে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করিয়ে কায়ুম খানকেও নিয়ে

এলেন ওই ক্যাবিনেটে। কায়ুম খানের জায়গায় পুলিসের প্রাক্তন ইনস্‌পেকৃটর জেনারেল সরদার আবছুর রশিদকে নিয়ে বসালেন। সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রী পীরজাদা আবছুল সাত্তার এক ইউনিটের বিরোধিতা ক'রে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। গভর্নর জেনারেল তাঁকে বরখাস্ত ক'রে নিয়ে বসালেন মহম্মদ আয়ুব খুহ্‌রোকে। যাঁরা গোড়ায় এই এক ইউনিটের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরাই পরে তা আবার সমর্থন ক'রলেন।

কিন্তু গোলাম মহম্মদের স্বৈরাচারে রাজনৈতিক দলগুলো তো বটেই, সুপ্রীমকোর্ট পর্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ ক'রল। নানান মহল থেকে তাঁর ওপর চাপ আসতে লাগল। শেষটায় তিনি কনষ্টিটুয়েন্ট এ্যাসেম্বলির অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হলেন। প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রতিনিধি নির্বাচন ক'রে পাঠালেন।

১৯৫৫ সালের অগস্ট মাসে গোলাম মহম্মদ বগুড়ার চৌধুরী মহম্মদ আলীকে পদত্যাগ ক'রাতে বাধ্য করালেন। পরিবর্তে মহম্মদ আলী পেলেন সেই আগেকার পদটি। আমেরিকায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হ'য়ে চলে গেলেন তিনি ওয়াশিংটন। অর্থমন্ত্রী চৌধুরী মহম্মদ আলী। বগুড়ায় মহম্মদ আলীর স্থলাভিষিক্ত হ'লেন। ১৯৫৫ সালের ৩ জুন পূর্বপাকিস্তান থেকে গভর্নর শাসন তুলে নেওয়া হ'লো। কেন্দ্রের নির্দেশে 'কৃষক-প্রজা পার্টি'র আবু হোসেন সরকারকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানালেন গভর্নর খাজা শাহাবউদ্দীন। ইস্কান্দার মির্জা মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ায় খাজা শাহাবউদ্দীন তাঁর জায়গায় গভর্নর হ'য়ে গিয়েছিলেন।

১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বরে নয়া কনষ্টিটুয়েন্ট এ্যাসেম্বলি এক ইউনিট বিলটি পাশ ক'রল।

পশ্চিম-পাকিস্তানের সবগুলো প্রদেশ নিয়ে একটা ইউনিট গড়ে তোলার বাসনা ছিল গোলাম মহম্মদের অনেক দিনের।

এক ইউনিট হ'লে পাকিস্তানের শাসন-ক্ষমতা পাঞ্জাবিদের হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না কেউ; পাঞ্জাবী-তনয় গোলাম মহম্মদও কায়েমী হ'য়ে বসতে পারবেন গদীতে। এক ইউনিট ক'রেই ডাক্তার খানসাহেবকে পশ্চিমপাকিস্তানের গভর্নর ক'রে পাঠালেন তিনি।

আর হকসাহেব হলেন কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হ'য়েই হকসাহেবের প্রথম চেষ্টা হ'লো শাসনতন্ত্র প্রণয়ন। অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি তা ক'রলেনও। ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ থেকে কার্যকরী হ'লো সে-শাসনতন্ত্র। বাংলা তাতে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেলো। সার্থক হ'লো বরকত সালাম রফিক জব্বার শফিকুরের রক্ত দেওয়া।

শাসনতন্ত্র কার্যকরী হওয়ার আগেই হকসাহেব চ'লে এলেন পূর্ব-পাকিস্তানে, গভর্নর হ'য়ে।

গভর্নর জেনারেল হ'য়ে অবধি গোলাম মহম্মদ সোয়াস্তি পান নি। গদি আগলে রাখতেই সারাক্ষণ তাঁকে বিব্রত থাকতে হ'য়েছে।

এই সময় সুযোগ বুঝে ইস্কান্দার মির্জা গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদকে অসুস্থের অজুহাতে ছুটি নওয়াতে বাধ্য করালেন। অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল হলেন ইস্কান্দার মির্জা। এবং বলা বাহুল্য, অস্থায়ী থেকে স্থায়ী হ'তে তার সময় লাগল না। ১৯৫৬ সালের ২ মার্চ থেকে নতুন শাসনতন্ত্র চালু হ'লো। ইস্কান্দার মির্জা কলকৌশল ক'রে নিজেকে পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত ক'রে নিলেন। এ-ব্যাপারে জেনারেল আয়ুব খানের যথেষ্টই সহায়তা ছিল।

ওদিকে কায়ুম খানও ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'লেন। টের পেয়ে মির্জা কায়ুম খানকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ থেকে হটিয়ে দিলেন।

নতুন শাসনতন্ত্রের ৩৭ (৩) ধারায় প্রেসিডেন্টকে তার ইচ্ছা-মতো প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হ'য়েছিল। মির্জা ক্রমাগত সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে গেলেন। খান আবদুল গফ্‌ফার খানের ছোটোভাই খানসাহেব। তাঁকে পশ্চিম-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী করা ঠিক ক'রলেন। মুসলিমলীগ তাঁকে সমর্থন করতে রাজী হ'লো না। মির্জা তখন গোপনে কিছু মুসলিমলীগ সদস্যকে ভাঙিয়ে এনে খান-সাহেবের সঙ্গে মিলে রিপাবলিকান পার্টি তৈরী করালেন। পশ্চিমপাকিস্তানের গভর্নর মুস্তাক আহম্মদ গুরমানি নিজে ওই নতুন রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে দেন। গুরমানি ছিলেন মির্জার হাতের লোক।

এদিকে সোহ্‌রাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। মির্জার সঙ্গে তিনি একটা গোপন আঁতাত গড়ে তুললেন। এতদিন সোহ্‌রাওয়ার্দী আমেরিকার সঙ্গে সামরিক জোটের বিরোধী ছিলেন। আওয়ামীলীগের অন্যতম কর্মসূচীও তাই ছিল। কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য সোহওয়ার্দী ওইসব যুদ্ধজোট সমর্থনের আশ্বাস দিলেন মির্জাকে। ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বরে পাঞ্জাবের চৌধুরী মহম্মদ আলী গিয়ে সোহ্‌রাওয়ার্দী ক্ষমতায় এলেন।

প্রধানমন্ত্রী হ'য়েই সোহ্‌রাওয়ার্দী বাতিল ক'রলেন আবু হোসেনের মন্ত্রিসভা। সে-জায়গায় আনলেন আতাউর রহমানকে। মুজিবুর রহমান আবার মন্ত্রিত্ব পেলেন।

ভাসানী-সোহ্‌রাওয়র্দীর 'আওয়ামী মুসলিমলীগ'-এর 'মুসলিম' শব্দটি ছেঁটে আগেই অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল করা হ'য়েছিল। এবার 'আওয়ামীলীগ' থেকে ভাসানীর দল বেরিয়ে এসে গড়লেন 'ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি'। মতভেদ হ'লো এক ইউনিট আর

পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে। সোহ্‌রাওয়ার্দী আগে এক ইউনিট এবং সিয়াটো চুক্তিজোটের বিরোধী ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হ'য়েই ভুলে গেলেন সব। এক ইউনিট আর পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির গোঁড়া সমর্থক বনে গেলেন তিনি রাতারাতি।

১৯৫৭ সালের ফেবরুয়ারিতে কাগমারি সম্মেলনে মৌলানা ভাসানী তীব্র সমালোচনা ক'রলেন সোহ্‌রাওয়ার্দীর। আভাস দিলেন নতুন দল গঠনের। কাগমারীর মতো ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন পূর্বপাকিস্তানে আর হয় নি। দেশ-বিভাগের আগে আসামে যে-ভাসানী ছিলেন মুসলিমলীগের গোঁড়া সমর্থক সেই ভাসানী বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের এমন আশ্চর্য সম্মেলন ক'রেছেন ভাবতে অবাক লাগে। টাঙাইল থেকে কাগমারী পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তায় তৈরি ক'রেছিলেন তিনি অনেকগুলো তোরণ। লেনিন, শেক্সপীয়র, আব্রাহাম লিন্‌কন, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, প্রমুখের নামে নামকরণ ক'রেছিলেন সে-সব তোরণের। কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলও যোগ দিয়েছিলেন সে সম্মেলনে।

ওই বছরই জুলাই মাসে ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে গণতন্ত্রী সম্মেলন হ'লো। সারা পাকিস্তান থেকে বারোশ'র মতো প্রতিনিধি এসেছিলেন সে-সম্মেলনে। এসেছিলেন মিয়া ইফতেখারউদ্দিন। এসেছিলেন মানবতার মূর্ত-প্রতীক সীমান্ত গান্ধী আব্দুল গফ্‌ফার খান।

এক ইউনিট বাতিল, স্বায়ত্তশাসন আদায়. যুদ্ধ-জোট বর্জন প্রভৃতি প্রশ্নে 'ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি'র জন্ম হ'লো সেদিন। মুখে না বললেও একথা আজ আর কারু অজানা নেই যে, ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি মানেই কমিউনিস্ট পার্টি।

'৫৭ সালের অক্টোবর মাসে সোহ্‌রাওয়ার্দীকে বিদায় ক'রে

চুন্দ্রীগড়কে এনে প্রধানমন্ত্রীর তখতে বসালেন মির্জা। বেশিদিন থাকতে পারলেন না চুন্দ্রীগড়। পদত্যাগ ক'রতে বাধ্য হ'লেন।

এলেন ফিরোজ খান নূন।

ওদিকে পূর্বপাকিস্তানের পটও বদল হ'লো। '৫৮ সালের ৩১ মার্চ গভর্নর ফজলুল হক আতাউর রহমানকে হটিয়ে আবার আবু হোসেন সরকারকে নিয়ে এলেন।

ক্ষিপ্ত হ'য়ে সোহ্রাওয়ার্দী তৎক্ষণাৎ ফিরোজখান নূনকে ট্রাঙ্ক-কলে ভয় দেখালেন, আধঘণ্টার মধ্যে ফজলুল হককে পূর্বপাকিস্তানের গভর্নর পদ থেকে না সরালে নূন-মন্ত্রিসভা থেকে তিনি আওয়ামী-লীগ সদস্যদের সমর্থন তুলে নেবেন। আওয়ামীলীগের সমর্থন না পেলে নূন-মন্ত্রিসভার পতনও অনিবার্য। কী আর করেন নূন-সাহেব! গদী রাখতে গিয়ে হকসাহেবকে বরখাস্ত ক'রে চীফ সেকরেটারি হামিদ আলীকে গভর্নর ক'রে পাঠালেন পূর্বপাকিস্তানে। আর পরের দিনই আবু হোসেন সরকারকে বরখাস্ত ক'রলেন হামিদ আলী। এ যে বাদশা হারুন-অর-রশিদের সময়কার আবু হোসেনের অবস্থা দাঁড়ালো। বোগদাদের আবু হোসেনের মতোই বাঙলার আবু হোসেন একদিনের বাদশা হ'য়েছিলেন। আতাউর রহমান আবার স্বস্থানে ফিরে এলেন। ১৮ জুন পরিষদে সরকারপক্ষের একটি প্রস্তাব ভোটে পরাজিত হ'লো। অর্থাৎ প্রমাণ হ'লো, আতাউর রহমানের দলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর নেই। পরদিনই আতাউর রহমান পদত্যাগ ক'রলেন। মন্ত্রিসভা গঠন ক'রতে আবার ডাক পড়ল আবু হোসেন সরকারের। তিনটা দিনও কাটেনি, আবু হোসেন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে মুজিবুর রহমান একটি অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন। প্রস্তাবটি পাশও হ'য়ে গেল। ২৩ জুন পদত্যাগ ক'রলেন সরকারসাহেব। ২৫ জুন এস্কান্দার মির্জা সাময়িকভাবে বিধানসভা বাতিল ক'রে দিয়ে প্রেসিডেন্ট শাসন চালু ক'রলেন।

কিছুদিন বাদে আবার প্রেসিডেন্ট শাসন তুলে নেওয়া হ'লো। আওয়ামীলীগকে আবার মন্ত্রিসভা গঠনের জন্ম ডাকা হ'লো।

স্পীকার আবদুল হাকিম কৃষক-শ্রমিক পার্টির। তাই আওয়ামীলীগ ঠিক ক'রলো, আবদুল হাকিমকে স্পীকারের পদ থেকে সরাতে হবে আগে। কৃষক-প্রজা পার্টিও ঠিক ক'রলো অ্যাসেম্বলির কাজ চালাতে দেবে না তারা। এ্যাসেম্বলিতে এই দুই দলের সংঘর্ষের পরিণতি, ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীর মৃত্যু। ঘটনাটি হয় ২৩ সেপ্টেম্বর।

এদিকে মিঞা ইফতেখারউদ্দীনের নেতৃত্বে ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি এক ইউনিট ভাড়ার দাবিতে মির্জার বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চালালেন। রিপাবলিকান দল ছেড়ে অনেক সদস্য আবার মুসলিমলীগে ভিড়ে গেল। তখন আয়ুব খানের কনিষ্ঠ ভাই সরদার বাহাদুর ছিলেন পশ্চিমপাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদে মুসলিমলীগ দলের নেতা। রিপাবলিকান দলের পতন দেখে মির্জা ৯৩ ধারা অর্থাৎ গভর্নরের শাসন জারি ক'রলেন। ফল দাঁড়াল এই, দুই মাস বাদেই রিপাবলিকান দল আবার ক্ষমতায় ফিরে গেল। খান সাহেব অবশ্য অজ্ঞাত কারণে পদত্যাগ ক'রলেন। তার জায়গায় এলেন পুলিশের প্রাক্তন ইন্সপেক্টর জেনারেল সরদার আবদুর রশিদ। মির্জার রিপাবলিকান দল এক ইউনিট ভাঙার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টির সঙ্গে একটা আঁতাত গড়ে তুলল। ফলে কেন্দ্রে আওয়ামীলীগ রিপাবলিকান দলের জোট ক্ষমতায় গেল। কিছুদিন বাদে সরদার আবদুর রশিদকে সরিয়ে তার জায়গায় মির্জা নিয়ে এলেন মুজাফফর আলি কাজিলবাসকে।

'৫৭ সালের মে মাসে লাহোরে ডঃ খানসাহেব খাকসারদের হাতে নিহত হলেন। খানসাহেবের ঘনিষ্ঠ মহলের সন্দেহ, এই হত্যার

পিছনে মির্জার হাত ছিল। খানসাহেবের আততায়ী আতাউল্লাহর অবশ্য বিচারে ফাঁসী হয়।

এদিকে কাইয়ুম খান মুসলিমলীগের প্রেসিডেন্ট হয়ে শাসক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে লাগলেন। কায়ুম খান অনতিবিলম্বে সাধারণ নির্বাচনের দাবি জানালেন। তিনি যুদ্ধ জোটেরও বিরোধিতা ক'রলেন।

সোহ্‌রাওয়ার্দীও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুকূলে মত প্রকাশ ক'রলেন। তিনি চাইছিলেন, নির্বাচনের পর মির্জাকে সরিয়ে নিজের পছন্দমাফিক কাউকে প্রেসিডেন্ট ক'রতে।

মির্জা সোহ্‌রাওয়ার্দীর মতলব আঁচ ক'রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে কয়েকজন রিপাবলিকান দলের সমর্থন তুলে নিলেন। ফলে সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা ভেঙে গেল। '৫৭ সালের ১১ অক্টোবর সোহ্‌রাওয়ার্দী পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তাঁর জায়গায় এলেন আই. আই. চুন্দ্রীগড়। মির্জার সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ডিসেম্বরে তাকেও পদত্যাগ করতে করতে হ'লো। এলেন পাঞ্জাবের ফিরোজ খান নূন। চুন্দ্রীগড় তাঁর ক্যাবিনেটে খুহ্‌রোকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ক'রলেন।

কালাতের খানও মির্জার পক্ষে সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ালেন। '৫৭ সালের এপ্রিলের দিকে কালাতে বিদ্রোহ দেখা দিল। '৫৮ সালের অক্টোবরে এই বিদ্রোহ তীব্র হয়ে উঠল। এমন কি সেখানে পাকিস্তানী পতাকা পর্যন্ত পুড়িয়ে ফেলা হ'লো। ৬ অক্টোবরে কালাতের খানকে গ্রেপ্তার করা হ'লো। সেই জায়গায় তাঁর পুত্র দাউদ ইয়ারকে গদিতে এনে বসালেন মির্জা।

মির্জা দেখলেন অবস্থা শোচনীয়। তিনি ৭ অক্টোবর রাত সাড়ে আটটায় সারাদেশে সামরিক আইন জারি ক'রলেন। জেনারেল আয়ুব খানকে সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত ক'রলেন

তিনি। মির্জা এবং আয়ুব বেশ কয়েকদিন আগেই এই পরিকল্পনা ক'রেছিলেন।

ফিরোজা খান নূনের ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা তখন এক পার্টিতে মশগুল। মদের পেয়ালা হাতে সুখের খোয়াব দেখে চলেছেন তাঁরা।

রাত সাড়ে দশটার সময় মির্জার এ. ডি. সি গিয়ে ঘুম থেকে উঠিয়ে নূনের হাতের একটি চিঠি দিলেন। প্রধানমন্ত্রী নূন বললেন, একটু দাঁড়ান। 'জরুরি কিছু আছে কিনা দেখি। যদি উত্তর দিতে হয়।'

এ. ডি. সি বললেন, 'না স্যার উত্তর দেবার কোনো প্রয়োজন হবে না।' বলেই হন্ হন্ ক'রে এ. ডি. সি চলে গেলেন।

ফিরোজ খান নূন চিঠি খুলে পড়তে শুরু ক'রলেন :

প্রেসিডেণ্ট হাউস
করাচি
৭ অক্টোবর, ১৯৫৮

প্রিয় স্যার ফিরোজ,

মনের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া ক'রে আমি এই সিদ্ধান্তে এলাম যে, শাসন-ক্ষমতা পুরোপুরি নিজের হাতে তুলে না নিলে দেশ সুগঠিত হ'তে পারবে না। শাসনক্ষমতা তাই আমি নিজের হাতেই তুলে নিচ্ছি। ১৯৫৬ সালের ৩ মার্চের শাসনতন্ত্র দিয়ে আর কাজ চলছে না। পাকিস্তানের অস্তিত্বের পক্ষেও তা ক্ষতিকারক। যদি এই শাসনতন্ত্র নিয়ে কাজ চালাতে হয়, তা'হলে 'পাকিস্তান' বলে আর কিছু থাকবে না।

রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তাই আমি শাসনতন্ত্র বাতিল ক'রে, পরিষদ ভেঙে দিয়ে সব ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিলাম। আমার

একমাত্র দুঃখ এই যে, আপনি প্রধানমন্ত্রী থাকা কালেই আমাকে এই কঠিন ব্যবস্থা নিতে হ'লো। আপনার হাতে যখন গিয়ে এই চিঠি পৌঁছুবে, সারা দেশে তার মধ্যে সামরিক শাসন চালু হ'য়ে যাবে। জেনারেল আয়ুবকে আমি প্রধান সামরিকশাসক নিযুক্ত ক'রেছি।

ব্যক্তিগত ভাবে আপনার প্রতি আমার অনেক শ্রদ্ধা আছে। আপনার ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার জন্য আমি সব কিছুই করতে প্রস্তুত।

আপনার বিশ্বস্ত,
ইস্কান্দার মির্জা

সামরিক শাসন জারির ব্যাপারে মির্জার তেমন ইচ্ছা ছিল না। কারণ, তিনি পরিণতিটা ভাবতে পারছিলেন। প্রধানত আয়ুবের ইচ্ছা, চক্রান্ত এবং চাপেই মির্জা সামরিক শাসন জারি করেন। পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় আসার জন্য আয়ুব অনেক দিন থেকেই ষড়যন্ত্র করে চলেছিলেন। '৫৭ সালের গোড়া থেকেই আয়ুব এব্যাপারে সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট হন। ওই বছর এপ্রিল মাসে পাকসেনাবাহিনীর ডিভিসনাল কমাণ্ডারদের কনফারেন্সে আয়ুব সেই ইচ্ছাও প্রকাশ করেন।

আয়ুব এ্যালেন ডালেস এবং সি. আই. এর অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে আঁতাত গড়ে তুললেন। সেই আঁতাতে, গোড়ায় মির্জাকেও সঙ্গে নিলেন। ১৯৫৬ সালে সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে জাকার্তা যাওয়ার পথে ডালেস করাচি নেমে গোপনে মির্জা এবং জেনারেল আয়ুবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এবং তিনি মির্জা এবং আয়ুবকে তাঁর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখে আমেরিকার দু'জন আণ্ডার সেক্রেটারি ডাডলি সি. সার্প, ই.

পার্কিনস্ ম্যাকোয়ের এবং মার্কিন দূত হোরেস. এ হিলড্রেথ মির্জার সঙ্গে দেখা করেন। আমেরিকার সঙ্গে হৃদ্যতা বাড়িয়ে তোলার জন্য মির্জা হোরেস হিলড্রেথের মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ে পর্যন্ত দেন। ১৯৫৮ সালের ৮ মে আয়ুবের সঙ্গে এ্যালেন ডালেসের সাক্ষাৎ হ'লো। সেখানেই চূড়ান্ত হ'লো পরিকল্পনা। আমেরিকা আয়ুবকে সাহায্য ক'রতে চাইছিলেন এই জন্যে যে, নির্বাচনে মুসলিমলীগ ক্ষমতায় এলে তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। কারণ, কায়ুম খান যুদ্ধ জোটের বিরোধী বলে খবর ছড়াচ্ছে।

তারপর মে মাসের শেষ দিকে তিনি খবর পেলেন একদল মিলিটারি অফিসার নাসেরের মতো হঠাৎ ক'রে ক্যু ক'রে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা ক'রে চলেছে।

আয়ুব তাঁর ডাইরিতে সেই ঘটনা লিখে রেখেছিলেন :

২১ মে।

আমি ঝেলামে নেমে আজমের (জেনারেল আজম খান) সঙ্গে দেখা ক'রলাম। তিনি জানালেন, একটা গুজব শোনা যাচ্ছে কয়েকজন জেনারেল এবং বিগ্রেডিয়ার ক্যুয়ের ষড়যন্ত্র ক'রছে। পিণ্ডিতেও আমি ওইরকম একটা গুজব শুনেছিলাম। আমি আমার স্ত্রীকে সেকথা বললাম। সেও বলল যে, আমিও এই ধরনের গুজব শুনেছি। শুনলাম, কিছু অফিসারকে ভারতীয় চর বলে অভিযুক্ত করা হ'য়েছে।

২২ মে।

গুজব সম্পর্কে জেনারেল মুসাকে জিজ্ঞেস ক'রলাম। তিনি জানালেন, এইসব গুজবের উৎপত্তি হয়েছে এ্যাবোটাবাদে।

গোড়ায় ঠিক হয়েছিল, অক্টোবরের মাঝামাঝি ডি. ডে. হবে। কিন্তু ওই কথা শুনে আয়ুব তারিখটা এগিয়ে আনার পরিকল্পনা ক'রলেন।

সেপ্টেম্বরে আয়ুব খান চীফ অব জেনারেল স্টাফকে ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করার নির্দেশ দিলেন। আয়ুব খান সেপ্টেম্বর নিজে পরিকল্পনাটা দেখলেন। তারপর তা অনুমোদন ক'রলেন। বিশেষ বিশেষ স্থানে গোপনে সৈন্য মোতায়েন শুরু হ'য়ে গেল। ৭ অক্টোবর ডি. ডে. হবে স্থির হ'লো।

অক্টোবরের ৩ তারিখে চীফ অব জেনারেল স্টাফ করাচির সেনাবাহিনীর ট্র্যানজিট ক্যাম্পে সামরিক প্রশাসকের হেডকোয়ারটার স্থাপন ক'রলেন। মাত্র চারজন জেনারেলের মধ্যেই পরিকল্পনাটা সীমাবদ্ধ রইল।

৭ অক্টোবর বেলা বারোটা ত্রিশ মিনিটে আয়ুব ট্রেনে করাচি গিয়ে পৌঁছলেন। সন্ধ্যে সাতটা থেকেই মেজর জেনারেল মালিক শের বাহাদুর তাঁর এলাকায় সৈন্য মোতায়েন শুরু ক'রলেন।

রাত ন'টায় প্রেসিডেন্ট সামরিক শাসন জারির ঘোষণাপত্রে সই দিলেন। তখন প্রেসিডেন্ট তার মিলিটারি সেক্রেটারির ঘরে বসে। তারপর মির্জা· আয়ুব খানেরই নির্দেশে প্রধানমন্ত্রী খুহ্‌রো এবং ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের চিঠি পাঠালেন।

মির্জা তখন ভেবেছিলেন, আয়ুব তাঁর পক্ষে রয়েছেন। কেননা তিনি আয়ুবের চাকরির মেয়াদ দু'বছর বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মির্জা তখনো জানতে পারলেন না, জেনারেল আয়ুব খান তাঁকেও হটাবার পরিকল্পনা ছকে ফেলেছে।

মির্জা যখন ব্যাপারটা আঁচ ক'রলেন, তখন সবকিছু তাঁর ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে।

১৯ অক্টোবর মির্জা বললেন, দু'মাসের বেশি সামরিক শাসন বহাল রাখার ইচ্ছা তাঁর নেই। মির্জাও আয়ুবকে সরাবার জন্য উদগ্রীব হ'য়ে পড়লেন। কোথায় কোথায় সৈন্য মোতায়েন করা হ'য়েছে জানতে চেষ্টা ক'রলেন মির্জা। তিনি এক সময় এয়ার

কমোডোর রবকে বললেন, আমি আদেশ দিচ্ছি, তুমি গিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া, জেনারেল শের বাহাদুর, জেনারেল হামিদকে গ্রেপ্তার ক'রো।

রব বললেন, 'স্যার, দিন কয়েক একটু সময় লাগবে।' কিন্তু সে গিয়ে তিন জেনারেলকে সব জানাল। তাঁরা ক্ষেপে গিয়ে জেনারেল আয়ুব খানের সঙ্গে দেখা ক'রলেন; মির্জাকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরিয়ে দেবার জন্য আয়ুবকে চাপ দিলেন।

২৭ অক্টোবর আয়ুব তার তিন জেনারেল—আজম খান, বারকি এবং খালিদ শেখকে পাঠালেন মির্জার কাছে। তাঁরা ঘোষণাপত্র এবং পদত্যাগপত্র টাইপ করিয়েই নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনজনে হঠাৎ করে প্রেসিডেন্ট হাউসে ঢুকে পিস্তলের নল উঁচিয়ে কাগজপত্রে সই করিয়ে নিলেন। মির্জা প্রকৃত প্রস্তাবে বন্দী হ'য়ে গেলেন।

পরে অস্ট্রেলিয়ার হাই কমিশনার মেজর জেনারেল কাউথর্নের চেষ্টায় মির্জা ছাড়া পেলেন। কিন্তু একটা সর্তে। তাঁকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে সঙ্গে সঙ্গে। এবং কখনো কোথায়ও এ ব্যাপারে মুখ খুলতে পারবেন না।

মির্জা স্ত্রীকে নিয়ে কোয়েটা হয়ে ইংলণ্ডে চলে গেলেন।

পাকিস্তানের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় শেষ হ'লো।

ক্ষমতায় এসেই আয়ুব কালোবাজারির অভিযোগে গ্রেপ্তার ক'রলেন প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মহম্মদ আয়ুব খুহ্রোকে। পক্ষপাতিত্ব, দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে গ্রেপ্তার ক'রলেন দুই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হোসের শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী, ফিরোজ খান নূন এবং দৌলতানা, কায়ুম খান প্রমুখ একসময়কার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে। অসৎ উপায়ে সম্পত্তি করার অভিযোগে ১২ অক্টোবর ঢাকায় গ্রেপ্তার হ'লেন হামিদুল হক চৌধুরী, আবুল মনসুর আহমদ, আবদুল খালেক, শেখ মুজিবুর রহমান। এঁরা সকলেই একসময় কেন্দ্রে অথবা পূর্ববাঙলায় মন্ত্রী ছিলেন। আসগর আলী শাহ্ (শিল্প-উন্নয়ন কর্পোরেশন), আমিনুল চৌধুরী (বাণিজ্য-দফতরের আণ্ডার সেক্রেটারি), এম. এ. জাব্বার (সড়ক এবং পূর্ত বিভাগের প্রধান ইঞ্জিনীয়ার) প্রমুখও দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হ'লেন। দেশরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হ'লেন মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আবদুল গাফ্ফার খান, খান আবদুস সামাদ খান, জি. এম. সৈয়দ প্রমুখ। এঁদের বিরুদ্ধে আয়ুব দুর্নীতির অভিযোগ আনতে সাহসী হ'লেন না। এই সব জাতীয় নেতাদের সততা এবং নিষ্ঠা সম্পর্কে দেশের লোকের মনে যে অগাধ শ্রদ্ধা আয়ুব সেটা জানতেন। তাই তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ ক'রলেন দেশরক্ষা আইন। যাতে তাঁর সদিচ্ছায় কারু সন্দেহ না জাগে তাঁর জন্যে আয়ুব শুধু সত্তর জনের মতো রাজনৈতিক নেতাকেই গ্রেপ্তার ক'রলেন না, প্রচুর কালোবাজারি এবং দুর্নীতিপরায়ণ সরকারি কর্মচারিকেও জেলে পুরলেন। এক ঢিলে দুই পাখি মারার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন আয়ুব।

ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক নেতাদের খেয়োখেয়িতে লোক হতাশ হ'য়ে পড়েছিল। তাই আয়ুবের এই কাজকে সাধারণ মানুষ সমর্থন জানাল। জনসাধারণের মনে নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশ্বাস জাগালেন তিনি এবং সেই সঙ্গে নামী নামী নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার ক'রে নিজের পথের কাঁটা সরিয়ে রাখলেন। সোনার আন্তর্জাতিক কালোবাজারি কাসিম ভাট্টি এবং আবদুল্লাহ ভাট্টিকে গ্রেপ্তার ক'রে আয়ুব সারা পাকিস্তানে সাড়া জাগিয়ে ফেলেন। এক মাসের মধ্যে করাচির কাস্‌টমস্‌ অফিসাররা দু'কোটি টাকার চোরাই সোনা উদ্ধার ক'রলেন করাচি বন্দরের কাছে, আরবসাগরের নিচ থেকে। বিদেশের ব্যাঙ্কে অথবা নিজের কাছে যার যা বৈদেশিক মুদ্রা ছিল তা জানানোর আদেশ দিলেন আয়ুব। ফলে চার কোটি আট লক্ষ টাকার হদিস পাওয়া গেল দেশেই। বিদেশের ব্যাঙ্কে রাখা চার কোটি ২০ লক্ষ টাকার সন্ধান মিলল। আর নতুন করে আয়করের হিসাব দাখিল ক'রতে বলায় সরকারের আয় হ'লো একশ চৌত্রিশ কোটি টাকা। আয়ুব এসব ক'রে প্রাথমিক অবস্থায় নিঃসন্দেহে জনগণের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে একটা উচ্চ ধারণা গড়ে তুলে ছিলেন।

জায়গীরদারি প্রথা বিলোপ ক'রলেন আয়ুব। ব্যক্তিগত জমির পরিমাণ নির্ধারিত ক'রে দিলেন। শিল্পোন্নয়নে মনোযোগ দিলেন। তিন বছরের মধ্যে শিল্প-উৎপাদন দ্বিগুণ হ'লো। জামাতে ইসলাম, জমিয়তে-ই-উলেমা প্রভৃতি দলগুলোর প্রভাব ক্ষুণ্ণ করার জন্য আয়ুব মসজিদে মসজিদে মাইনে করা ইমাম এবং মৌলভী রাখলেন। পরিবার-পরিকল্পনার সময় এই সব মৌলভীরা অনেক কাজে এসেছিলেন।

আয়ুব রাজনৈতিক নেতাদের অবরুদ্ধ ক'রেই ক্ষান্ত হ'লেন না। তিনি সংবাদপত্রের ওপর নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ ক'রলেন।

'পাকিস্তান টাইমস', 'চাত্তন', 'ইত্তেফাক' প্রভৃতি পত্রিকা অকেজো ক'রে রাখলেন।

৯ জুন আয়ুব সামরিক আইন তুলে নিয়ে নতুন শাসনতন্ত্র চালু ক'রলেন। ওই শাসনতন্ত্রে পার্লামেণ্টারি শাসনব্যবস্থার ঠাঁই হ'ল না।

একটা নতুন প্রথা চালু ক'রলেন তিনি। নাম দিলেন বুনিয়াদী গণতন্ত্র (Basic Democracy)। এতে এক হাজার থেকে বারোশ লোক একজন প্রতিনিধি নির্বাচন ক'রতেন। তারা বুনিয়াদী গণতন্ত্রী নামে পরিচিত। সারা পাকিস্তানে এমনি আশি হাজার বুনিয়াদী গণতন্ত্রী ছিল। এরা প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন ক'রতেন। '৬২ সালে এক অভূতপূর্ব উপায়ে আয়ুব প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হ'লেন। ব্যালটে লেখা ছিল আয়ুব খানকে প্রেসিডেণ্ট ক'রতে চান কি না? হ্যাঁ অথবা না-এর ঘরে দাগ দিন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ ছিলেন না। ক্যাবিনেট-মন্ত্রী নির্বাচনের ক্ষমতাও ছিল তাঁরই। তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপরই তাঁদের মন্ত্রিত্বের চাকুরি নির্ভর ক'রত।

'৫৯ সালে এবডো (Elective Bodies Disqualification Order) জারি ক'রে বেশির ভাগ খ্যাতনামা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নির্বাচনে যোগ দিতে দেননি।

কিন্তু তিন বছর বাদেই, নির্বাচনের সময়ে তিনি রাজনৈতিক দলের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। চৌধুরী খালেকুজ্জমানের সহায়তায় মুসলিমলীগের একাংশকে দিয়ে তিনি কনভেনশনপন্থী মুসলিমলীগ গঠন করলেন। আয়ুব নিজে হ'লেন তার প্রেসিডেণ্ট। মুসলিম-লীগের অপর অংশের নাম হ'লো কাউন্সিল মুসলিমলীগ।

আয়ুব যে-সব সহকর্মীদের সহায়তায় ক্ষমতায় আসেন, ক্রমে ক্রমে তাদেরও হটালেন ক্ষমতা থেকে। গোড়ায় মন্ত্রী ক'রে তাঁদের

সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করালেন, তারপর জেনারেল শেখকে দূত ক'রে পাঠিয়ে দিলেন দেশের বাইরে। আজম খানকে পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর ক'রে পাঠালেন।

'৬২ সালে আজম খান যখন পূর্ববঙ্গের গভর্নর, তখন ঢাকায় শিক্ষাকমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে প্রচণ্ড ছাত্র-বিক্ষোভ দেখা দেয়। সেবারকার আন্দোলনের অন্যতম ছাত্রনেতা ছিলেন রাশেদ খান মেনন। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন মঞ্জুর কাদের আয়ুবের হ'য়ে ফোঁপর দালালি করতে। ছেলেরা নাকাল ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে। কার্জন হলের সামনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুল কাদের চৌধুরীর গাড়ি পুড়িয়ে দিল ছেলেরা।

এ-আন্দোলন তো শুধু ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছিল কুমিল্লা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ময়মনসিং, বরিশাল, কুষ্টিয়া—সারা পূর্বপাকিস্তানে।

মধুর ক্যানটিনে বসে 'ডাকসুর' ছেলেরা ঠিক ক'রলো তা ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষাদিবস পালন করা হবে। পূর্ববাঙলার ইতিহাসে শহীদের রক্তে ঝরা আর একটি দিনের সূচনা হলো।

আয়ুব তখন ঢাকায়। তাঁরই সামনে তাঁর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হ'লো। ক্ষিপ্ত হ'য়ে আয়ুব ছাত্রদের ওপর গুলি চালাতে বললেন, সেনাবাহিনী তলব ক'রতে বললেন আজমকে। কিন্তু নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করলেন তিনি। বরং ছাত্রদের ন্যায্য দাবি স্বীকার করে নিতে বললেন আজম। আয়ুব পিণ্ডি ফিরে গিয়েই আজম খানকে পূর্ববাঙলার গভর্নরের পদ থেকে সরিয়ে নিলেন। তাঁর বিদায় সংবর্ধনায় লক্ষ লক্ষ লোক চোখের জল ফেলেছিল। এর আগে আর কোনো গভর্নরের জন্য পূর্ববাঙলার মানুষ এমন ক'রে কাঁদেনি। কেন কেঁদেছিল মানুষ সেদিন? কারণ, অবাঙালী হ'য়েও আজম যে তাঁদের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং আত্মীয় হ'য়ে গিয়েছিলেন।

রক্ত-ঝরা দিনের সূচনা হয়েছিল সেপ্টেম্বরে। পরিষদীয় গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার এবং রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়া প্রভৃতি স্থানে প্রচণ্ড ছাত্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। হাজার হাজার ছাত্রকে নিয়ে আয়ুব জেলে আটক করেন।

২৪ সেপ্টেম্বর সোহ্‌রাওয়ার্দী একটি বিবৃতি দিলেন। বললেন, গণতন্ত্র ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত জনসাধারণ শান্ত হবে না। সোহ্‌রাওয়ার্দীকে সামরিক শাসন জারির সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ১৯৬০ সালের ১৬ মে বিশেষ ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যানের কাছে তিনি তাঁর মুক্তি-ভিক্ষা জানিয়ে বলেন, আমি একজন নগণ্য মানুষ। যেসব বিধিনিষেধ জারি করা হ'য়েছে, আমার তা লঙ্ঘন করার ইচ্ছে নেই। আমি রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ এড়িয়ে চলব। নেহাত যদি দেখা ক'রতেই হয় আমি তাদের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে কোনো আলোচনা করব না প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। সোহ্‌রওয়ার্দী মুক্তি পেলেন। ওই একই উপায়ে খত লিখে মুক্তি পেলেন মুস্তাক আহমদ গুরমানি। কায়ুম খানের তিন বছরের জেল হ'য়েছিল।

সামরিকশাসন জারি হওয়ার পর স্বাধিকারের দাবি প্রথম তুলেছিল বালুচ আর পাঠানরা। আয়ুবের সৈন্যরা বোমা ফেলে, মেসিনগানের গুলি ছুড়ে হাজার হাজার নিরীহ বালুচ আর পাঠানকে হত্যা ক'রেছে। হাজার হাজার যুবককে ধরে এনে নৃশংসভাবে নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছে। কারু চোখ উপড়ে নিয়েছে, কারুর বা মাথা গরমজলে ডুবিয়ে হত্যা ক'রেছে। বিংশশতাব্দীতে আয়ুবের টর্চার-চেম্বারের তুলনা বড়ো বেশি নেই। আয়ুব সাময়িকভাবে তাদের দমালেও তাদের হৃদয়ের দাবিকে দমিয়ে রাখতে পারবেন না চিরদিন।

পূর্ববাঙলার কোটি কোটি মানুষের হৃদয়স্পর্শ ক'রেছিল তাদের আত্মত্যাগ আর নিষ্ঠা।

পঁয়ষট্টির জানুয়ারির ২ তারিখে আয়ুব মিস ফাতিমা জিন্নাহ্‌কে হারিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হ'লেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলই মিস ফাতিমা জিন্নাহ্‌কে সমর্থন ক'রলেন। আয়ুব কোটি কোটি টাকা ছড়িয়ে সরকারি প্রশাসনকে পুরোপুরি ব্যবহার ক'রেও অনেক ভোটের ব্যবধানে জিততে পারেন নি। পূর্বপাকিস্তানে আয়ুব পেয়েছিলেন ২১০১২টি আর মিস জিন্নাহ্‌ পেয়েছিলেন ১৮৪৩৪টি ভোট।

পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের ঘনিষ্টতা হয় '৬৪ সালে। চৌ এন লাই এবং অন্যান্য চীনা নেতারা পাকিস্তান পরিদর্শনে যান। চৌ এন লাই এবং আয়ুবের একটি যুক্ত বিবৃতি বের হ'লো সেইসময়ঃ কাশ্মীরী জনগণের ইচ্ছা অনুসারেই কাশ্মীর সমস্যার ফয়সালা হবে। কিন্তু দিন দিন চীনের সঙ্গে মিতালি গড়ে তোলায় আমেরিকা ক্ষুব্ধ হ'লো।

এপ্রিলে পাকিস্তান কচ্ছের রান অঞ্চলে সামরিক অভিযান শুরু করে। এই অভিযান পরিচালনা করেন টিক্কাখান। ২০ জুন একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি হ'লো। চুক্তির মূলকথা এই: একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল এই সমস্যার মীমাংসা করবে। এবং দুই পক্ষকেই ট্রাইবুনালের সালিশী মেনে নিতে হবে।

এই চুক্তির পিছনে পাকিস্তানের একটি বড়ো রকমের উদ্দেশ্য ছিল, আর-একটি বড়ো রকমের আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতির জন্য সময় নেওয়া।

ওই বছরই ১ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ছাম্ব্‌ এলাকায় সীমানা অতিক্রম ক'রে ভারতীয় এলাকায় ঢুকে পড়ল। যুদ্ধের চাপ হ্রাস করার জন্য ভারত পাঞ্জাব বর্ডার দিয়ে লাহোরের দিকে যাত্রা শুরু ক'রল। শিয়াকোট সেকটরে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন

জেনারেল ইয়াহিয়া খান। রুশ-সরকারের সহায়তায় যুদ্ধের অবসান ঘটল ১১ জানুয়ারি তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে।

ভুট্টোর সঙ্গে আয়ুবের অন্তর্বিরোধ শুরু হ'য়ে গেল ইতিমধ্যে। ভুট্টোও আয়ুবের ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন। আয়ুবই ভুট্টোকে তার ক্যাবিনেট মন্ত্রী ক'রে এনেছিলেন। তার আগে ভুট্টোর কোনো রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছিল না। ভুট্টো তাসখন্দ-চুক্তির সমালোচনা ক'রে চীনের প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠলেন দ্রুত। শেষটায় না পেরে, আয়ুব ভুট্টোকে সরিয়ে দিলেন তাঁর ক্যাবিনেট থেকে। ভুট্টোর বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং আরও নানা অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হ'লো সরকারপক্ষ থেকে।

এই চার বছর বিরোধী দলগুলো আন্দোলনে আন্দোলনে মিছিলে মিছিলে আয়ুবকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলল। খাইবার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ক্রমশ বিক্ষোভের আগুন ধূমায়িত হ'য়ে উঠতে থাকল।

মে-জুন মাসে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর এবং যশোরে প্রচণ্ড আয়ুব-বিরোধী আন্দোলন শুরু হ'লো। আওয়ামী-লীগ তাদের ছয়-দফা আন্দোলন শুরু ক'রল। বিক্ষুব্ধ জনতা ফরিদপুর, নারায়ণগঞ্জ, এবং যশোরে থানা, জেল এবং সরকারি অফিস ভাঙচুর করতে শুরু ক'রল। সেনাবাহিনী তলব করা হ'লো।

ওই বছরই নভেম্বর মাসে লনডনের ডেইলি টেলিগ্রাফে একটি চাঞ্চল্যকর খবর বেরুল। তাদের বিশেষ প্রতিনিধি করাচি থেকে খবরটা পাঠিয়েছে। খবরটা এই: পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ইতিমধ্যেই আয়ুববিরোধী একট গোষ্ঠী মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। কালাবাগের নবাব তাদের নেতা। তারা কালাবাগের নবাব আগে পশ্চিমপাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন। আয়ুব তাকে বরখাস্ত ক'রেছেন।

হঠাৎ করে আক্রমণ ক'রে আয়ুবের কাছে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র ক'রছিল তাঁরা। চীনের সঙ্গে মিতালি, ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে নাস্তানাবুদ হওয়া, গণ-বিক্ষোভ দমাতে ক্রমাগত সেনাবাহিনী তলব করা এবং অয়ুবের দুর্নীতি প্রশয় দেবার ব্যাপারে সেনাবাহিনীর একাংশ ক্রমে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছিল। তারাই এই ষড়যন্ত্র করছিল। খবর পেয়ে আয়ুব ১১জন জেনারেল এবং ২৯ জন কর্নেলকে সেনা-বাহিনী থেকে অযোগ্যতার অভিযোগে বরখাস্ত ক'রলেন।

বখতিয়ার রানার কাজ থেকেও আয়ুবের ভয় ছিল। তাই আয়ুব-সিনিওর হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ডিঙিয়ে জেনারেল মুসা খানকে কমাণ্ডার-ইন-চীফ নিযুক্ত ক'রেন।

এই সময় আয়ুব এবং তাঁর দুই পুত্র গওহর এবং আক্তার আয়ুব সম্পর্কে নানান কেচ্ছা বেরুতে থাকে পত্র-পত্রিকাগুলোতে।

পশ্চিমপাকিস্তানের একজন প্রাক্তন মন্ত্রীর ভাই এবং লাহোরে একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি সৈয়দ আলী নওয়াজ গারদেজী কোয়েটার কমিশনার কর্নেল মহম্মদ ইউসুফের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগটি এই, আয়ুবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কর্নেল ইউসুফ তাঁর সুন্দরী জার্মান স্ত্রী ক্রিশ্চিয়ানা রেন্নেট্রিকে বলপূর্বক হরণ করে নিয়ে গেছে। সব জেনেশুনেও আয়ুব তার কোনো প্রতিকার করেন নি। পরে আরও খবর বেরয়, রেনেট্রিকে জেনারেল বখতিয়ার রানার সরকারি বাসস্থানে আটক রাখা হ'য়েছিল।

আয়ুবের নামেও সারা বিশ্বের কাগজে খবর বেরয়, লনডনে আয়ুব ক্রিশ্চিয়ানা কিলারের সঙ্গে অশালীন অবস্থায় সাঁতার কেটেছেম।

আয়ুবের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে গান্ধারা ইনডাসট্রিজ প্রতিষ্ঠার জন্য স্টেটব্যাঙ্ক থেকে জামিন ছাড়াই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ৮০ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হ'লো। সাত দিনের মধ্যেই মহৎ আয়ুব তাঁর

শ্বশুর মেজর জেনারেল হাবিবুর রহমানের সহায়তায় এক ডজন দেশি-বিদেশী কোম্পানীর মালিক হ'য়ে গেলেন। শোনা যায়, আয়ুবের পতন আশঙ্কা ক'রে গওহর আয়ুব সুইজারল্যাণ্ডে এবং ইটালিতে প্রচুর টাকা পাচার করেছিলেন।

রাওয়ালপিণ্ডির মিসেস শামিম আক্তার খানপুর পুলিশের কাছে এক অভিযোগ দায়ের করেন যে, আয়ুবের দ্বিতীয় পুত্র ক্যাপ্টেন আক্তার আয়ুব জাল দলিলের সাহায্যে তাঁর একশ একর জমি নিজের নামে লিখিয়ে দখল করে নিয়েছে। জাল দলিলের সাহায্যে অনাথা-অসহায় মহিলাদের সম্পত্তি গ্রাস করার ব্যাপারে আয়ুবের দুই জামাতা নাজিব এবং ইয়াকুব ছিল আরও এক কাঠি বাড়া। তাঁরা যে কতো অনাথাকে পথের ভিখিরি ক'রেছেন, তার ইয়ত্তা নেই।

গোড়ায় কালোবাজারিদের গ্রেপ্তার ক'রে আয়ুব জনসাধারণের মনে যে আস্থা এবং শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়েছিলেন তা বিনষ্ট হ'য়ে গেল এইসব দুর্নীতির খবর শুনে শুনে। দেশকে দুর্নীতি-মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তখন নিজেই দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন আয়ুব। তাজ্জব ব্যাপার!

যে মাসে আওয়ামী লীগ, জামাত-ই-ইসলামী, কাউন্সিল মুসলিমলীগ, ন্যাশন্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি মিলে আট-দফা দাবির ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গঠন করলেন। আয়ুবের বিরুদ্ধে তারা গণ-আন্দোলন গড়ে তুললেন ক্রমশ।

গফ্ফার খানের পুত্র খান ওয়ালি খান ঘোষণা ক'রলেন, স্বাধীন পাকতুনিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি শিগগীরই ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলবেন। সিন্ধুর ন্যাপ নেতারাও তাই বললেন। তারা সিন্ধুর কবি-সাহিত্যিকদের 'জয় সিন্ধু' আন্দোলনকে পুরোপুরি সমর্থন জানালেন। অক্টোবর-নভেম্বরের দিকে বেলুচি-

স্তানের উপজাতী এলাকায় বিদ্রোহ দেখা দিল। আয়ুব হাজার পাঁচেক সৈন্য পাঠালেন তাদের দমাতে। সৈন্যরা নির্বিচার বোমা ও গুলি বর্ষণ ক'রে প্রচুর নিরীহ এবং নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে বিদ্রোহ দমালেন। যুদ্ধে অনেক পাকিস্তানী সৈন্যও মারা গিয়েছিল।

৯ ডিসেম্বর থেকেই দেশরক্ষা আইনে পূর্ব-পাকিস্তানের অনেককে গ্রেপ্তার করা শুরু হ'লো।

৬ জানুয়ারি খবর বেরুল, পাকিস্তান ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের ফার্স্ট সেকরেটারি শ্রীপরেশনাথ ওঝাকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তান ছেড়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছে। শ্রীওঝার বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের অভিযোগ, তিনি পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কিছু পাকিস্তানীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। অভিযোগ, ওঝার যোগসাজসে আওয়ামীলীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান নৌবাহিনীর কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার এবং কয়েকজন সি. এস. পি. অফিসারের সঙ্গে যোগসাজসে পূর্ব-পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র ক'রছিলেন। এমন কি শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিনিধি হিসাবে আওয়ামী-লীগের চট্টগ্রাম সিটি শাখার কোষাধ্যক্ষ মাণিক চৌধুরী অস্ত্র লাভের জন্য কিছুদিন আগে আগরতলায় গিয়ে ভারতীয় সামরিক অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা পর্যন্ত ক'রেছেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে সরকারিভাবে অভিযোগ দায়ের করা হ'লো ১৮ জানুয়ারি। এই ব্যাপারে ২৮ জন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হ'লো।

পূর্ববাঙলার স্বায়ত্তশাসন বানচাল করার জন্য, শেখ মুজিবকে হেয় করার জন্য আয়ুব এই ষড়যন্ত্র মামলার পরিকল্পনা ছকে

ছিলেন। কিন্তু ফল হ'লো উল্টো। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' জনপ্রিয়তার তুঙ্গে তুলে দিল শেখ মুজিবকে। স্বায়ত্তশাসন এবং সেই সঙ্গে শেখ মুজিব এবং অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে পূর্ববঙ্গে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠতে থাকল।

পাখতুন এবং বেলুচরা ছাড়া সারা পশ্চিমপাকিস্তানের লোক ছিল এতদিন ঘুমিয়ে। আজ জেগে উঠেছে। দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত ক্ষোভ আর ঘৃণা নিয়ে পশ্চিমপাকিস্তানের ছাত্রসমাজ আজ ঝাঁপিয়ে পড়েছে আন্দোলনে। করাচি থেকে খাইবার সারা দেশের মানুষ আজ জেগে উঠেছে রুদ্ধ আক্রোশে। আয়ুবের নির্যাতনই তাদের ক্ষিপ্ত ক'রে তুলেছে, ঠেলে দিয়েছে আন্দোলনের পথে।

নভেম্বরের গোড়ায় লাণ্ডিকোটাল থেকে ফিরে আসার পথে একদল ছাত্রকে পেশোয়ার পুলিশ অযথা নির্যাতন করে, মালপত্র কেড়ে নেয়। তারই প্রতিবাদে ৭ নভেম্বর পিণ্ডির গর্ডন কলেজের ছাত্ররা এক সভায় নিন্দা করে পুলিশী জুলুমের। তারপর সেখান থেকেই একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি যাচ্ছিল হোটেল ইণ্টার কন্টিনেন্টালে, পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জেড. এ. ভুট্টোকে সংবর্ধনা জানাতে। কোনো অন্যায় করে নি। তবু সেই ছাত্র মিছিলে চলল পুলিশের লাঠিচার্জ আর কাঁদানে গ্যাস ছোড়া। পুলিশের নির্যাতন কিন্তু ওখানেই শেষ হয় নি। নিরীহ ছাত্রদের ওপর গুলি পর্যন্ত চালাল পুলিশ নির্বিচারে। স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছিল পলিটেকনিক ইনষ্টিট্যুটের সতের বছরের ছাত্র আব্দুল হামিদ। কিন্তু মাঝপথেই নীরব হ'য়ে গেল তার কণ্ঠ। পুলিশের বুলেট তার পাঁজর ভেদ ক'রে চলে গেল। ফিনকি দিয়ে ছুটল লাল রক্ত। হামিদের তাজা রক্তে পিণ্ডির পথ রঞ্জিত হ'লো।

আর করাচিতে ছাত্ররা দাবি জানিয়েছিল ছাত্রদের বেতন কমানোর, কালাকানুন বাতিলের। আয়ুবের পুলিশ রেহাই দেয়

নি তাদেরও। পুলিশের কাঁদানে গ্যাস ছোড়া আর লাঠি চালনার ব্যতিক্রম হয় নি সেখানেও। আন্দোলন দমাতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ক'রে দিয়েছে পিণ্ডি আর করাচির সমস্ত স্কুল-কলেজ। কিন্তু আন্দোলন বন্ধ হয় নি। করাচি-পিণ্ডির সীমানা ছাড়িয়ে সে আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে তখন লাহোর, পাঞ্জাব, মুলতান—পশ্চিমপাকিস্তানের সর্বত্র। পুলিশে কুলোয় নি, পিণ্ডিতে শেষে তলব ক'রতে হ'য়েছে সেনাবাহিনী। কার্ফু জারি ক'রতে হ'য়েছে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। সকালবেলায়ই শাহারা-ই-পাহলভীতে ছাত্রমিছিলে লাঠি আর বেঅনেট চার্জ ক'রেছে পুলিশ, ছুড়েছে টিয়ারগ্যাস, বুলেট। শাবিস্তান সিনেমা হলের সামনে ছাত্র আর পুলিশের ছোটোখাটো একটা লড়াই হ'য়ে গিয়েছিল। জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের পিণ্ডির নেতা মমতাজ মেঘরী আর আবদুল হাই বালুচকে গ্রেপ্তার ক'রল পুলিশ। গ্রেপ্তার ক'রল শ্রমিকনেতা রানা আজাহার আলী খান আর মোহম্মদ ইয়াহিয়াকে। ট্রাক বোঝাই করে গারদে নিয়ে পুরেছে আরও ১২০ জনকে।

কাজমীর ডাকে করাচির ছাত্রছাত্রীরাও সেদিন স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত ক'রে তুলেছিল করাচির রাজপথ। বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্রমিছিল যখন নাজিমাবাদ আর বার্নস রোডে এসে পৌঁছল, পুলিশ আর মিলিটারি মুহূর্তে ঘিরে ফেলল ছাত্রদের। তারপর চলল এলোপাথাড়ি লাঠিচার্জ। গুলিও ছুড়ল পুলিশ। বুলেটের আঘাতে লুটিয়ে পড়ল দু'জন। পিণ্ডির মতো করাচির রাজপথও শহীদের রক্তে পবিত্র হ'লো। বেঅনেট আর লাঠির আঘাতে স্কুলের কচি কচি ছেলেরা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তবু রেহাই নেই। টেনে হিঁচড়ে নিয়ে তুলল তাদের প্রিজনভ্যানে। ৬০ জনের মতো ছাত্রকে গ্রেপ্তার ক'রল পুলিশ। ধরে নিয়ে গেল জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি ডি. খান, জিন্নাহ্

কলেজের ছাত্রসংসদের প্রাক্তন সভাপতি মোহম্মদ ফয়জুল্লাহ, আর ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি কাজমীকে।

ক্রমে ক্রমে নওসেরা, লায়ালপুর, শিয়ালকোট—সারা পশ্চিম-পাকিস্তানের ছাত্র আর জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এতো দুর্বার হ'য়ে উঠল যে, আয়ুবের কায়েমী সিংহাসন টলে উঠল। আন্দোলন বানচাল করার জন্য চাতুরির আশ্রয় নিতে হ'লো তাঁকে। ১০ নভেম্বর পেশোয়ারের এক জনসভা থেকে আয়ুবকে হত্যা করার অভিযোগে হাশেদ খান নামে এক পাঠানযুবককে গ্রেপ্তার করা হ'লো। এটা যে সাজানো ঘটনা, আন্দোলন দমানোর জন্য একটা চাল মাত্র, এ-কথা বুঝতে আর কারু বাকি রইল না। না হ'লে পর পর দুবার গুলি ছুড়েও আততায়ী সামান্য আঁচড়টুকু পর্যন্ত লাগাতে পারল না আয়ুবের গায়, এ হেন অভিনয়ে আর যারাই ভুলুক ছাত্রদের প্রতারিত করা যায় নি। আয়ুব বোধ হয় জানেন না যে, ছাত্রদের বুলেট ফসকায় না, লক্ষ্য ভেদ করে ঠিক ঠিক. একতাই তাদের বুলেট। বুলেটের হাত থেকে বাঁচলেও আমাদের দুর্বার আন্দোলনের তোড় থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবেন কি আয়ুব।

প্রচণ্ড গণ-আন্দোলনের তোড়ে দিশেহারা হ'য়ে আয়ুব আর মুসা নির্বিচারে গ্রেপ্তার ক'রে চললেন ছাত্র আর রাজনৈতিক নেতাদের। ভুট্টো, গফ্‌ফার খানের ছেলে ওয়ালী খান এবং আরো অনেক নেতাকে নিয়ে পুরলেন হাজতে। ব্যাপক ধরপাকড় চলল, তখনো চলল গুলি। করাচি পিণ্ডিতেই নয়, এবার নওশেরায়ও ছাত্র মিছিলের ওপর গুলি চালাল পুলিশ। ছাত্রনেতা জহির নকৃভী শহীদ হ'লো। কিন্তু কয়জন আবদুল হামিদ আর জহির নকৃভীকে ওরা মারবে? আয়ুব তখনো জানতে পারলেন যে, শহীদের প্রতিটি রক্তবিন্দু থেকে অলক্ষে তৈরি হ'চ্ছে লক্ষ লক্ষ নির্ভীক আবদুল হামিদ আর জহির নকৃভী। মেয়েরাও সেই সময় বোরখা খুলে

বেরিয়ে এসেছে পথে। বেরিয়ে এসেছিল আইনজীবি, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, কেরানী সবাই।

আন্দোলন যতই দিন দিন তীব্র হ'য়ে উঠছিল আয়ুবের নগ্ন বর্বর রূপ ততই স্পষ্ট হ'য়ে উঠছিল। কখনো শোনা যায় নি যে, কোনো সভ্যদেশে ছাত্রদের উলঙ্গ ক'রে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যায় আগে পিছে বেঅনেট উঁচিয়ে। পেশোয়ারে তাই হ'য়েছিল সদর রোড দিয়ে শ'য়ে শ'য়ে স্কুল-কলেজের ছেলেকে ন্যাংটো ক'রে প্যারেড করিয়ে নিয়ে গেছে আয়ুবের বর্বর সৈন্য আর পুলিশেরা। অত্যাচারীর সঙ্গে এর পরেও কোনো আপোস চলে! বিক্ষোভের যে-আগুন ধিকি ধিকি ক'রে জ্বলতে সুরু ক'রেছিল আজ তা দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে উঠেছে শেষে।

যে-পূর্ববাঙলা গণ-আন্দোলনের পথিকৃৎ, পূর্ববাঙলার যে-ছাত্ররা সারা দেশের নমস্য তারা কিন্তু তখনো ছিল নীরব।

কয়েক দিনের মধ্যেই ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি জেগে উঠল। ঢাকার ছাত্ররা নভেম্বরের ২০ তারিখের দিকে দুর্জয় শপথ নিল: অত্যাচারী আয়ুবের বিরুদ্ধে চালাতে হবে দুর্বার লড়াই। পশ্চিম পাকিস্তানী ছাত্র ভাইদের ওপর নৃশংস নির্যাতন আর হত্যার তাণ্ডব শুরু ক'রেছেন আয়ুব তার প্রতিবাদ জানাতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কালাকানুন বাতিল, অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা আর স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য চালাতে হবে আন্দোলন, আন্দোলন চালাতে হবে— শেখ মুজিব, মতিয়া চৌধুরী এবং রাশেদ খান মেনন, মনি সিং আবদুল হালিম এবং অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য।

২৪ নভেম্বর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি দাবি-দিবসের ডাক দিল। কাতারে কাতারে মানুষ এসে জমায়েত হলো বায়তুল মোকারমের সামনে। একটার পর একটা গণ-মিছিল এসে মিলছে বায়তুল মোকারমের সামনেকার জনসমুদ্রে মিলছে। হাতে তাদের ফেস্টুন,

মুখে স্লোগান: 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই' 'প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার দিতে হবে', পূর্ণস্বায়ত্তশাসন দিতে হবে, পশ্চিমপাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল কর; 'জরুরি অবস্থা বাতিল কর,' রাজনৈতিক 'মামলা তুলে নিতে হবে, 'দ্রব্যমূল্য হ্রাস কর' অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে হবে।"

রুশপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি অধ্যাপক মুজাফর আহমদ ওই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন। কয়েক মাস আগে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। মওলানা ভাসানীর দল চীনপন্থী বলে পরিচিত হ'লো।

১৩ ডিসেম্বরে নারায়ণগঞ্জের আদমজীনগরের সামনে শ্রমিক মিছিলের ওপর পুলিশ লাঠি চালাল, টিয়ারগ্যাস ছুড়ল। সেদিন বায়তুল মোকারমের সামনে জনসভা ছিল। দুপুরে সরকারি কর্তৃপক্ষ শহরে শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি ক'রলেন। কিন্তু তিনটে বাজতে-না-বাজতেই একশ চুয়াল্লিশ ধারা অমান্য ক'রে হাজারে হাজারে মানুষ এসে জমতে শুরু ক'রল বায়তুল মোকারমের সামনে। চারটের দিকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আসতে শুরু ক'রলেন। এয়ার মার্শাল আসগর খান আসতেই জনতা জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মুখরিত ক'রে তুলল বায়তুল মোকারম। পুলিশ হঠাৎ জনতার ওপর লাঠি চার্জ শুরু ক'রল। 'রায়টকার' থেকে হোসপাইপ দিয়ে লালজল ছিটাতে শুরু ক'রল। সেইসঙ্গে চলল ধরপাকড়। আসগর খানের পি. একেও গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

সেদিন চট্টগ্রামের ফৌজদার হাট, আগ্রাবাদ এবং পাহাড়তলিতে বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর গুলি ছুড়ল পুলিশ। তাতে ২৭ জন আহত হ'লো। ময়মনসিং, যশোর, দিনাজপুর, ঝিনাইদহ, কুমিল্লা, কুষ্টিয়া চৌমুহনীতে জনতার মিছিলে হয় লাঠি চার্জ, না হয় গুলি চলেছে। সারা পূর্ববাঙলায় একদিনেই ৭০৩ জনের মতো গ্রেপ্তার হ'লো।

জানুয়ারিতে অবস্থার আরও অবনতি হ'লো। আয়ুব বিরোধী গণ-আন্দোলন আরও দুর্বার হ'য়ে উঠল আটটি বিরোধী দলের জোট বাধায়।

করাচিতে আয়ুব-তনয় গওহর আয়ুবের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু জনতার ওপর গুলি ছুড়ল। ক্ষিপ্ত জনতা বাড়ি ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। আগুনে ৩০০ বাড়ি এবং ৫০০ দোকান পুড়ে গেল। করাচির লিয়াকতবাদ, নিজামাবাদ, গোলিমার প্রভৃতি এলাকায় সেনা-বাহিনীকে তলব ক'রলেন বেসামরিক কর্তৃপক্ষ। পেশোয়ার এবং রাওয়ালপিণ্ডিতে জোর বিক্ষোভ চলল। এদিকে সারা পূর্ববাঙলা তখন বিক্ষোভে বিক্ষোভে বিধ্বস্ত। বেসামরিক প্রশাসন ভেঙে পড়েছে। হতাহতের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে।

১ ফেবরুয়ারি।

আয়ুব সমস্যা সমাধানের জন্য বিরোধী দলগুলোর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাইলেন। ন্যাপ এই আমন্ত্রণ বাতিল ক'রে দিয়ে বলল, 'জনসাধারণের দাবির প্রশ্নে আলোচনার কোনো অবকাশ নেই।'

অন্যান্য নেতারা শেখ মুজিব, ভুট্টো, ওয়ালিখান, আবদুস সামাদ, জি. এম. সৈয়দ প্রমুখ নেতা এবং সব অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তি না দেওয়া আয়ুবের গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে অস্বীকার ক'রলেন।

আয়ুব তাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার ক'রতে বাধ্য হ'লেন। তুলে নিলেন 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। মুক্তি দিলেন শেখ মুজিবকে। মুক্তি দিলেন অন্যান্য নেতা এবং রাজবন্দীদের।

শুধু গণ-আন্দোলনই নয়। সেনাবাহিনীর ভিতর থেকেই আয়ুবের ওপর চাপ আসছিল। তাই এই নতি স্বীকার। সেনাবাহিনীর কয়েকজন জেনারেল আয়ুবকে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন যে, সৈন্যরা

বার বার গণবিক্ষোভ দমানোর জন্য যেতে পারবেন না। জেনারেলদের চাপে শেষ পর্যন্ত তিনি ঘোষণা ক'রতে বাধ্য হ'লেন যে, তিনি আর ফের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রবেন না। গণবিক্ষোভ দমাতে গিয়ে আয়ুব যদি আবার সামরিকশাসন জারি করতে যান, জেনারেলরা তার সহায়তা ক'রবেন না বলেও জানিয়ে দিলেন। খবরটা দিয়েছিলেন, ওয়াশিংটন পোস্টের সংবাদদাতা সেলিগ এস. হ্যারিসনের। আয়ুবের ওই ঘোষণার আগের দিন কমাণ্ডার-ইন-চীফ ইয়াহিয়া খান, এয়ার মার্শাল নূর খান এবং নৌবাহিনীর এ্যাডমিরাল এ. এম. হাসান গোপনে রাওয়ালপিণ্ডি যান। এবং আয়ুব খানের সঙ্গে দেখা ক'রে তাদের অভিমত জানান।

২৪ফেবরুয়ারির এক খবরে 'ফিনানসিয়াল টাইমসে'র সংবাদদাতা জানালেন, করাচিতে সেনাবাহিনীর কনিষ্ঠ অফিসাররা জনসাধারণের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার ক'রেছে। ফলে কয়েকজন অফিসরের কোর্ট মার্শাল পর্যন্ত হয়। সেনাবাহিনীর অফিসাররা ক্যু করার চেষ্টা করছে বুঝতে পেরে আয়ুব শেষবারের মতো সর্বদলের প্রতিনিধি নিয়ে একটি জাতীয় সরকার গঠন করার চেষ্টা ক'রলেন, যাতে ক'রে সেনাবাহিনীর ক্যু না হয়।

ঢাকায় ২৩ ফেবরুয়ারি এক জনসভায় ছাত্র সংগ্রাম-পরিষদ জাতীয় পরিষদের সদস্য এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার বুনিয়াদীগণতন্ত্রীকে ৩ মার্চের মধ্যে পদত্যাগ করার আহ্বান জানাল। ওই সময়ের মধ্যে পদত্যাগ না ক'রলে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক ক'রে দিলেন ছাত্র নেতারা। প্রচুর বুনিয়াদীগণতন্ত্রী তাদের পদত্যাগপত্র দাখিল ক'রলেন। কুষ্টিয়ায় একজন ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যান পদত্যাগ ক'রতে অস্বীকার করায় তাকে জনসাধারণ পিটিয়ে মেরে ফেলল। এই ঘটনার পর বুনিয়াদী গণতন্ত্রীদের মধ্যে পদত্যাগের হিড়িক পড়ে গেল। প্রশাসনের কর্তা হ'য়ে,

গেলেন ছাত্র নেতারা। আয়ুবের কয়েকজন মন্ত্রীর বাড়িঘর পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিল জনতা।

২৬ ফেবরুয়ারি বিরোধীদলের নেতাদের সঙ্গে গোলটেবিলে বসলেন আয়ুব। সামান্য আলোচনার পর পরবর্তী বৈঠক পিছিয়ে গেল ১০ মার্চ। ময়মনসিংহের ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে পাওয়া এক খবরে জানা গেল ক্রুদ্ধ জনতা জামালপুরে ২১ জনকে পুড়িয়ে মেরেছে; বহু বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। জনতার রোষে রাজশাহীতে ৪৭৮টি, পার্বতীপুরে ১০০০টি বাড়ি পুড়ল।

ভুট্টো, ভাসানী, কায়ুম খান অনতিবিলম্বে আয়ুবের পদত্যাগের দাবি জানালেন। অপর দিকে আসগর খান প্রমুখ নেতারা নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত আয়ুব খানকে প্রেসিডেন্টের কাজ চালিয়ে যেতে বলেন। ১০ মার্চ-থেকে চারদিন ধরে আলোচনার পর আয়ুব খান বিরোধী দলের প্রাপ্তবয়স্কের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি মেনে নিলেন। কিন্তু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা ক'রলেন না তখনও। পূর্ববাঙলার নেতাদের আয়ুবের মতিগতি ভালো ঠেকল না। আয়ুব পরবর্তী সময়ে প্রতিশ্রুতির খেলাপ ক'রতে পারেন বলে সন্দেহ ক'রলেন তারা। আয়ুব তখনো এক ইউনিট ভাঙা এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ব্যাপারে টালবাহানা ক'রছিলেন। নুরুল আমিন, এস. এম. মুর্শেদ এবং শেখ মুজিব বৈঠক ছেড়ে চলে এলেন।

আন্দোলন থামল না।

১৫ মার্চ রেডিও অস্ট্রেলিয়া খবর দিল, এ পর্যন্ত এই বিক্ষোভ-আন্দোলনে ১৬৭ জন নিহত হ'য়েছে এবং ১০ হাজার ঘরবাড়ি পুড়েছে।

১৭ মার্চ আয়ুব জেনারেল মহম্মদ মুসাকে সরিয়ে শিল্পপতি হারুনকে পশ্চিমপাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত ক'রলেন। এবং

২১ তারিখে পূর্ববঙ্গে মোনেম খানের জায়গায় গভর্নর ক'রে পাঠালেন এম. এন. হুদাকে।

তারপর এলো মার্চের ২৫ তারিখ। পিস্তলের নলের মুখে রেখে আয়ুবকে সামরিক শাসন ঘোষণা ক'রে জেনারেল ইয়াহিয়ার হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিতে বললেন কয়েকজন জেনারেল।

গোড়ায় আয়ুব বললেন, তিনি জেনারেল ইয়াহিয়ার হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে তিন মাসের ছুটিতে যাচ্ছেন। কিন্তু মাত্র ছয় দিনের দিন আয়ুবকে সরিয়ে ইয়াহিয়া নিজেই প্রেসিডেণ্ট হ'য়ে বসলেন। যেমনভাবে ১৯৫৮ সালে একদিন ক্ষমতায় এসেছিলেন আয়ুব, ঠিক তেমনি ভাবেই তাঁকে বিদায় নিতে হ'লো।

ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না।

পাকিস্তানে দ্বিতীয়বার যখন সামরিক-শাসন জারি হ'লো আমি তখন বাইরে। ইচ্ছে থাকলেও পূর্ববাঙলায়, সেই শীতলক্ষ্যা-বুড়িগঙ্গার তীরে ফিরে যাওয়া হ'লো না। বন্ধুদের সঙ্গেও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল। আয়ুবের গুলিতে আতোয়ার নিহত হ'লো। প্রাণেশ শাহাবউদ্দীনেরও খোঁজ-খবর পাই না অনেক দিন। জানি না ওরা বাইরে আছে কিনা। না কি ওদের ঠাঁই হ'য়েছে ইয়াহিয়ার জেলে? বছর ঘুরে এলো। ইয়াহিয়া জানুয়ারির গোড়ায়ই রাজনৈতিক দলগুলির ওপর থেকে সভা-শোভাযাত্রা করার নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন। ১১ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে শেখ মুজিব আবার হাজির হ'লেন জনতার দরবারে। শেখ মুজিবের বক্তৃতা শোনার জন্য এত লোক হ'লো যে, পল্টন ময়দান ছাপিয়ে জিন্নাহ্ এভিনিউ ডি-আই-টি, পর্যন্ত মানুষ ছড়িয়ে পড়ল। স্টেডিয়ামের ছাদে শুধু মানুষ আর মানুষ।

ইয়াহিয়া এক ইউনিট ভেঙে দিলেন, শাসনতন্ত্রের মূলনীতি ঘোষণা ক'রলেন। প্রাপ্ত বয়স্কের ভিত্তিতে নির্বাচনের তারিখ জানালেন। ৭ জুন ছয়-দফা দাবি-দিবসে শেখ মুজিব আনুষ্ঠানিক ভাবে নির্বাচনী অভিযান শুরু করলেন।

বাঙালী সেদিন নতুন সংগ্রামী চেতনা আর প্রত্যয়ে বুলেটের মুখে বুক পেতে দিয়েছিল। পশ্চিমপাকিস্তানের শাসক আর শোষকদের হাত থেকে বাঙালীর অধিকার ফিরিয়ে আনার সনদ ছয়-দফা। জনতার দরবারে ছয়-দফা পেশ করায় শেখ মুজিব অন্তরীণ হলেন। তার প্রতিবাদে এবং ছয়-দফার প্রতি জনগণের সমর্থন যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ৭ জুন হরতাল ডাকা হ'লো আওয়ামীলীগ এবং ছাত্রলীগ থেকে।

৫ জুন ছাত্রলীগের ছেলেদের কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হ'লো, আজ ছাত্রলীগের যে সভাপতি, সেই নূরে আলম সিদ্দিকী গেল তেজগাঁ অঞ্চলে—শ্রমিকদের মধ্যে ছয়দফা সম্পর্কে জনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে।

সে সময় তেজগাঁর শ্রমিক এলাকায় আওয়ামী লীগের কোনো সংগঠন ছিল না। ত্ব'-একটি শ্রমিক সংস্থার সমর্থন ছিল মাত্র।

৬ জুন নূরে আলম সিদ্দিকী তার সহকর্মীদের নিয়ে শ্রমিক এলাকা ঘুরে ঘুরে ছয়-দফার সমর্থনে মত সংগ্রহের প্রাথমিক চেষ্টা চালাল। বিকেলে কিছু শ্রমিক, আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কর্মীদের নিয়ে পথসভা হ'লো, পাল্টা প্রচারও চলল। অনেক রাত পর্যন্ত কাজ চলল। রাতেই পুলিশ আর ই. পি. আর. শ্রমিক এলাকায় মোতায়েন করা হ'লো।

৭ জুন। অন্যদিনের মতো কলকারখানায় ব্যস্ততা নেই, হাতুড়ি পিটানোর শব্দ মেসিন চলার আওয়াজ নেই। শ্রমিকরা হরতালে যোগ দিল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে চলছে শ্রমিক-জনতার জটলা।

পলিটেকনিক ইন্সটিটুটের সামনে আচমকা একটা পুলিশ জীপ এসে থামল। রুল মেরে তিনজনকে জীপে নিয়ে ওঠাল।

কেউ-কিছু ভালো ক'রে বুঝবার আগেই জীপটা চলে গেল।

মিনিট পনেরো পরের আর-একটি ঘটনা: তিব্বত ফ্যাক্টরির কাছের একটা পানবিড়ির দোকানে জনৈক পুলিশ-অফিসার কয়েকটা লাথি মারল। যখন জানতে পারল যে, পাশে দাঁড়ানো লোকটিই পানওয়ালা, তখন তাঁকে ধরে নিয়ে চলে গেল। তাঁর অপরাধ, সে সেদিন দোকান বন্ধ রেখেছে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনাও বেড়ে চলল। এখানে-সেখানে ব্যারিকেড তৈরী হ'তে থাকল। গ্যাবিস্কো ফ্যাক্টরির সামনে শ্রমিক-পুলিশে একটা খণ্ড যুদ্ধও হ'য়ে গেল এর মধ্যে। খবর পাওয়া গেল, চাটগাঁগামী ট্রেন 'উল্কার' গতিরোধ ক'রেছে জনতা। গিয়ে দেখা গেল, দুটো বগি ভর্তি পুলিশ নিয়ে একটা ইঞ্জিন আউটার সিগন্যালের দিকে যাচ্ছে উল্কার অবরোধ মোচনের উদ্দেশ্যে। শ্রমিকরা রেল-লাইন উপড়ে ফেলতে চাইল। নূরে আলম সিদ্দিকী বাধা দিল। বলল, ভাইসব আসুন, আমরা লাইনের উপর শুয়ে পড়ি। ওদের সাহস থাকে আমাদের বুকের ওপর দিয়ে ট্রেন চালাক। সকলেই তাই ক'রল। সেই সময় নূরে আলম সিদ্দিকীর কাছে একটা ব্যাটারি চালিত মাইক ছিল। তার পাশেই ছিল দু'জন প্রভাবশালী শ্রমিক আমির হোসেন এবং মনু মিয়া। পুলিশ হঠাৎ ট্রেনের কম্পার্টমেন্ট থেকে মাথা বাড়িয়ে গুলি ক'রল। গুলি লাগল মনু মিয়ার পাঁজরে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। মনু মিয়া যন্ত্রণায় কাঁতরাচ্ছে। তাঁর ক্ষতস্থান চেপে ধরল সিদ্দিকী। মনু মিয়া তখন বলে ওঠে, 'আমারে ধরন লাগব না, আপনি কইয়া যান।'

'কী বলব?' হতভম্ব সিদ্দিকীর কথায় মনু মিয়ার জবাব: 'সংগ্রামের কথা কন!' আমির হোসেনও রক্ত দেখে চীৎকার ক'রে

পুলিশের বগির দিকে এগিয়ে গেল। মুহূর্তে বুলেট এসে তাঁকেও বিদ্ধ ক'রল। আমির হোসেনের লাশ ওরা তুলে নিয়ে চলে গেল।

ক্ষিপ্ত জনতা আর শ্রমিক রেল-লাইনের খোয়া তুলে শিলাবৃষ্টি ক'রে চলল পুলিশদের উদ্দেশে। ও তরফও নীরব রইলেন। একটার পর একটা গুলি চালাল তারা। একটার পর একটা তাজা প্রাণ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। স্বাধিকার আদায়ের জন্য সেখানেই শহীদ হ'লেন ৭ জন। আহত হ'লেন ১৮ জনের মতো। লাশ নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল জনতা আর পুলিশে। পুলিশ লাশ গায়েব ক'রে ফেলতে চায়। শেষ পর্যন্ত চার জনের লাশ পুলিশ ছিনিয়ে নিল।

আহতদের নিয়ে একদল তেজগাঁ ওয়েলফেয়ার অফিসে গেল। এ্যাম্বুলেন্সে আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হ'লো।

এই ঘটনায় সারা তেজগাঁ—সারা ঢাকায় তখন উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রমিক-জনতা আর পুলিশে সংঘর্ষ চলল এখানে-ওখানে, অনেক জায়গায়। জনৈকা অভাগিনী মা ঘরে বসে কোলের শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন, পুলিশের গুলি তাঁর দেহ এফোঁড়-ওফোঁড় ক'রে দিল।

মনু মিয়ার অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন। তবু সে হাসপাতালে যেতে চাইল না। যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে সে শুধু বলল, 'সাব মুই আর বাঁচমু না। মোরে আর মেডিকেলে লইবেন না। মোরে লইয়া মিছিল করুন। বেবাক লোকে দেখুক, মুই জান দিলাম।'

মনু মিয়ার কথা শুনে সকলের চোখে নামল অশ্রুর ঢল।

বেরুল মিছিল। মিছিল যতই ঢাকা শহরের দিকে, বায়তুল মোকাররমের দিকে এগোয়, ততই মিছিলের কলেবর বৃদ্ধি পেতে থাকে। শ' থেকে হাজার, তারপর হাজার হাজার লোক শামিল

হ'লো সেই মিছিলে। মনু মিয়ার বুকের তপ্ত রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ে চলেছে ঢাকার পথে পথে।

রেল-ক্রসিং-এর ওখানে আবার গুলি চলল।

পুলিশের একটা জীপ এসে ঘোষণা ক'রে গেল শহরে একশ' চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা হ'য়েছে। সব রকম সভা সমাবেশ মিছিল নিষিদ্ধ করা হ'য়েছে। চার জনের বেশি লোকের একত্র সমাবেশ আইনত দণ্ডনীয়।

কে মানে সেই নিষেধাজ্ঞা। এগিয়ে চলল মিছিল।

শাহাবাগের কাছে আবার সতর্কবাণী উচ্চারণ ক'রল পুলিশ কিন্তু মিছিলের গতি রুদ্ধ হ'লো না। মানুষগুলো আজ ক্ষেপে গেছে। মিছিলের সামনে শহীদের রক্তমাখা জামা বাঁশের মাথায় নিশান হ'য়ে উড়ছে।

তোপখানার মোড়ে ই পি আর পথ ব্যারিকেড ক'রে দাঁড়াল। মিছিলের মোড় ঘুরিয়ে নেওয়া হ'লো কার্জন হলের দিকে। সভা হ'লো কার্জন হলেই। শহীদের রক্ত তিলক কপালে এঁকে সকলে সেদিন, সেই ৭ জুন বুক-ভরা জ্বালা নিয়ে বলল: মাগো তোমায় মুক্ত করব, শপথ নিলাম।

একুশে ফেবরুয়ারি, সতেরোই সেপ্টেম্বর, সাতই জুন, সতেরোই জানুয়ারি, চব্বিশে জানুয়ারি পূর্ববাঙলার মানুষের কাছে চির অমর, অক্ষয়। ওইগুলি বাঙলামায়ের দামাল ছেলেমেয়েদের রক্ত ঝরার দিন। প্রাণের দাবি আদায় করতে পূর্ববাঙলার পথে পথে ওই দিনগুলিতে বাঙলার ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছে।

সেই দাবি-দিবস স্মরণে, সেই এগারোদফা-ছয়দফা আদায়ের তাগিদে লক্ষ লক্ষ মানুষ রেসকোর্স ময়দানে জমায়েত হ'লো। অঝোর বৃষ্টি উপেক্ষা ক'রে একজন-দু'জন নয়, দশ-বারো লক্ষ লোক ছাতা

মাথায়, টোকা মাথায়, বর্ষাতি গায়, কিংবা ভিজতে ভিজতে গিয়ে হাজির হ'য়েছিল সেদিন। শেখ মুজিব এসে উঠলেন মঞ্চে। পরনে তার সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। জনতার কণ্ঠে মুহুর্মুহু স্লোগান উঠল : জেগেছে জেগেছে বাঙালী জেগেছে, বাঙালীরা আছে শেখ মুজিবের পিছে। সাগরের গর্জন, মেঘের ডম্বরুধ্বনিও বুঝি হার মানে সেই জনতার কল্লোলের কাছে। ছাত্রনেতা আ. স. ম. আবছুর রব এবং আবছুর রাজ্জাক শেখ মুজিবের গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। তেজগাঁর শ্রমিকরা ছয়-দফার প্রতীক হিসাবে শেখ মুজিবের হাতে ছয়টি শ্বেতপায়রা তুলে দিলেন। বৃষ্টি-ঝরা আকাশে উড়িয়ে দিলেন শেখ মুজিব পায়রাগুলিকে। তারপর? তারপর নেতার কথায় দশ লক্ষ জনতা যে কখন সম্মোহিত হ'য়ে গেছে, কেউ জানতেও পারেনি। শেখ মুজিবের কণ্ঠে যে জাছু আছে। শেখ মেঘ-গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বলে চলেছেন: এদেশের আপামর মানুষের স্বাধিকারের দাবিতে সংগ্রাম ক'রতে গিয়ে '৬৬ সালের ৭ই জুন মনু মিয়া শহীদ হ'য়েছেন। যেমন করে গত ২৩ বছরে এমনি ক'রে শহীদ হ'য়েছেন আরও অনেকে। কিন্তু তাঁরা তাঁদের প্রাণের দাবি প্রতিষ্ঠা ক'রে যেতে পারেন নি। সেইসব বীর শহীদদের অসমাপ্ত কাজ শেষ ক'রতে যদি আরও রক্তের প্রয়োজন হয়, রক্ত দেব। বাঙলার মেহনতী মানুষ রক্ত দিতে ভয় পায় না। তবে, আর শহীদ হওয়া নয়, এবারে আপনাদের গাজী হ'তে হবে। আপনারা যদি জুলুম, বেইমানী আর বে-ইনসাফির অবসান ঘটিয়ে মানুষের মতো বাঁচতে চান, তবে আগামী নির্বাচনে ধোঁকাবাজ আর মীরজাফরদের খতম ক'রে ছয়-দফার ওপর সুস্পষ্ট ম্যাণ্ডেট দিন। আমি আপনাদের দাবি আদায় ক'রে আনব। আর যদি রক্তের প্রয়োজন হয় সবার আগে আমিই রক্ত দেব। তারপর আপনাদের ডাকব।

পাঞ্জাব-সিন্ধু-বেলচিস্তান-সীমান্তপ্রদেশের গরীব ভাইয়েরা, তোমরাও জমিদার জোতদার সর্দার আর নবাবজাদা খানজাদাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও। বাঙলার মজলুমরা আছে তোমাদের পাশে।'

এমনি বলে গেলেন একনাগাড়ে ৮০ মিনিট। ভাষণের শেষ দিকে শেখসাহেব বললেন, 'যদি আপনারা নিরঙ্কুশ গণতন্ত্র ও অর্থ-নৈতিক অধিকার এবং ছয়-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন চান, যদি বাঙলার মীরজাফরদের রাজনীতি থেকে উৎখাত ক'রতে চান, যদি আমার ওপর আপনাদের আস্থা থাকে, তা'হলে আমি নারায়ে তকবির বলার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা হাত তুলুন।

শেখসাহেবের নির্দেশ মতো মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ হাত উঠল ওপরে। তারপর শেখসাহেব বললেন, 'এবার হাততালি দিন।'

জনতা অফুরন্ত প্রাণোন্মাদনায় করতালিতে মুখরিত ক'রে তুলল রমনার মেঘলা আকাশ।

শেখ মুজিবের কথায় সম্মোহিতের মতো দশ লক্ষ লোকে কাজ ক'রে যাচ্ছে। মঞ্চে বসে ছিলেন পশ্চিমপাকিস্তানের কয়েকজন আওয়ামীলীগ নেতা, তাঁরা সবিস্ময়ে মন্তব্য ক'রলেন, 'ইয়ে ক্যায়া জাদু হ্যায়।'

হ্যাঁ জাদুই। পূর্ববাংলার মানুষকে ভালোবাসার জাদুতে মুগ্ধ ক'রে রেখেছেন শেখ মুজিব।

শেখ মুজিবকে সিপাহ্‌শালার ক'রে বাঙলার নির্যাতিত বঞ্চিত মানুষ এগিয়ে চলে দুর্মদ বেগে। কণ্ঠে তাদের অগ্নিশপথ: শপথ নিলাম, শপথ নিলাম মাগো তোমায় মুক্ত ক'রলাম; সংহতি না স্বাধীনতা—স্বাধীনতা স্বাধীনতা; তোমার আমার ঠিকানা—পদ্মা-মেঘনা-যমুনা।'

নভেমবরে পূর্ববাঙলার দক্ষিণাঞ্চলে জলোচ্ছাসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল লক্ষ লক্ষ মানুষ। দ্বীপের পর দ্বীপ জনপদ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল '৬০ সালের 'টাইডাল বোরের' দৃশ্য। অসংখ্য হতভাগ্যের মৃতদেহের ছবি আজও সময়ে-অসময়ে মানসপটে জেগে ওঠে। একটা হাত গাছের ডাল ধরে রেখেছে। দেহ কোথায় চলে গেছে। কোলের শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরে পড়ে আছে অভাগী মায়ের নিষ্প্রাণ দেহ। গাছের ডালে রয়ে গেছে ডুরে শাড়ি। কত সন্তান মা-বাবাকে হারাল, কত মা-বাবার বুক খালি হয়ে গেল সন্তানদের মৃত্যুতে, কে তার খোঁজ রাখে। একবার-দুবার নয়, বারবার প্রকৃতির খেয়াল-খুশির বলি হ'য়েছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নরনারী। ১৭৯০ থেকে দেশ-ভাগের আগে পর্যন্ত পাঁচ-পাঁচবার সামুদ্রিক ঝড় এসে হাজার হাজার মানুষকে নিয়ে চলে গেছে অতল দরিয়ায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও দক্ষিণাঞ্চলের মানুষদের ওপর নেমে এসেছে প্রকৃতির রুদ্ররোষ। কিন্তু এই বিজ্ঞানের যুগেও কি বার বার প'ড়ে প'ড়ে মার খেতে হবে? এই প্লাবন, ওই জলোচ্ছাসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কি কোনো উপায় নেই? আছে। কিন্তু কে দেবে প্রয়োজনীয় অর্থ। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার শোষণ করতেই শিখেছে, সুশাসন ক'রতে শেখেনি। পূর্ববাঙলার লক্ষ লক্ষ মানুষের কান্না তাদের হৃদয়ে কোনো সাড়া জাগায় না।

ঈদ এসে গেল। জানি, পূর্ববাঙলায় এবার ঈদ-উৎসবে আনন্দ

হবে না। লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনাহারে রেখে কেউ কি ঈদ-উৎসব ক'রতে পারে।

ঈদের দু'-চার দিন বাদেই হুম্ ক'রে শাহাবউদ্দীনের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। দীর্ঘ চিঠি।

ময়মনসিং
৩০ নভেমবর,

কল্‌হন

দীর্ঘদিন বাদে তোর কাছে চিঠি লিখছি। সামরিক-শাসন জারি হওয়ার পর আত্মগোপন ক'রেছিলাম। রাতের পর রাত অন্ধকারে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি প্রায় একটা বছর। খবর নিশ্চয়ই পেয়েছিস, ডিসেমবরে নির্বাচন হচ্ছে পাকিস্তানে। কিন্তু তার আগেই প্রকৃতির খেয়ালে জনপদের তালিকা থেকে মুছে গেল হাতিয়া-ভোলা-সন্দ্বীপের তজমুদ্দি, সখচর, চারবিৎ, নলচিরা প্রভৃতি বিনি সুতোয় গাঁথা এমনি কত চর। আজও ছিন্নমূল মানুষের ক্ষুধার্ত চীৎকার দ্বীপের বাতাস ভারি হ'য়ে আছে। ঈদের চাঁদ কখন এলো কখন গেল জানতেও পারি নি। আজ যখন দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের লাস দাফনের কাপড় জুটছে না, প্রকৃতি যাঁদের রেহাই দিয়েছে, মানুষের অবহেলায়, জঙ্গীসরকারের নির্দয় ঔদাসীন্যে আজ যখন হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মরতে চলেছে, তখন তোকে কেমন ক'রে ঈদ মোবারক জানাই? আজ তোকে প্রীতি নয়, আমার, আমাদের বেদনার্ত হৃদয়ের খানিক ভাগ দিচ্ছি।

পূর্ববাঙলায় লক্ষ লক্ষ লোক যখন মরতে চলেছে, যখন সারা বিশ্ব দুঃখে উদ্বেল, তখনও ইয়াহিয়া এবং তাঁর আমলারা নীরব। কয়েক দিনের মধ্যে সরকার থেকে না মিলছে একমুঠো খাবার, না এক

কৌটা খাবার পানি। এই সব ছিন্নমূল মানুষের পরিশ্রমের অর্থে কেনা হেলিকপ্টারগুলোর একটাও এলো না পশ্চিম থেকে পুবে। অসহ্য ইয়াহিয়া আর তাঁর আমলাদের গাফিলতি! '৬০ সালের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আজম চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের টাইয়ের নট ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলেছিলেন, ঝড়ের খবর পেয়ে আমি ঢাকা থেকে চলে এলাম। আর তুমি এখনো বসে 'টাই' বাঁধছ। ষাট আর সত্তুরের আমলাদের চরিত্রের বদল ঘটেনি এতটুকুও। শামসুর রহমান এই সব আমলাদের একটি আশ্চর্য সজীব চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর এক সাম্প্রতিক কবিতায়:

বুঝলে গো, শালারা মরেও এতটুকু স্বস্তি, শান্তি কিছুই দেবে না
লাশ দাফনে জন্য প্রস্থ প্রস্থ কাফন দরকার,
সরকার রিলিফ দাও—তারস্বরে চেঁচাচ্ছে সবাই।
দুর্গত-টুর্গতদের কতো যে বায়না ফরমাস—
চাল-ডাল মুড়ি-চিড়া, ঘটি-বাটি, লুঙ্গি শাড়ি চাদর কম্বল
চাই, চাই কেরোসিন, দেয়াশলাই চাই,
খাবার পানিও চাই, চাই, শুধু চাই, যত্তসব
হাড়-হাভাতের দল, পোকামাকড়ের ঝাঁক আর এতো ভাটি,
তাদের নিকটে
গেলে, বুঝলে গো
অগোচরে হাত রুমালের জন্য ভারি ব্যগ্র হয়।
লোকসভা, বিক্ষোভ মিছিল, নগ্নপদে হাঁটাহাঁটি, কালোব্যাজ,—
সবই আদিখ্যেতা, মাতব্বরদের বুজরুকি বাপু,
সারাটা দেশ তো আর বঙ্গোপসাগরে যায় নি তলিয়ে।
সংবাদপত্রের সেই লোকদের কাণ্ডকারখানা
দেখলে মাথার তালু জ্বলে যায়, ওদের তিলকে
তাল বানানোর প্রতিভার নেইকো তুলনা।

বলে কিনা বারো লক্ষ কিংবা তারো বেশি লোকজন
মরেছে সম্প্রতি, এটা মস্ত ব্লাফ, তথ্যের জোচ্চুরি,
রিলিফ কমিশনার কী বলেন খবর কাগজে
পড়ো নি ডার্লিং তুমি ? তোমাকে শাড়িটা কিন্তু মানিয়েছে বেশ
বলতেই হয়, লোকটার আছে টেস্ট, মানে সেই
বাণিজ্যিক এলাকার রাজকুমারের, ঈর্ষান্বিত দুষ্টলোকে
হয়তো বলবে ঘুষ-ঘাষ, কিন্তু তুমি জানো এটা
সামান্য প্রেজেন্ট বৈ তো নয়, ছিলো প্যান,
কিছুক্ষণ ক্লাবে
খেলব টেনিস কিংবা গ্লাস
এবং বাংলোয় ফিরে এসে
রাত্তিরে তোমার সঙ্গে খুনসুটি ক'রে দিব লম্বা ঘুম।
অথচ ছুটতে হবে ন্যাংটো মরা খেকোদের ভিড়ে
না, না, এতটুকু ম্লান হবে নাকো জুতোর
এবং ট্রাউজারের ক্রিজ, থাকবে অটুট, তুমি ভেবো না
বডিগার্ড, খানসামা পরিবৃত ঝকমকে লঞ্চেই থাকব।
বিচ্ছিরি কুচ্ছিৎ কিছু যদি চোখে পড়ে, পড়বেই,
তক্ষুনি ফেরাব দৃষ্টি, প্রাকৃতিক শোভায় জুড়িয়ে
নেব চক্ষুদ্বয়, দেখি, দেখি, চমৎকার ঈদকার্ড
কিনেছ তো রাশি রাশি—কী সুন্দর পাখি, বুলবুলি টুলবুলি হবে,
নদীতে ভাসছে নৌকো, পালতোলা, খেজুরগাছের ওপর চিকন
চাঁদ, ইত্যাদি।'

এই জন্যেই বোধ হয় ছাত্রলীগের আবদুর রব রাগ আর ঘৃণা সামলাতে না পেরে নোয়াখালির ডেপুটি কমিশনারের গালে চড় কষিয়েছে।

লক্ষ লক্ষ মানুষের এই ভয়ঙ্কর দুর্দিনে আজ নেতারা কোথায় ? ছিন্নমূল মানুষের পাশে ভাসানী আর মুজিব ছাড়া আর কেউ নেই

কেন? দু'একজন মাইজদি পর্যন্ত এসেই সংবাদপত্রে বিবৃতির খই ছুটিয়েছেন।

শেখ মুজিব দ্বীপ থেকে দ্বীপে দিনের পর দিন চিড়া খেয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন; ছিন্নমূল মানুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ভোলার একটি দ্বীপে মুজিব ভাই গিয়ে যখন হাজির হ'লেন, দশ-বারোজন ন্যাংটি-পরা কংকালসার মানুষ আওয়ামীলীগে নির্বাচনের প্রতীক শতছিন্ন নৌকোর একটি ব্যানার সামনে নিয়ে মুজিব ভাইয়ের কাছে এগিয়ে এলো। চরের সব ভেসে গেছে। ওই ক'টি মানুষ আর নৌকোর ব্যানারটি রয়ে গেছে। ওই নির্বাক আর্ত মানুষগুলোর হাতে তখনো নির্বাচনের প্রতীকটি দেখে মুজিবভাই আর কান্না চাপতে পারলেন না। নেতার কান্না দেখে ওই কংকালসার মানুষগুলোর চোখেও নামল নোনাপানির ঢল।

দ্বীপ থেকে দ্বীপে ঘুরেছেন শেখ মুজিব। দেখেছেন বাঙলার মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশা। সরকারি ঔদাসীন্যে বার বার দাঁতে দাঁত ঘষেছেন আর মৃতদের আত্মার শান্তি কামনা ক'রে মনে মনে বলেছেন:

'আয় খোদা! রহমান!
বেহেস্ত নাজেল করিও সকল মৃত্যু-ব্যথিত প্রাণ।'

আজ যেখানে বিধ্বস্ত বাঙলার বিরান উপকূলের চারদিকে মৃত্যুর চিহ্ন ছড়িয়ে, বহু জননীর বুকের ধন লাশ হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে বাঙলার লোনা নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে, যখন লক্ষ লক্ষ মানুষের গায়ে একটুকরো কাপড় উঠছে না, ফিরনি-মাংস তো দূরের কথা পাচ্ছে না এক মুঠো চিড়ে, যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ আশ্রয়-শিবিরের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখান থেকে ওখানে, তখন কি ঈদের খুশি মনে?

জানিস, চরে চরে ঘুরেছি আর বার বার নিজেদের ধিক্কার

দিয়েছি। মানুষ বলে নিজেদের পরিচয় দিতে লজ্জা পেয়েছি। সন্দীপ-হাতিয়া-ভোলার একটি কৃষককে আজ কী সান্ত্বনা দেব, কী বলব? আজ এই বিপদের দিনেই যদি তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে না পারলাম, তাদের দুঃখের ভাগ নিতে না পারলাম তাহ'লে কোন্ লজ্জায় তাদের কাছে গিয়ে পরে ভাই, বন্ধু, কমরেড, বলে হাজির হবো।

তবে প্রকৃতি আমাদের চোখ আরো খুলে দিয়েছে। আমরা বুঝেছি, পূর্ববাঙলার মানুষকে নিজেদের পায়েই দাঁড়াতে হবে। স্বাধিকার ছাড়া, স্বাধীনতা ছাড়া, বাঙলার মানুষদের বাঁচাবার পথ নেই। পূর্ববাঙলার সম্পদ শোষণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ জলোচ্ছ্বাস রোধ করবার কাজে তার একাংশও দিচ্ছে না। বিশ লক্ষ মানুষ মরে আমাদের স্বাধীন ক'রে দিয়েছে।

বুক-ভরা কান্না আর দু'চোখে সূর্যের জ্বালা নিয়ে মুজিবভাই ফিরে এলেন ঢাকায়। ঢাকায় এসে শাহাবাগ হোটেলে দেড়শ' দেশী-বিদেশী সংবাদিকদের এক বৈঠকে তিনি বললেন, 'এই দীর্ঘ তেইশ বছর আমাদের একটা উপনিবেশ (কলোনি) এবং বাজার এসে গণ্য ক'রেছে। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকের অধিকার থেকে আমরা হ'য়েছি বঞ্চিত। গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধান্তই নেওয়া হয় পিণ্ডি বা ইসলামাবাদে। ক্ষমতা সবই কেন্দ্রের আমলাদের হাতে। তারা দিনের পর দিন উপেক্ষা ক'রে চলেছে বাঙলাদেশকে। তাদের দীর্ঘদিনের বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে আমরা বার বার প্রকৃতির মর্জির সহজ শিকার হচ্ছি। আজও বন্যানিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা হয়নি। আজও জলোচ্ছ্বাসরোধের চেষ্টা হয়নি। দশ বছর আগে উপকূলবর্তী গ্রামগুলোর পুনর্বিন্যাস ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা উন্নয়নের প্রকল্প পেশ করা হ'য়েছিল, দশবছর পরেও তা বাস্তবায়িত হয় নি। ঘূর্ণিঝড়ের থেকে রেহাই পাবার

জন্তে যে আশ্রয়-শিবির নির্মাণ করার কথা ছিল, তার জন্য প্রয়োজনীয় ২০ কোটি টাকা আজও পাওয়া যায়নি। এখানকার অতি প্রয়োজনে, মানুষের বাঁচার প্রয়োজনে যেখানে মাত্র কুড়ি কোটি টাকা পাওয়া যাচ্ছে না, ইসলামাবাদের সৌধ নির্মাণ এবং সাজসজ্জার জন্য দু'শ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই মঞ্জুর হ'য়ে গেছে। আমাদের বন্যানিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনাই আজ পর্যন্ত হ'লো না, অথচ পশ্চিম-পাকিস্তানে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে মঙ্গলা ও তারবেলা ড্যাম্প তৈরীর জন্য এক বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ মঞ্জুর করা হ'য়ে গেছে।' একটু থামলেন মুজিবভাই। পরনে তার সাদা-পাজামা পাঞ্জাবি। তার ওপর হাফ মুজিবকোট। হাতের পাইপে তামাক জ্বলে চলেছে। সংবাদিকরা নিবিষ্টমনে নোট নিয়ে চলেছেন। মুজিবভাই আবার মুখ খুললেন, 'প্রকৃতির করাল গ্রাস থেকে বাঙলাদেশের মানুষকে বাঁচাতে হ'লে চাই পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। নির্বাচনের মাধ্যমেই হোক আর নির্বাচন বানচাল হ'লে জাগ্রত জনগণের শক্তির মাধ্যমেই হোক, জনগণকে ক্ষমতা দখল ক'রতেই হবে।

পশ্চিমপাকিস্তানে এবছর প্রচুর গম উৎপাদন হ'লেও, আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত অঞ্চলে খাদ্যবোঝাই প্রথম জাহাজটি এসেছে বিদেশ থেকে। আমাদেরই পয়সায় পশ্চিমপাকিস্তানে লক্ষ লক্ষ সৈন্য পোষা হ'লেও আজ দাফনের কাজ ক'রছে বৃটিশ-সৈন্যরা। এই বিপদের দিনে যেখানে বিদেশীরা তাদের হেলিকপ্টারে খাদ্য পাঠাচ্ছে দুর্গম অঞ্চলগুলিতে, সেখানে আমাদের হেলিকপ্টারগুলো পশ্চিমপাকিস্তানে পড়ে রয়েছে অলস হ'য়ে।

ধনিকশ্রেণীর উদ্দেশ্যে শেখসাহেব বলেন, 'এই বাইশ-পরিবার জনগণের রক্তের ওপর সমৃদ্ধি লাভ ক'রলেও তাঁরা এখনো ঘূর্ণিঝড়ে

ছিন্নমূল মানুষদের উল্লেখযোগ্য সাহায্য কিছুই পাঠায় নি। পশ্চিম-পাকিস্তানের কাপড়ের কলের মালিকরা প্রধান বাজার হিসেবে বাঙলাদেশ শোষণ ক'রলেও, মৃত-দেহের কাফনের জন্য একটুকরো কাপড় পর্যন্ত দেয় নি। বাংলাদেশ আর কারু কলোনি হ'য়ে থাকবে না। নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ক'রবে।'

একজন সাংবাদিক বলে ওঠেন, 'মনে করুন, শতকরা ৯০টি ভোট পাবেন...'

শেখসাহেব তাঁকে কথা শেষ ক'রতে না দিয়েই দ্রুত বলে উঠলেন, '৯০টি নয়, ৯৭টি আসন পাব।'

কল্হন, বলতে পারিস এমন আত্মবিশ্বাস কী করে আসে? আমি বলব, ভালোবাসা। মুজিবভাই তাঁর দেশের মানুষকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। তাদের সুখদুঃখ নিয়ে ভাবেন, বিপদ-আপদে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। তাই সাধারণ মানুষও তাদের শেখ সাহেবকে এমন নিবিড় ক'রে ভালোবাসে। তাদের ভালোবাসাই এই আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে শেখসাহেবের মধ্যে।

হ্যাঁ, শোন, ১ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পশ্চিমপাকিস্তানের এক ইউনিটের বিলুপ্তি ঘোষণা ক'রেছেন। আমাদের দীর্ঘদিনের একটি দাবি পূরণ হ'য়েছে। আর ৭ ডিসেম্বর প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সারা দেশে সাধারণ নির্বাচন হ'তে চলেছে। জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা নির্ধারিত হ'য়েছে জনসংখ্যার অনুপাতে। এটাও আমাদের একটা জয়।

চিঠি দিস।

তোর
শাহাব

শেখ মুজিবের প্রত্যাশা পর্যন্ত ও ছাড়িয়ে গেল নির্বাচনের ফলাফল। শতকরা ৯৮·৭টি আসন পেলেন মুজিব। অর্থাৎ পূর্ব-বাঙলার জন্য নির্ধারিত ১৬২ আসনের ১৬০টি পেল আওয়ামীলীগ। অপর দু'টি আসনের একজন পি.ডি. পি-র নুরুল আমিন এবং অপরজন নির্দল সদস্য ত্রিদিব রায়। পশ্চিম পাকিস্তানে ১৩৮টি আসনের ৮১টি পেল ভুট্টোর পিপলস পার্টি। অন্যান্য দলের মধ্যে কাউন্সিল মুসলিমলীগ পায় ৭টি, কায়ুমলীগ পায় ৯টি, ওয়ালি ন্যাপ ৫টি, জামাতে ইসলাম ৪টি, জমিয়ত-ই-ওলেমা ৭টি, মারকাজি ওলামা ৭টি, স্বতন্ত্র ৭টি। এই সাতটি স্বতন্ত্র আসনই উপজাতীয় এলাকার।

নির্বাচনে পূর্ববাঙলায় আওয়ামীলীগ এবং পশ্চিমপাকিস্তানে পিপিপি যে বেশি আসন পাবে, সে-ব্যাপার বোঝা গিয়েছিল আগেই। কিন্তু পূর্ববাঙলায় ন্যাপ (রুশপন্থী) যে এরকমভাবে পরাজিত হবে ভাবতে পারে নি কেউ। অন্তত কুমিল্লা থেকে ন্যাপনেতা মুজাফ্‌ফর আহম্মদ, বরিশাল থেকে মহিউদ্দীন পরাজিত হ'বেন এটা ছিল সকলের কল্পনারও অতীত। কেন তারা পরাজিত হ'লেন? তাঁরাও তো জনদরদী নেতা। কারণ মূলত দুটো: প্রথমত, '৬৯-এর গণআন্দোলন ক'রেছিলেন ছাত্র-ইউনিয়ন এবং ন্যাপ। কিন্তু কিছুদিন বাদেই আন্দোলনের গতি গেল পাল্টে। ছাত্রলীগ-নেতা তোফায়েল আহমদ তখন ডাকসুর ভি. পি। তাই গণ-আন্দোলনের পরিচালনা ক্রমে তাদের হাতে চলে যায়। তখন শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে জনতা উদ্বেল হ'য়ে উঠেছিল। দলমত নির্বিশেষে দাবি জানাচ্ছিল, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নাও। মুজিবের জনপ্রিয়তা তখন হুহু ক'রে বেড়ে গেল। মুজিবের

ছয়-দফাও তার জন্য অনেকটা দায়ী। দ্বিতীয়ত, ন্যাপ নির্বাচনে নামবে কি নামবে না করে দীর্ঘ সময় হেলায় কাটিয়েছে। ততদিনে আওয়ামী লীগ নিজের প্রভাব বিস্তার ক'রে ফেলেছে। তাছাড়া আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পর শেখ মুজিবকে জনসাধারণ তাদের যোগ্যতম মুখপাত্র রূপে মনে মনে নির্বাচিত ক'রে নিয়েছিল আগেই। শেখ মুজিবের বাঙালীপ্রীতিও সাধারণের হৃদয়ে সাড়া জাগিয়েছিল খুব।

বাঙলার মানুষ 'ইসলাম বিপন্ন' আর 'সংহতির' ধুঁয়ার ফাঁদে পা দিতে নারাজ। তাই পূর্ববাঙলায় সাম্প্রদায়িক দলগুলির ওই হাল হ'য়েছে।

গোড়ায় ভুট্টোও বললেন, শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ নেই। তিনি ঢাকায় এসে শেখ সাহেবের সঙ্গে আলোচনাও ক'রলেন। শেখসাহেব জানালেন, তাঁর দল ছয়-দফার ওপর জনগণের রায় চেয়েছিলেন, জনগণ ছয়-দফার পক্ষেই তাঁদের রায় দিয়েছে। এখন তাঁর পক্ষে ছয়দফা থেকে পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

ভুট্টো চেয়েছিলেন, *ছয়-দফার অন্তত দুটি দফা—কর-ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক বাণিজ্য কেন্দ্রের হাতে থাকুক।

---

* ছয়দফা: ১. পাকিস্তানের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং পার্লামেণ্টারী হওয়া চাই এবং সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইনসভা নির্বাচিত হবে।

২. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা এবং বৈদেশিক নীতি পরিচালনা এই দু'টি কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

৩. পাকিস্তানের দুইখণ্ডের মুদ্রা পৃথক্ হবে এবং একখণ্ডের মুদ্রা অন্যখণ্ডের মুদ্রার সঙ্গে পরিবর্তন করার সহজ ব্যবস্থা রাখতে হবে। যদি ইহা সম্ভব না হয়, তবে বিকল্প হিসাবে পাকিস্তানে একই ধরনের মুদ্রা প্রচলন ক'রে পূর্বখণ্ড থেকে পশ্চিমখণ্ডে যাতে মূলধন পাচার করা সম্ভব না হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

না হ'লে 'স্ট্রং সেণ্টার' নাকি আর 'স্ট্রং' থাকবে না। ইত্তেফাকে এই 'স্ট্রং সেণ্টার' সম্পর্কে মোল্লা দোপেয়েজা ব্যঙ্গ ক'রে বলেছেন: পশ্চিম-পাকিস্তানবাসীগণ মহেঞ্জোদড়ো হরপ্পায় গান্ধার প্রাক্ মুসলিম দেব-দেবীবহুল সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুমহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার ব'লে বুক ফুলিয়ে সোচ্চার দাবি ক'রতে পারলেও, এমন কি এ-দাবি বিশ্বের দরবারে পুঁথি-পুস্তক লিখে উপস্থিত ক'রলেও, আমরা একমাত্র খান জাহান আলী খান মসজিদ, গৌর পাণ্ডুয়া, এবং মহাস্থানগড়ের মুসলিম কীর্তি-কলাপ ছাড়া অন্য কিছুর ঐতিহ্য স্বীকার ক'রে নিতে পারি না। কেননা পশ্চিম-পাকিস্তানী মাত্রেই মজবুত মুসলমান, তাদের প্রত্যেকটি মানুষের চেহারা, নমুনা এবং হৃদয়ে ইসলামী আয়াত সমূহ (নিদর্শন) জ্বলজ্বল জ্বলছে। কিন্তু আমরা প্রাক্ মুসলিম যুগের ময়নামতী, মহাস্থান গড়, লক্ষণাবতী, বিক্রমপুর প্রভৃতির ঐতিহ্য খুঁজলে নির্ঘাত মুসলমানিত্ব থেকে খারিজ হ'য়ে যেতে পারি। কেননা, আমরা মজবুত স্নায়ু, মজবুত দেহ এবং মজবুত ঈমানের লোক নই। হ'লে মীর-জাফর আলী খানসাহেব আমাদের মধ্যে জন্মাতেন না।

অবশ্য তাই বলে মনে ক'রবেন না, বিধর্মী ইংরেজ বা শিখদের সঙ্গে প্রকাশ্য বা গোপন সহযোগিতা করা মাত্রই গোনাহ্। মজবুত লোকেরাও তা ক'রতে পারে, কেননা, গান্ধারা, মহেঞ্জোদড়ো হরাপ্পা, টাক্সিলা প্রভৃতি প্রাচীন ঐতিহ্যের যারা উত্তরাধিকারী তাদের দেহ

---

৪. কর স্থাপন এবং অর্থ আদায় করার ক্ষমতা অঙ্গরাজ্যগুলোকে দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে তার কার্য পরিচালনার জন্যে রাজ্য সরকারগুলি প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করবে।

৫. বৈদেশিক মুদ্রা সম্পর্কে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পৃথক্ হিসাব রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় মুদ্রা পাকিস্তানের দুই খণ্ড সমান হারে বা অন্য কোনো নীতি অনুযায়ী প্রদান ক'রবে।

এবং ঈমান দুই-ই মজবুত বিধায় জাহেরি বাতেনি কোনো গোনাহ্‌ই তানাদিগকে স্পর্শ ক'রতে পারে না। এবং যেহেতু ওনারা স্ট্রং, সুতরাং সবকিছু স্ট্রং করার উপদেশ-নির্দেশ সুপারিশের জন্মগত অধিকারও ওনাদের। এবং যে-সমস্ত বেওকুফ ওনাদের উপদেশ নির্দেশ মানতে দ্বিধা করে বা ওনাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে তাদের ঈমান দৃঢ় এবং পাকাপোক্ত করার জন্য নির্দ্বিধায় 'স্ট্রং' ব্যবস্থাগ্রহণের অধিকারও ওনাদের জন্মগত।

সুতরাং আমাদের অতীন্দ্রিয় ওনাদের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজনীতিক আগায়-পাছায় খান আর্থাৎ কি না খানে খানম উপাধিধারী কাইয়ুম খান, আলী জনাব রাহ্‌মাতুসল্লল পাকিস্তান মওদুদী (এই খেতাবটি সম্প্রতি তিনি জনৈক পূর্ববঙ্গীয় শিষ্যের কাছ থেকে পেয়েছেন), প্রমুখ সম্প্রতি 'স্ট্রং সেণ্টার' এবং 'স্ট্রং ইসলামী' শাসনতন্ত্র স্থাপন ও গঠনের যে নসিহত যন্ত্রতন্ত্র ক'রছেন তা ওনারা ওনাদের অধিকারের বলেই ক'রছেন। বঙ্গসন্তানগণের মনে ওনাদের এই অধিকার সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না—মনোকষ্টের কারণ হওয়া তো দূরের কথা। 'বলং বলং বাহু বলং—তার উপরে কোন বল নাই।' মৃগপ্রাণ বঙ্গবাসী হয়তো বল বলতে স্নেহবল, মায়ার বল, প্রেমের বল, সখ্য-বন্ধুত্বের বল, এক ও অভিন্ন জাতীয়তার বল, প্রীতি ও ভালোবাসার বল, সকলে সমান মর্যাদা ও সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগের বল ইত্যাদি বহুপ্রকার আত্মিক বলের বিষয় ভাবতে পারেন। কিন্তু এসব বল ধরা-ছোঁয়া যায় না। বল প্রমাণের একমাত্র শারীরিক নিদর্শন শারীরিক বলের কোনো

---

৬. দেশরক্ষার ব্যাপারে পূর্বপাকিস্তানের স্ব-নির্ভরতা আনতে হবে। পূর্বখণ্ডে অস্ত্র-উৎপাদনের একটি কারখানা এবং সামরিক শিক্ষা প্রদানের জন্য একটি শিক্ষায়তন গড়ে তুলতে হবে। কেন্দ্রীয় নৌ-বাহিনীর প্রধান দপ্তর পূর্বপাকিস্তানে রাখা চাই।

আমেজ এসব বোধের মধ্যে নেই। সকলেই যদি সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ ক'রবে তাহ'লে আশরাফ-আতরাফ, রাজা-প্রজা শাসক-শাসিত, উত্তমর্ণ-অধমর্ণ, শিক্ষিত-মূর্খ এবং জালেম-মজলুমের খসুসীয়ত (বৈশিষ্ট্য) রাখা যাবে কেমন ক'রে? এবং খসুসীয়ত রক্ষিত না হ'লে দুনিয়াভী জীবনে নিজেদের জাহির করার সুযোগ ধনী ব্যক্তিগণ পাবেন কোথায়? তাছাড়া পাহাড় না থেকে সারা পৃথিবীময় থাকত যদি খালি বালুচর তাহ'লে পৃথিবীকে স্থির রাখার জন্য খুঁটির কাজ করতো কারা? পর্বত আছে বলেই তো পৃথিবী মজবুত। সংহতি হবে বালুতে বালুতে এবং পাহাড়ে পাহাড়ে, তবেই না দেশ হবে সত্যিকারের মজবুত। বালু পাহাড়কে হটাতে চাইলে বালুও থাকবে না, পাহাড়ও থাকবে না—হবে বালিয়াড়ি এবং আপনারা জানেন বালিয়াড়ি সামান্য বাতাসেই উড়ে বেড়ায়, স্থানচ্যুত হয়। দৃঢ়তার পক্ষে এটা অত্যন্ত খতরনাক।

কাইয়ুম খান, মওদুদী, প্রমুখ পাকিস্তানের থাম্বা বীর মোজাহেদ সাহেবান তাই, স্ট্রং ইসলামী শাসনতন্ত্রের বজরিয়ায় 'স্ট্রং সেণ্টার' স্থাপনের অছিয়ত ক'রছেন। 'স্ট্রং সেণ্টার' হবে পাকিস্তানের পর্বত, মানে খুঁটি। এবং যেহেতু স্ট্রেংথ অর্থাৎ মজবুতির নিদর্শন পাহাড়-পর্বত সমস্তই পশ্চিম-পাকিস্তানে এবং মজবুত দেহধারী ও মজবুত ঈমানদার বক্তিগণ সকলেই সেই অঞ্চলেই বাস করেন, সুতরাং 'স্ট্রং সেণ্টার' বা শক্তকেন্দ্রের হেডকোয়ারটার অবশ্যই পশ্চিম-পাকিস্তানে অবস্থান ক'রবে। বঙ্গবাসী যদি বলে, মানলাম 'স্ট্রং সেণ্টার', কিন্তু স্ট্রং সেণ্টারটি তার সমস্ত সৈন্য-সামন্ত, আমলা-ফৈলা এবং কলকারখানাসমেত পূর্ববঙ্গে তুলে নিয়ে আসুন—স্ট্রং সেণ্টার হোক ঢাকায়, তাহ'লে তারা অবশ্যই নিন্দনীয়—যে-ক্ষেত্রে তাদিগকে লজিষ্টিকম্ জ্ঞানহীন বিবেচনা করা হবে—এমন কি রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে অপরাধী রূপেও গণ্য করা হতে পারে।

বুজদিল। কৃশকায় খর্বকায় তদ্ভব তৎসম শব্দ সমন্বয়ে গঠিত বাংলা ভাষী 'স্ট্রং সেণ্টার' কখনো নিজেদের বুকে ধারণ ক'রতে পারবে না। স্ট্রেনথ্ অর্থাৎ বলের জ্যোতি তাদিগকে তুর পাহাড়ে পরিণত ক'রবে।'

দুই অঞ্চলের অস্বাভাবিক ভৌগোলিক অবস্থানের কারণ দেখিয়েই ভুট্টোসাহেব 'স্ট্রং সেণ্টারের' দাবি ক'রে চলেছেন, সেই ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষিতেই পূর্ববঙ্গ পূর্ণস্বায়ত্তশাসন দাবি ক'রছে। দেখা গেছে, পূর্ববাঙলার সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজনের দিনে ১২শ মাইল দূরের 'স্ট্রং সেণ্টার' কোনো কাজেই আসছে না। যেমন, পূর্ববঙ্গের দক্ষিণ-উপকূলে সাম্প্রতিক জলোচ্ছাসে যখন লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেল, আরও বহুলক্ষ আর্ত মানুষের হাহাকারে সন্দীপ, হাতিয়া, ভোলার দ্বীপ হাহাকারে ভরে উঠল, আশ্রয়, পানীয় এবং খাদ্যের ব্যাপারে তখনও পিণ্ডির কর্তাদের টনক নড়ল না। তাদের কাছ থেকে পূর্ববাঙলার মানুষ কোনো সাহায্যই পেল না। তাহ'লে কোন্ প্রয়োজন এই 'স্ট্রং সেণ্টার'? পূর্ববাঙলার মানুষ নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ক'রতে চান, চান পশ্চিমা শোষক ও শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে পরিত্রাণ। তাই ছয়-দফা দাবি তাদের আদায় করতেই হবে—প্রয়োজন হ'লে রক্তের বিনিময়েও তা ক'রতে হবে। তাই ভুট্টোর কথা মেনে নিতে পারেন না মুজিব। ছয়-দফার প্রশ্নে আপোস করার কোনো অধিকারও আর তাঁর নেই। নির্বাচনের পরে ছয়-দফা জনগণের সম্পত্তি হ'য়ে গেছে। আওয়ামীলীগকে তারা ছয়-দফার ভিত্তিতেই ভোট দিয়েছে।

ভুট্টো ঢাকায় শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা শেষ ক'রে পশ্চিম-পাকিস্তানে ফিরে গিয়েই আবোল-তাবোল বকা শুরু ক'রলেন। কখনও বললেন, তিনি অপজিশানে বসবেন। কখনো বললেন, তিনি

কিছুতেই পাঁচ বছরের জন্য অপজিশনে বসবার ভাগ্য মেনে নিতে পারেন না। এবং তার সাথে যোগ ক'রলেন, ওসব মেজরিটি-ফেজরিটি আমি বুঝি না। ক্ষমতার সমান ভাগ আমি চাই। শেখ মুজিব পূর্ববাঙলার গরিষ্ঠ দল, আমিও তো পশ্চিম-পাকিস্তানের।

ঢাকা

'ক'　　　　　　　　　　　　　　　　২৪ জানুয়ারি,

ঘুম ভাঙতেই টেবিলের ওপর দেখলাম 'জনতা' এসে গেছে। বাইরে তখনো হাল্‌কা কুয়াসা। কুয়াসার আস্তরণ ভেদ ক'রে ভোরের আলো তখন সবে ফুটি-ফুটি ক'রছে। শালটা গায়ে চড়িয়ে 'জনতা'টা হাতে তুলে নিলাম। প্রথমেই চোখে পড়ল, আশ্চর্য সুন্দর এক কবিতা :

দেখলাম কণ্ঠে তাদের মরণ-জয়ী শপথ
হাতে অগ্নিমশাল
বিপ্লবী বজ্রমুঠিতে বিদ্রোহের পতাকা।
পুলিশ আর ফৌজের সশস্ত্র ব্যারিকেড ভেদ ক'রে
এগিয়ে চললো সে অশান্ত মিছিল—
ছোপ ছোপ রক্তের আঁখর এঁকে প্রতিটি পথের বাঁকে
দেখলাম সেই মিছিলের বিপ্লবী নায়কে
আসাদ-রুস্তম-মনির-মতিয়ার
কচি কচি সোনার বোল, সূর্যমুখী ফুল আমার স্বদেশ মাতৃকার।
দেখলাম বিশে জানুয়ারি আমার দেশমায়ের নয়নের মণি
আমাদের বুকের রক্তে লিখা হ'লো বিপ্লবের নয়া ইতিহাস।
তারপর চলল শুধু রক্ত দেওয়ার পালা
তাই একে একে আরও দেখলাম—
অনেক তাজা তাজা সূর্যমুখী ফুলের বুক চিরে রক্ত ঝরল অঢেল।
রাজপথ সিক্ত হ'লো চাপ চাপ লাল খুনে।

ওরা শহীদ হ'লো,
ওরা লুটিয়ে পড়ল, ঘুমিয়ে পড়লো মা জন্মভূমির কোলে।

তারপর হে আমার স্বদেশ,
রক্তের আঁখরে লেখা হ'লো বিদ্রোহের নয়া ইতিহাস,

শোনো শোনো, হে আমার স্বদেশ,
তোমার নরম মাটিতে, তোমার সবুজ ঘাসের বুকে
কান পেতে আজও আমি শুনতে পাই
আসাদ-রুস্তম-মনির-মতিয়ার-জোহা-জহুরুল
এবং তোমার আরো শত সোনার ছেলের অতৃপ্ত আত্মার
অগ্নিঝরা বিদ্রোহী শপথ।
আমি তাই শান্তির অঞ্জন দু'চোখে মেখে ঘুমুতে পারি না মোটে,'

ঠিক যেন আমার মনের কথা। পড়তে পড়তে শরীর বার বার রোমাঞ্চিত হ'চ্ছে। আরও আছে শোন্।
'আমি কঠিন শপথে বুক বেঁধে
আবার ঘোষণা ক'রতে বাধ্য হই জীবনের উদ্দাম প্রত্যয়:
সংগ্রাম সংগ্রাম—চলবে সে দুর্বার।
কেননা,
ঘন আঁধারের যবনিকা এখনো হয়নি বিদীর্ণ
ডাকিনী-যোগিনী-নাগিনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাস
এখনও বিষাইছে বায়ু এদেশের;
এবং আমার স্বদেশ-জননী
আমার কোটি কোটি নিপীড়িত ভাই-বোন
জালেমের জুলুমের রাহুগ্রাস হ'তে
আজও হয়নি মুক্ত, হয়নি স্বাধীন—
এবং পৃথিবী এখনো নতুন ছন্দে হয়নি মধুর।'

কবি আমার সশ্রদ্ধ সালাম নাও। আজকের দিনে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর কথা তুমি ছাড়া আর-কেউ এমন ক'রে, সমস্ত হৃদয়কে মথিত ক'রে বলতে পারত না।

'ক', আজকের দিনটির কথা তোর মনে পড়ে? মনে পড়ে উনসত্তরের এমনি এক শীত-ঋতুতে কিশোর মতিয়ুর আয়ুবের বুলেটের মুখে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল ঢাকার রাজপথে?'

শাহাবউদ্দীনের চিঠিটা পড়তে পড়তে দৃষ্টি ফিরে গেল অতীতে, আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল দুবছর আগেকার বিক্ষুব্ধ ঢাকা এবং সংগ্রামী পূর্ববাঙলার পথ-প্রান্তর।

১৭ জানুয়ারি।

শহরে একশ চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা হ'য়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শ'য়ে শ'য়ে হেলমেটধারী পুলিশ লাঠি আর রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে গেছে দশটা বাজতে-না-বাজতেই। তবু ছাত্ররা দমল না। আজ পথে পথে বেরিয়ে পড়ার ডাক এসেছে। একে একে তাঁরা জমায়েত হ'লো এসে কলাভবনের প্রাঙ্গণে। সভা হ'লো ডাকসুর ভি. পি. তোফায়েলের নেতৃত্বে।

সভায় ঠিক হ'লো ছাত্রছাত্রীরা পুলিশের কর্ডন ভাঙবে, চুয়াল্লিশ ধারা অমান্য করবে। বাঙলা মায়ের দামাল ছেলে-মেয়েরা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়বার দুর্মদ আহ্বানে ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্রুদ্ধ সাগরের সগর্জন তরঙ্গের মতো। ওদের বুকের ভাষা: মরতে আমরা পাই না ভয়, কে আমাদের রুখবে জয়। এবং মুখের ভাষা: মানি না মানি না—চুয়াল্লিশধারা মানি না। কণ্ঠচিরে শ্লোগান দিতে দিতে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে ছুটে চলল গেটের দিকে। বেলা তখন বারোটা বেজে কুড়ি মিনিট।

মুহুর্মুহু টিয়ারগ্যাস শেল ফাটল। ধোঁয়ায় ভরে গেল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গেটের সামনেটা। ভয়ার্ত পাখিরা গাছের শান্ত নীড়

ছেড়ে আকাশে ডানা মেলল। ঢিল আর টিয়ারগ্যাসে চলল লড়াই। তারই মধ্যে দলে দলে ছাত্রছাত্রী পুলিশের কর্ডন ভেঙে বেরিয়ে গেল, এগিয়ে চলল নীলক্ষেত্রের দিকে। একজনকে পুলিশ টেনে হিঁচড়ে ট্রাকে তুলছে তো দশজন কর্ডন ভেদ ক'রে এগিয়ে যাচ্ছে। ছাত্র আর পুলিশে এমনি খণ্ড লড়াই চলল একটানা প্রায় দু'ঘণ্টা। তারপর পুলিশ চলে গেল। পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২৫ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার ক'রেছে। ওদিকে দেড়টার সময় বায়তুল মোকাররমের কাছে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম-পরিষদের নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার ক'রল পুলিশ।

প্রতিবাদে ছাত্রনেতারা পরদিন ধর্মঘট ডাকল। সেদিন ঢাকার প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার ছেলেমেয়ে বাঁধ-ভাঙা স্রোতের মতো এসে কলাভবনের প্রাঙ্গণ ভরিয়ে তুলল। তাদের চোখে আগুন, আগুন তাদের বুকে। আগের দিনের মতোই পুলিশ কর্ডন ক'রেছে ইউনিভারসিটির বাইরে। তবে অন্য দিনের তুলনায় সংখ্যা আজ অনেক বেশি।

ঠিক আগের দিনের মতোই বরকত-সালামের নামে শপথ নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। এগিয়ে গেল বেঅনেকট আর বুলেটের সামনে। *১১ দফার দাবিতে আজ এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে মেতেছে ছাত্রছাত্রীরা। তারা জানে রমনায় কালো পথ আবার লাল হবে, ঝরবে লাল শিমুল-পলাশ। কিন্তু তারা এও জানে তাদের জয় হবেই হবে।

---

*১১-দফা: (১) শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার দাবি (২) প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার, বাক্, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতাদান (৩) ফেডারেল সরকারকে দেশরক্ষা, মুদ্রা ও বৈদেশিক নীতি পরিচালনার ক্ষমতা দান, অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দান, পূর্বপাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিমপাকিস্তানে পাচার রোধের জন্য দুই অঞ্চলে দুটি রিজার্ভ ব্যাংক

আগের দিনের মতোই ছাত্ররা আবার পুলিশ কর্ডন ভাঙল। পূর্বপাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি আ. স. ম. আবছুর রবের মাথায় পুলিশের লাঠির আঘাত লেগেছে। রক্ত ঝরছে তাঁর মাথা থেকে। লাঠির ঘায়ে ছাত্র ইউনিয়নের মুকুলেরও মাথা ফাটল। পূর্বপাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ-সম্পাদক খালেদ মহম্মদ টিয়ারগ্যাসে অসুস্থ হ'য়ে পড়ল।

ছাত্ররা তবু দমল না। এগিয়ে চলল; এগিয়ে চলল অধ্যাপক আতিকুজ্জামান খান আর দীপা দত্তের নেতৃত্বে।

এগিয়ে আসে সামসুদ্দোহা আর আবছুল মান্নান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে তখন একটা বাস জ্বলছে। দাউ দাউ জ্বলছে বাসটা। গোলাগোলা আগুন উপরে উঠে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে উঠছে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। গাছের লাল শিমুলগুলো কালো হ'য়ে গেল। আগুনের আঁচে পলাশগুলো দেখাচ্ছে আরও উজ্জ্বল—গাঢ় রক্তের মতো উজ্জ্বল।

সারা রমনা রণাঙ্গণে পরিণত হ'য়ে গেছে। হলে হলে পুলিশ আর ই. পি. আরের লোকের ঢুকে নৃশংস অত্যাচার চালাল ছাত্রদের ওপর।

সেদিন পুলিশ ছ'শো রাউণ্ডের মতো গুলি ছুড়েছে। ৩০ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার ক'রেছে।

স্থাপন, পূর্বপাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি, সকল প্রকার ট্যাক্স, কর, খাজনা, করধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারকে প্রদান, ফেডারেল সরকারকে কর ধার্য করার ক্ষমতা না দেওয়া, ফেডারেশনে প্রতিটি রাষ্ট্রের বহিঃবাণিজ্যের পৃথক হিসাব রাখা, বর্হিবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা—অঙ্গরাষ্ট্রগুলির মধ্যে বরাদ্দ করা, ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলি সমান অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হার অনুযায়ী প্রদান, দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমদানী-রপ্তানী, ব্যবসা

২০ জানুয়ারি ছাত্রদের হরতাল ডাকা হ'লো। ২৬ জানুয়ারি হবে সর্বাত্মক হরতাল।

২৪ জনুয়ারি।

বাঙলামায়ের লক্ষ লক্ষ দামাল ছেলেমেয়ের মতো সেদিন মতিঝিলের কিশোর মতিয়ুরের প্রাণও বোধ হয় আনচান ক'রে উঠেছিল। ঘর ছেড়ে সেও বেরিয়ে এসেছিল রাস্তায়, কিন্তু জালিম আয়ুবের বুলেট ওর নরম বুক বিদ্ধ ক'রে দিল। বুকের তাজা রক্তে ওর কচি দেহ ভেসে গেল।

এগারোটা পাঁচ মিনিটের সময় সেক্রেটারিয়েটের ভিতর থেকে পুলিশ অতর্কিতে গুলি ছুড়ল। অনেক গুলি। লুটিয়ে পড়ল আটটি দেহ। তাদের তিনজন শহীদ হ'লো। মতিয়ুর তাদের সকলের কনিষ্ঠ। আহা, কী কচি মুখ! রক্তের ছোপ লাগানো একটি মুখ আজও ভাসে চোখের সামনে।

ওদের নিহত হবার খবর ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ল ঢাকার অলি-গলিতে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক এসে জমল নিউ সেক্রেটারিয়েটের সামনে। তারপর পল্টনে সভা হ'লো তাদের দেহ সামনে রেখে। হাজার হাজার মানুষ দু'হাত ভরে তাদের শ্রদ্ধা আর ভালবাসার ফুল ছড়িয়ে দিল মতিয়ুর, রুস্তম ওদের দেহের

বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রপ্তানী করার অধিকার অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর হাতে ন্যস্ত করা। পূর্বপাকিস্তানের নৌ-বাহিনীর সদর-দফতর স্থাপনের দাবিও রয়েছে।

(৪) এক ইউনিট বাতিল। [হয়ে গেছে]

(৫) ব্যাংক বীমাকোম্পানী ও বৃহৎশিল্প জাতীয়করণ।

(৬) কৃষকের ওপর হতে খাজনা ও ট্যাক্সের কর হ্রাস করা।

(৭) শ্রমিকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দান।

(৮) বন্যা-নিয়ন্ত্রণ।

ওপর। ওদের রক্তাক্ত লাশ নিয়ে সেখান থেকে মিছিল বেরুল —তিন মাইল দীর্ঘ মিছিল।

শামসুর রহমান পরে যা লিখেছিলেন সে-দিনকার মিছিলের সকলের মনেই বোধহয় এই কথাটিই গুঞ্জন ক'রছিল:

এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়?
তেমন যোগ্য সমাধি কই?
মৃত্তিকা বলো, পর্বত বলো,
অথবা সুনীল সাগর জল
সবকিছু ছেঁদো, তুচ্ছ শুধুই।
তাই তো রাখি না এ লাশ আজ
মাটিতে, পাহাড়ে কিংবা সাগরে—
হৃদয়ে হৃদয়ে দিয়েছি ঠাঁই।

যে দেখল, সেই কাঁদল। ওমন কচি ছেলেকে কেউ মারতে পারে। পাষাণ, ওরা পাষাণ! ওরা ঘাতক!

ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরল সেই মিছিল। মিছিল এসে থামল শেষে ইকবাল হলে যার নতুন নাম জহুরুল হক হল। গায়েবী জানাজা হ'লো। দু'চোখে জমাট অশ্রু নিয়ে মতিয়ুরের বাবা বললেন, 'এ-মিছিলের শেষ নেই, এ-রক্তেরও শেষ নেই। যত দিন না এই সমাজব্যবস্থার বদল হয়, যতদিন না দেশের মেহনতী মানুষের মুক্তি আসে, তত দিন পর্যন্ত আরও হাজার হাজার মতিয়ুর, আসাদ, মনু মিয়া, রুস্তম, আনোয়ার প্রাণ দিয়ে যাবে।'

---

(৯) জরুরী আইনসহ সকল নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার।

(১০) বিভিন্ন সামরিক চুক্তি বাতিল, জোট নিরপেক্ষ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গঠন।

(১১) রাজবন্দীদের মুক্তিদান এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার।

সামান্য একজন ছা-পোষা কেরানীর মুখেও এমন ভাষা থাকতে পারে কে ভেবে ছিল।

মতিয়ুররা সাত ভাই। মতিয়ুরের মা পড়শিদের প্রায়ই বলতেন, আমার মতিয়ুর বড় হলে আমাদের আর দুঃখ থাকবে না। ও লেখাপড়ায় খুব ভালো।

মতিয়ুরের মৃত্যুর কথা শুনে কাঁদতে কাঁদতে তার মা সেরাতুন্নেছা শুধু একটা কথাই বললেন, ছেলেটার জন্ম-মৃত্যু একই দিনে হ'লো। ওগো, ও যে শুক্রবার, এই দুপুরবেলায়ই জন্মেছিল।

মনে পড়ল আজও তো শুক্রবার।

ইকবাল হল থেকে বেরিয়ে আমি, শাহাবুদ্দিন, আতোয়ার, আলো, প্রজেশ নীরবে হাঁটতে থাকলাম।

সকলেরই চোখে জল, বুকে জ্বালা।

আমার তখন কেবলই মনে হচ্ছিল —

> ওরা 'সবারে ডেকে গেল শিকল ঝঙ্কারে
> চরণে দলে গেল মরণ শঙ্কারে।'

পুলিশের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ছাত্ররা ৬ জানুয়ারি সারাদেশের মানুষকে হরতাল পালনের ডাক দিল।

দেশের মানুষ সাড়া দিল ছাত্রদের সে ডাকে। অচল হ'লো সবকিছু। পরিস্থিতির আরও অবনতি হওয়ায় সেনাবাহিনী তলব করা হ'লো। ২৫ তারিখে কার্ফুজারি হ'লো। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে গুলি চলল। কাওরানবাজারে চার মাসের শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন জনৈকা মা। ঘরের বেড়া ফুটো করে গুলি লাগল তার গায়ে। সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু। নারায়ণগঞ্জ তুলারাম কলেজের ছাত্ররা জমায়েত হ'য়েছিল কলেজ-প্রাঙ্গণে গায়েবী জানাজায়। চললো টিয়ারগ্যাস, লাঠিচার্জ, ধরপাকড়। গ্রেপ্তার হ'লেন চারজন অধ্যাপক আর পাঁচজন

ছাত্র। গুলি চলল আদমজী নগরে। ছু'জন মারা গেল ঘটনাস্থলেই। গুলি চলল তেজগাঁ ফার্মগেটের কাছে। পলিটেকনিকের ছাত্র লতিফ প্রাণ দিল সেই গুলিতে। চারদিক থেকে আসতে লাগল, বিক্ষোভ, গুলিচালনা আর হত্যার খবর। খবরের পর খবর। উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে গেছি এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায়। মোড়ে মোড়ে স্টেনগান আর রাইফেল হাতে টহল দিচ্ছে সৈন্যরা। থম্‌থম্ ক'রছে সারাটা শহর।

২৭ জানুয়ারি।

একটানা কার্ফু চলেছে ছু'দিন ধরে। নারায়ণগঞ্জের ঘরে ঘরে বিক্ষুব্ধ মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ার জন্য টগবগ ক'রছে। শহরের রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারিভ্যান টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। থমথমে ভাবটা আরও ভয়াল হ'য়ে উঠল সেদিন। গুলি চলল আদমজীর শিল্পাঞ্চলে। চোদ্দ জন বুলেট বিদ্ধ হ'লো। তার মধ্যে ঘটনাস্থলেই মারা গেল ছু'জন শ্রমিক। খবর এলো ময়মনসিং থেকে। শোক মিছিলের ওপর কাঁদানেগ্যাস প্রয়োগ ক'রেছে। গ্রেপ্তার ক'রেছে ৮৪ জনকে। হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে ময়মনসিংহ নাসিরাবাদ কলেজের ছাত্র মনসুর প্রাণ দিয়েছে। তাঁরই লাশ দাফন ক'রতে যাচ্ছিল হাজার হাজার ছাত্র আর সাধারণ মানুষ।

তুরখাম থেকে টেকনাফ—সারা পাকিস্তান জ্বলে উঠেছে বিক্ষোভের আগুন। জেগে উঠেছে পূর্ব-পশ্চিম ছুই অঞ্চলের সংগ্রামী জনতা। করাচি লাহোর ঢাকা নারায়ণগঞ্জ পেশোয়ার গুজরানওয়ালা একের পর এক বড়ো বড়ো শহরগুলোতে সেনাবাহিনী তলব ক'রতে হ'য়েছে। জারি ক'রতে হ'য়েছে কার্ফু। চলেছে গুলি। শহীদের রক্ত থেকে রোজ জন্ম নিচ্ছে লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী জনতা; প্রাণ দিতে এগিয়ে আসছে; ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ছে রাস্তায়। দিন দিন বেড়ে চলল নিহত আর আহতের তালিকা। একের পর

এক গ্রেপ্তার হ'তে থাকলেন নেতারা। গ্রেপ্তার হ'লেন পূর্বপাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমদ, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন, সহ-সভাপতি দেওয়ান মাহবুব আলী আরো অনেকে। রোজ শ'য়ে শ'য়ে নেতা গ্রেপ্তার হ'চ্ছেন বরিশাল, কুমিল্লা, ময়মনসিং, কুষ্টিয়া, পাবনা, সিলেট সর্বত্র।

সাড়ে এগারো কোটি বিক্ষুব্ধ মানুষের ক্রুদ্ধ আওয়াজে আয়ুবের কায়েমী তখত টলে উঠেছে। দিন দিন মিইয়ে আসছে আয়ুব-মোনেমের কণ্ঠস্বর।

২৮ জানুয়ারি। ন'টার আগেই বেরিয়ে পড়লাম কুর্মিটোলার সিগন্যাল মেসের উদ্দেশ্যে। ওখানে চলছে বিখ্যাত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা। মামলার প্রধান আসামী শেখ মুজিবুর রহমান। সারা দেশের মানুষের দৃষ্টি ওই মামলার দিকে। ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হ'য়েছেন সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এস. এ রহমান। অপর দুইজন সদস্য হ'লেন হাইকোর্টের বিচারপতি এস. আর খান এবং মখসুমুল হাকিম। ১৯ জুন মামলার প্রথম শুনানী শুরু হয়। তারপর মাসখানেকের ওপর মুলতবী থেকে মামলার দ্বিতীয় দফা শুনানী শুরু হয় ২৯ জুলাই থেকে। শেখ মুজিব ছাড়াও তিনজন সি. এস. পি. অফিসার ফজলুল রহমান, রুহুল কুদ্দুস খান, এম. সামসুর রহমান, একজন মেজর এবং ৩ জন ক্যাপ্টেন সহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে সরকারপক্ষ থেকে অভিযোগ আনা হ'য়েছিল যে, তাঁরা 'কমাণ্ডো স্টাইলে' হঠাৎ ক'রে কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগারগুলো দখলে এনে পূর্ব-পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন ক'রে স্বাধীনতা ঘোষণার চেষ্টায় ছিলেন। এমন কি তাঁরা ভারতের

সঙ্গে এক ভদ্রলোকের চুক্তিও ক'রেছিলেন যে, জল বা আকাশপথে ভারত পশ্চিমপাকিস্তান থেকে সৈন্য পাঠাতে বাধা দেবে এবং তাঁদের অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্য ক'রবে। তাঁরা আরও ঠিক ক'রেছিলেন যে, পশ্চিমপাকিস্তানে বসবাসরত পূর্বপাকিস্তানী-দের ফেরত না দিলে পশ্চিমপাকিস্তানীদের পূর্বপাকিস্তানে 'জিম্মি' হিসেবে আটকে রাখবেন। নির্যাতন ক'রে ভয়ভীতি দেখিয়ে, চাকরি-বাকরি প্রমোশন লাইসেন্স প্রভৃতির লোভ দেখিয়ে সরকার ২৩২ জন সাক্ষী দাঁড় করিয়েছেন। অমানুষিক নির্যাতন ক'রে সাক্ষী দাঁড় করিয়েছেন কামালউদ্দীন আহমদকে। রাজসাক্ষী হওয়ায় অভিযুক্তের এগারোজনকে ক্ষমা ক'রেছিলেন সরকার। অত্যাচারে অত্যাচারে জর্জরিত হ'য়ে কামালউদ্দীনসাহেব শেষে রাজী হ'য়েছিলেন সাক্ষ্য দিতে। কিন্তু সরকারপক্ষের প্রধানকৌঁশুলি মঞ্জুর কাদের স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে, কামালউদ্দীন এইভাবে মামলাটা কেচে দেবেন। স্টেটমেণ্টে যা বলেছিলেন, সাক্ষ্য দিতে এসে তিনি বললেন তার উল্টো।

ট্রাইবুনালকে শোনালেন তিনি আয়ুবশাহীর অমানুষিক নির্যাতনের এক চাঞ্চল্যকর কাহিনী: বাড়ি থেকে ধরে প্রথমে আমাকে সিদ্ধেশ্বরীতে সিটি এস-বি অফিসে নিয়ে যায়। সেখানে 'আই-বি'র ডি.-এস. পি. এম. ইয়াসিন এবং ইন্সপেক্টর কে, আহমদ প্রায় সারারাত ধরে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। বলে, আমি নাকি সশস্ত্রবিপ্লব ঘটিয়ে পূর্বপাকিস্তানকে পশ্চিমপাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে জড়িত আছি। জোর ক'রে আমার কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা ক'রল। ইন্সপেক্টর কে. আহমদ আমায় বলল, 'ভারতের সঙ্গে যোগসাজসে তোমরা পূর্বপাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে যারা জড়িত আছ সকলের নাম লিখে স্টেটমেণ্ট ক'রে দিচ্ছি, সই ক'রে দিতে হবে।'

আমি বললাম, 'আমি এ-সবের কিছুই জানি না, আপনারা আমায় অযথা হয়রানি ক'রছেন।'

কাজ হাসিল হ'লো না দেখে ক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়লো সে। ঘাড়ে ধরে মাটিতে ফেলে দিলো আমায়। পিঠে রুল দিয়ে কয়েকটা ঘা দিল। পরদিন আমাকে মিলিটারির হাতে তুলে দিল। মিলিটারি-ক্যাম্পে ক্যাপ্টেন সুলতান এবং নৌবাহিনীর লেফটেন্তান্ট শরীফ দিনের পর দিন আমাকে জেরা ক'রে ভয় দেখিয়ে অত্যাচার ক'রে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা ক'রলো। ওদের ১ ডিগ্রী থেকে ৫ ডিগ্রী পর্যন্ত নির্যাতন চালালো আমার ওপর।

একদিন তো কানের কাছে এমন প্রচণ্ড চড় কষাল যে, এখনও কানে ভালো শুনতে পাই না। কয়েকটা নখে সূঁই ঢুকিয়ে দিয়েছে কতবার, রুল দিয়ে মেরে মেরে আঙুল ভেঙে দিয়েছে। আঙুলগুলো আর নাড়াতে পারি না। এতেও ওদের নির্যাতন শেষ হ'লো না। আমাকে উলঙ্গ ক'রে গুহ্যদ্বারে ব্যাটন ঢুকিয়ে জোর করিয়ে হাঁটিয়েছে। সে যে কী অসহ্য যন্ত্রণা কী বলব। কতোবার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছি।

আর একদিন মাটিতে শুইয়ে হাত-পা বেঁধে উপুড় করে ফেলে রুল দিয়ে গুহ্যদ্বারে ঢুকিয়ে দিল বরফের কতোগুলো টুকরো। তারপর চলল জিজ্ঞাসাবাদ: 'বল্, তোদের নেতা কে? মুজিবুর রহমান? ইণ্ডিয়ায় কার সঙ্গে যোগসাজস আছে? ঢাকার ইণ্ডিয়ান হাইকমিশন অফিসে কার সঙ্গে যোগাযোগ আছে? কোথায় কোথায় তাদের ঘাঁটি আছে বল্।'

আমি জ্ঞান হারাতে হারাতে শুধু বলতে পেরেছি, 'আমি এ-সবের কিছুই জানি না।'

দিনের পর দিন ওরা নিত্য নতুন নির্যাতন চালিয়েছে আমার ওপর। খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ছুরি দিয়ে শরীরের নানান স্থান কেচে

কেচে, কাটা জায়গায় নুন আর লঙ্কার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে। আমার যন্ত্রণাবিকৃত মুখ দেখে ওখানকার মিলিটারি অফিসাররা পৈশাচিক হাসিতে ভরিয়ে তুলেছে টর্চার-চেম্বার।

আর-একবার খুঁটির সঙ্গে বেঁধে শরীর থেকে কাপড় খুলে নিল একজন সেপাই। তারপর আমার পুরুষাঙ্গ ধরে প্রবলভাবে টানা হেঁচড়া ক'রতে লাগল। অণ্ডকোষ দু'টি দু'হাতে রগড়ে পিষে দিতে লাগল। অসহ্য যন্ত্রণায় বিকট চীৎকার ক'রে উঠলাম। মাথা ঘুরে গেল। চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার হ'য়ে গেল। জ্ঞান ফিরে এলে দেখলাম, স্যাঁতসেঁতে একটা মেঝেতে পড়ে রয়েছি। শরীরে কোনো কাপড় নেই। সারা শরীর তখনো অসহ্য ব্যথায় টনটন ক'রছে।

ওই দিনই কয়েক ঘণ্টা বাদে আবার আমায় স্বীকারোক্তি দেওয়ার জন্য নিয়ে গেল। ঢ্যাঙ্গা একজন মিলিটারি অফিসার বলল, 'ভারতের সঙ্গে যোগসাজসে তোমরা পূর্বপাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র ক'রছিলে। তোমাদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। আর আমরা যাদের কথা বলব তারাও তোমার সঙ্গে ছিল—এই স্বীকারোক্তি লিখে দিতে হবে। স্বীকারোক্তি লিখে দিলে তোমাকে ক্ষমা করা হবে। ভেবে দেখ। আর যদি স্টেটমেণ্ট না দাও, তোমার স্ত্রী আর মেয়েদের এনে তোমার সামনে উলঙ্গ ক'রে চাবুক দিয়ে শরীর কেটে কেটে লঙ্কা-নুন ছিটিয়ে দেব। তোমার রূপসী স্ত্রীকে তোমার চোখের সামনে ন্যাংটো ক'রে সাধারণ সৈন্যদের লেলিয়ে দেব তাকে ধর্ষণ করার জন্যে।'

অফিসারটির কথা শুনে অদূরে দাঁড়ানো সৈন্যটির চোখ দু'টি লোভে জ্বলজ্বল ক'রে উঠল। জিভটা দিয়ে ঠোঁটটা একবার চেটে নিল।

এত অত্যাচারেও আমাকে দিয়ে যা করাতে পারে নি, এই একটি কথাতেই তা পারল। খুকী, আর আমার ছেলেমেয়েদের ওপর নির্যাতনের কথা ভেবে শিউরে উঠলাম। ওদের উপর বিন্দু-

মাত্র নির্যাতন আমি সইতে পারব না। কিছুতেই না। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'না না, ওদের কিছু ক'রবেন না, আমি স্টেটমেণ্ট দেব। আপনারা যা বলবেন তাই লিখে দেব।'

১৫ ডিসেম্বর শুক্রবার ওরা আমাকে দিয়ে একটি দলিলে সই করিয়ে নিল। কয়েক সীট কাগজে আমার ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ নিলো। দিনের পর দিন অমানুষিক নির্যাতনে আমার মাথা তখন শূন্য, হতচেতন অবস্থা। কী ক'রল, কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিন্তু বাধাও দিলাম না। সে শক্তিও ছিল না। তারপর কতকগুলো 'মিষ্টি কালোজাম' ও একগ্লাস ওষুধ খেতে বলল, ওষুধটার স্বাদ অনেকটা 'রামের' মতো। তারপর আমার হাতে তুলে দিল কাগজ আর কলম। একজন একটা টাইপ-করা কাগজ দেখে দেখে ডিকটেশন দিচ্ছিলেন, আমাকে তা লিখে যেতে বলা হ'লো। সেনা, নৌ এবং বিমান-বাহিনীর অনেকের, কয়েকজন সি. এস. পি অফিসার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীর নাম লিখতে বলল। পঞ্চাশ জনের মতো হবে বোধ হয়। তারপর একটা জবানবন্দী লিখতে বলল। নির্যাতনের ভয়ে তা লিখে দিতে, তারপর থেকে আমার ওপর আর অত্যাচার করে নি।'

শুধু তাই নয় সনাক্ত ক'রতে পারলেন না কামালউদ্দীন আহমদ তাঁদের, যাঁদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলে স্টেটমেণ্টে লিখে দিয়েছিলেন নিজের অজান্তে। উত্তেজিত মঞ্জুর কাদেরের অনুরোধে ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা ক'রলেন। পরদিন আবার শুরু হ'লো তাঁকে জেরা করা।

আসামীপক্ষের প্রধানকৌসুলি সালাম খান উঠে দাঁড়াতেই বিচার-কক্ষে স্তব্ধতা নেমে এলো. কামালউদ্দীনসাহেবকে তিনি জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'আচ্ছা, মিঃ আহমদ, কাল যখন আপনি বলছিলেন বন্দী থাকাকালে আপনার ওপর নৃশংস অত্যাচার করা

হ'য়েছে, আপনি কি সেই সময় ভয়ে ভয়ে বলেছিলেন যে আদালতে তো মাত্র দশ মিনিট, তারপর আমার কী হবে?'

কামালউদ্দীন আহমদ বলেন, 'জী হ্যাঁ। যে-অমানুষিক নির্যাতন আমার ওপর ক'রেছে আবার ক'রলে আমি আর বাঁচব না। ভয়ে আমি মন খুলে সাক্ষ্য দিতে পারছি না।'

এই সময় সালাম খান ট্রাইবুনালের বিচারপতির দিকে তাকালেন। তাঁর চাহনির অর্থ, দেখুন স্যার উনি কী বলছেন। তারপর সহযোগী একজন এ্যাডভোকেটের কাছ থেকে একটা চিরকুট নিয়ে বললেন, 'জীপটা কি আপনার কেনা?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা কোন্ মডেলের?'

'সিকসটি ফাইভ মডেলের। একজন লোকের কাছ থেকে গাড়িটি আমার কেনা।'

'আচ্ছা, আপনি বলেছেন জীপটি কিছুদিন কে. জি. আহমদও ব্যবহার ক'রেছেন। তাঁর সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?'

'প্রথম দিকে তিন মাস তিনি আমাদের সেলভেশন কোম্পানীর চেয়ারম্যান ছিলেন।'

'রক্সি হোটেল থেকে শেখ মুজিবুররহমানের বাড়ির দূরত্ব কতখানি?'

'রক্সি হোটেল মীরপুর রোডে। মুজিবর সাহেবের বাসা :আমি চিনি না এবং তাঁকে আমি কখনো দেখিও নি।'

'বেশ! বেশ! একটু থেমে সালাম খান হঠাৎ জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'আপনি বলেছেন করাচিতে আপনি যখন সুলতানউদ্দীনের বাসায় ছিলেন তখন একদিন সেখানে একটা সভা হ'য়েছিল। নক শুনে দরজা খুলে দাঁড়াতে আপনি কাকে দেখেছিলেন।'

'লেফটেন্যান্ট মোজাম্মল হোসেনকে।'

'কতক্ষণ চলেছিল সভা?'

'তিনটে থেকে চারটে। চারটের পর আমি বেরিয়ে যাই।'

'আচ্ছা, কাল আপনি বলেছিলেন ক্যান্টনমেণ্ট মেসে মেজর হাসান এবং মেজর শরীফ প্রায়ই আপনার কাছে যেতেন।'

'হ্যাঁ।'

'তাদের কেউ কি আপনাকে জবানবন্দী দিতে বলেছিলেন?

'লেফটেন্যাণ্ট শরীফ বলেছিলেন।'

'জবানবন্দী দিতে রাজী করানোর জন্য কি সে-সময় আপনার ওপর মারধোর ক'রেছিল কেউ?'

'হ্যাঁ, ক'রেছিল। আমি জবানবন্দী দিতে রাজী না দেখে দরজার কাছ থেকে একজন সুবেদার বলে উঠল, স্যার ভালোমুখে কাজ হবে না, ভালো ক'রে 'বানালে' সুড়সুড় ক'রে সুবোধ ছেলের মতো কথা শুনবে। পরে জেনেছিলাম, তার নাম শফি। অত্যাচার সহ্য ক'রতে না পেরে বিশেষ ক'রে আমার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের উপর অত্যাচারের ভয় যখন তারা দেখাল, তখন আমি স্টেটমেণ্ট দিতে রাজী হ'লাম। লেফটেন্যাণ্ট শরীফ কতকগুলো পয়েণ্টের উপর স্টেটমেণ্ট লিখতে বললেন।'

সালাম খান জানতে চাইলেন, পয়েণ্টগুলো কী?

'শেখ মুজিবুর রহমান এবং এ. এফ. রহমান সি. এস. পিকে আমার বন্ধু বলে উল্লেখ ক'রতে বলে স্টেটমেণ্টে।'

'আর কারু নাম লিখতে বলেছিলেন?'

'বলেছিলেন। আমাকে জানানো হয়, আমি যেন বলি চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী আমার বিশেষ পরিচিত এবং তিনি একদিন আমার বাসায় জেনারেল আজম খানের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ ক'রেছিলেন। লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জম হোসেন এবং আরও কয়েকজনকে আমি চিনি—তাও লিখতে বললেন। তারা আমায় জানাল, সনাক্তকরণে যাতে অসুবিধা না হয় তার

জন্যে আগে থেকেই সকলের ফটো দেখিয়ে রাখবে আমায়। মেজর হাসান জবানবন্দী বলে গিয়েছিলেন, আর আমি লিখে গেছি।'

'মেজর হাসান কি এখন আদালতে আছেন?'

মিস্টার আহমদ আদালতকক্ষের সকল মানুষের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তাঁর দৃষ্টির অনুসরণে দর্শকদেরও চোখ ঘুরছিল। সকলে মেজর হাসানকে দেখবার জন্যে উৎসুক হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু কামালউদ্দীনসাহেব ধীরকণ্ঠে বললেন, 'না, তিনি এখন এখানে নেই।'

'মাই লর্ড, আমার আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই।' বলে বসে পড়লেন সালাম খান।

উঠে দাঁড়ালেন সরকারপক্ষের প্রধান-কৌঁসুলি মঞ্জুর কাদের। আগে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তিনি। মঞ্জুর কাদের কামালউদ্দীনসাহেবকে জেরা ক'রতে উদ্যত হ'তেই বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলি মিস্টার টমাস উইলিয়াম আপত্তি তুললেন। বললেন, 'যে-সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা করা হ'য়েছে, তাকে জেরা করার অধিকার তাঁর নেই। ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান মিস্টার উইলিয়ামের বক্তব্য নাকচ ক'রে মঞ্জুর কাদেরকে জেরা ক'রতে অনুমতি দিলেন। মঞ্জুর কাদের সুরু ক'রলেন তাঁর সওয়াল। বললেন, 'আপনার ওপর নির্যাতন সম্পর্কে আপনি আপনার স্ত্রীর কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা হাইকোর্টে রীট আবেদন করার আগে না পরে ক'রেছিলেন।'

'আগে লেখা।'

'৫ জন ডাক্তারের বোর্ড আপনার ওপর নির্যাতন হ'য়েছে—এমন রিপোর্ট দিয়েছেন কি?'

'তারা কী রায় দিয়েছেন আমি দেখি নি।'

'ডাক্তাররা কি আপনার শরীরের ওপর আঘাতের চিহ্ন দেখেছেন ?'

আমি তাঁদেরকে দেহে আঘাতের চিহ্ন দেখিয়েছি। তাঁরা কী দেখেছেন আমি জানি না। তাঁদের একজন আমায় বলেছেন, 'দেখুন আমাদের হাত-পা বাঁধা, চোখ থেকেও নেই।'

জেরা শেষ হ'লে কামালউদ্দীনসাহেব ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যানকে বললেন, 'স্যার এখন আমার নিরাপত্তার কী হবে ? সামরিক কর্তৃপক্ষের হেফাজতে আমার যে-সব জিনিসপত্র রয়েছে, তা ফেরত পাব কি ?'

বিচারপতি এস. এ. রহমান বললেন, 'আপনি এখন মুক্ত মানুষ। আপনার জিনিসপত্র সবই ফিরিয়ে দেওয়া হবে।'

কামালউদ্দীনসাহেব দর্শকদের মধ্যে এসে বসলেন। তাঁর স্ত্রী, দুই মেয়ে কণা ও রত্না এবং আত্মীয়স্বজনরাও এসেছেন দেখলাম।

এরপর সুরু হয় সাক্ষী আমির হোসেনের জেরা। আমির হোসেন প্রাক্তন কর্পোরাল। বয়স চৌত্রিশ। ফরিদপুরের লোক। ১৯৫২ সালের ৭ জুলাই থেকে '৬৪ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান বিমান-বাহিনীর বৈমানিক ছিলেন। বিমান-বাহিনী থেকে রিটায়ার্ড করার পর করাচির কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিসে যোগ দেন।

সরকারপক্ষের প্রধান-কৌঁসুলি মঞ্জুর কাদেরের জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি বললেন, 'ঠিক তারিখটা মনে নেই, তবে '৬৪ সালের শেষাশেষি কিংবা '৬৫ সালের গোড়ার দিকে স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। ওই সময় লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন আহমদের সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়। লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেনেও সঙ্গেও তখনই আমার পরিচয়। পরিচয়ের কয়েকদিন পরেই স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও সুলতানউদ্দীন আহমদ আমাকে

প্রায়ই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের কথা বলতেন। বলতেন, পূর্বপাকিস্তান আলাদা না হ'লে পূর্বপাকিস্তানীরা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে। আমি তাঁর কথা আজগুবি বলে উড়িয়ে দিতে তিনি একদিন আমায় লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসায় নিয়ে গেলেন। তাঁর বাসাটা ছিল কে. ডি. এ. স্কীম ১-এ। লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম আমায় তাঁদের কথায় আস্থা রাখতে বললেন। বললেন, আমিও দলে আছি। আমাদেরকে সশস্ত্রবিপ্লব ক'রে 'স্বাধীন পূর্ববাঙলা' গঠন ক'রতে হবে। তিনি বললেন, অনেক প্রাক্তন এবং বর্তমানে কার্যরত সৈনিককে নিয়ে 'স্বাধীন পূর্ববাঙলার' জন্য সশস্ত্র-বাহিনী গঠন করা হ'য়েছে। লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেমের কথায় অভিভূত হ'য়ে আমিও ওই দলে যোগ দিই। প্রায়ই লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেমের বাসায় গোপন বৈঠক বসত। আমিও যেতাম সেখানে। সেই সব বৈঠকে সুলতানউদ্দীন আহমদ এবং স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ছাড়াও অনেকেই উপস্থিত থাকতেন। তাদের একজনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তিনি গেরিলাবাহিনীর হাবিলদার দলিলউদ্দীন। ১৯৬৫ সালের অগস্ট মাসের গোড়ার দিকে সুলতানউদ্দীন আহমদ ঢাকায় চলে গিয়েছিলেন আন্দোলনের ব্যাপারে। সেখান থেকে আমাকে তিনি করাচিতে তিনখানি চিঠি লেখেন।'

এই সময় সরকারপক্ষ থেকে চিঠিগুলি দাখিল করা হ'লো। চিঠিগুলোতে Ext. PW 31, Ext. PW 32, PW 33 নম্বর দেওয়া। তারপর মঞ্জুর কাদের জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'আচ্ছা মিঃ হোসেন, চিঠিতে কী লেখা ছিল আপনার মনে আছে কি ?'

'হুবহু মনে নেই। তবে বিষয়বস্তু মনে আছে। সুলতানউদ্দীন আহমদ জানান যে, তিনি ওখানে ছাত্র-সমাজের সঙ্গে মিশে 'স্বাধীন পূর্ববাঙলা'র জন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আরও জানান যে, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানেরও সে-সময় পূর্বপাকিস্তানে যাওয়ার

কথা ছিল। স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান না যাওয়ায় আন্দোলনের ক্ষতি হ'চ্ছে। আমি যেন তাঁর সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে তাঁকে জানাই। তিনি অপর এক পত্রে জানান, শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকার বাসায় একটা গুরুত্বপূর্ণ সভা হবে। আমি যেন সে-সভায় যোগদানের জন্য প্রস্তুত থাকি। প্রথম পত্রের উল্টো পিঠে বাম কোণে লেখা ছিল, আমি যেন তাঁর কাছে 'c/o মোহাম্মদ মতিউর রহমান (এস) 'পথিকাবাস' ৪নং মোমেনপুর, ঢাকা—৫।' এই ঠিকানায় চিঠি লিখি। ব্রাকেটের 'এস' বর্ণটি অবশ্যই লিখতে বলেছিলেন। 'এস' মানে সুলতানউদ্দীন। চিঠিতে আমায় তিনি ঠিকানা লিখতে বারণ ক'রেছিলেন।

তৃতীয় পত্রে সুলতানউদ্দীন আমায় জানালেন, তিনি একটি গোপন প্রেস পেয়েছেন, আন্দোলনের জন্য সেখানে প্রচারপত্র ছাপা যাবে। আরও জানালেন, আমি কয়েকদিনের মধ্যে টাকা পাঠাচ্ছি, লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদকে নিয়ে যেন আমি টাকা পাওয়া মাত্র ঢাকায় চলে যাই।'

এই সময় বিবাদীপক্ষের খানবাহাদুর ইসমাঈল সাক্ষীর কথায় আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'সাক্ষী চিঠিগুলোর অনুব·· নিজের খেয়াল-খুশিমতো ক'রছেন।'

ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান তাঁর আপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে আমির হোসেনকে তাঁর সাক্ষ্য চালিয়ে যেতে বললেন।

আমির হোসেন আবার বলতে সুরু ক'রলেন, 'ওই চিঠির সঙ্গে আমি একটি লিফলেটও পাই। কয়েকদিনের মধ্যে আমি ১৫০০শ টাকাও পেয়ে যাই। নূর-মোহাম্মদও তাঁর টাকা পেয়েছিলেন। ১৯৬৫ সালের ২৮ অগস্ট সন্ধ্যার ফ্লাইটে আমি ঢাকা গেলাম। নূর-মোহম্মদ আমার সঙ্গে যেতে পারেন নি, তাঁর কমাণ্ডিং অফিসার তখনো তাঁর ছুটি মঞ্জুর করেন নি।

বিমান থেকে নেমে দেখি, সুলতানউদ্দীন আহমদ এবং স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান আমাকে নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা জীপ নিয়ে এসেছিলেন। জীপে ধানমণ্ডীর ২নং রোডে একটা বাড়িতে আমায় নিয়ে গেলেন তাঁরা। বাড়িটার ফটকে নাম লেখা ছিল 'আলেয়া'। পরে জানতে পারি লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেমের আত্মীয় ডাক্তার খালেকের বাড়ি ওটা। ওখান থেকে যাই ঢাকা হোটেলে। সেখানে আগে থেকেই সীট রিজার্ভ ক'রে রাখা ছিল। সুলতানউদ্দীন, এবং স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানও আমার সঙ্গে ঢাকা হোটেলে উঠলেন।

পরদিন হোটেল থেকে আগের দিনের ওই জীপটাতেই ডাক্তার খালেকের বাসায় গেলাম। জীপের নম্বরটা এখন আর আমার ঠিক মনে নেই। যতদূর মনে পড়ে তার প্রথম দু'টি সংখ্যা ছিল '৩৯'।

বেলা তিনটের সময় শেখ মুজিবুর রহমানের বাসায় গিয়ে পৌঁছলাম। আমরা চার জনেই গিয়েছিলাম তাঁর বাসায়। শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের দোতলার একটা ঘরে নিয়ে বসালেন। সেই বৈঠকে রুহুল কুদ্দুস সি. এস. পি-ও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে আলোচনার সূত্রপাত করেন মোয়াজ্জেম হোসেন। তিনি বললেন, আমাদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আজ বিরাট একটি সশস্ত্র-বাহিনী গড়ে উঠেছে 'স্বাধীন-পূর্ববাঙলা' গঠনের জন্যে। আমাদের আরও অস্ত্র এবং অর্থের প্রয়োজন।

এর পর মুজিব সাহেব কথা বললেন, আমি ভারত থেকে অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টায় আছি। শীগ্‌গীরই সব ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে। আপাতত আমি আপনাদের কয়েকটা কিস্তিতে ১ লক্ষ ৪ হাজার টাকা দিচ্ছি। প্রয়োজনে আপনারা টাকাটা আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবেন। আপনারা সশস্ত্র-বাহিনী গঠনের কাজ চালিয়ে যান, টাকার জন্য চিন্তা নেই।

বৈঠক শেষে আবার ঢাকা হোটেলে ফিরে এলাম। লেফ-টেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম পরদিন করাচি চলে গেলেন। ১ সেপ্টেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান হোটেল খরচার জন্য আমার হাতে সাতশ' টাকা দিলেন।

একটা ট্যাক্সি ক'রে ৯ সেপ্টেম্বর আবার মুজিব সাহেবের বাসায় গেলাম।'

মঞ্জুর কাদের জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'ট্যাক্সিটা কার ছিল?'

সাক্ষীর উত্তর: জনাব কে. জি. আহমদের।

তারপর আগের প্রসঙ্গে ফিরে আমির হোসেন বললেন, 'সেদিন শেখ মুজিবুর রহমান আমার হাতে ৪ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। তা থেকে হোটেল খরচা বাবদ স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান এবং সুলতানউদ্দীন আহমদকে কিছু টাকা দিই। ইতিমধ্যে ভারত-পাকিস্তানে যুদ্ধ বেঁধে গেল। ওই মাসের শেষাশেষি আমি করাচি চলে এলাম। করাচিতে গিয়ে সব টাকা আমি মোয়াজ্জেম হোসেনকে দিলাম। নভেম্বর মাসে করাচিতে আমার সঙ্গে কে. জি. আহমদ এবং ফজলুল রহমান সি. এস. পি-এর সঙ্গে পরিচয় হয়। ফজলুল রহমান সাহেব তখন করাচিতে অর্থ-দপ্তরের ডেপুটি সেকরেটারি। নভেম্বর মাসে আমাদের দুটো বৈঠক হয়। প্রথম বৈঠকটি হ'য়েছিল লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেমের বাড়িতে। ওই সভায় প্রাক্তন করপোরাল সামাদও উপস্থিত ছিলেন। সামাদ '৫৩ সাল থেকেই আমার সহকর্মী। সভায় মোয়াজ্জেম হোসেন বললেন, অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি ত্বরান্বিত করার জন্য তিনি শীগ্‌গীরই করপোরাল সামাদকে পূর্বপাকিস্তানে পাঠাবেন।

তিনি আরও বললেন, আমাদের এখন কয়েকটা 'ট্রানজিসটার ট্রান্সমিটার' প্রয়োজন। সেই সময় ফজলুল রহমান সাহেব জানালেন, লণ্ডন থেকে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই ট্রানজিসটার

ট্র্যান্সমিটার আনাবার ব্যবস্থা ক'রছেন। তাঁর ছোটো ভাই লণ্ডনে পড়াশুনা ক'রতে গেছে। সে-ই সব ব্যবস্থা ক'রবে ওখানে।

দু-তিনদিন বাদে 'ইলাকা হাউসে' দ্বিতীয় বৈঠক বসল। সেই বৈঠকে লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম জানালেন, পূর্বপাকিস্তানে দ্রুত আন্দোলনের কাজ চলছে। স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান এবং সুলতান-উদ্দীন আহমদ পুরোদমে সেখানে কাজ ক'রে যাচ্ছেন। তিনি জানান, পূর্বপাকিস্তানে পার্টির সদস্য-সংখ্যা এখন তিন হাজার ছাড়িয়ে গেছে। '৬৫ সালে নভেম্বরে আমিও স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে দু'-একটা চিঠি পাই।'

এই সময় মঞ্জুর কাদের উঠে সাক্ষীর হাতে একটা চিঠি দিয়ে বললেন, 'দেখুন দেখি, এটাই কি সেই চিঠি?

আমির হোসেন সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে আবার বলতে সুরু করেন, 'চিঠির শেষে অপর পত্রখানিতে 'M' লেখা ছিল। 'এম' মানে স্টয়ার্ড মুজিবুর রহমান। এরপর সাক্ষী একটা চিঠি পড়ে শোনাতে থাকেন: মাই ডিয়ার হোসেনসাব, আমার সালাম নেবেন। করাচি থেকে দু'খানি চিঠি পেয়ে সব জানলাম।

বড়ো ভাইয়া লিখেছেন, তিনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হ'য়েছেন। বড়ো ভাইয়াকে বলবেন, এখানকার বড়ো ভাইয়ার নির্দেশমতোই আমি চিঠিখানি লিখেছি।'

ট্র্যাইবুনালের চেয়ারম্যান এস. এ. রহমান জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'বড়ো ভাইয়া কে?'

'বড়ো ভাইয়া হ'লো করাচিতে লেফটেন্যানট মোয়াজ্জেম এবং ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমান। আমির হোসেন আবার চিঠির বাকি অংশ পড়তে লাগলেন: আমরা ওষুধের বন্দোবস্ত ক'রে ফেলেছি। লোকের অভাবে পাঠাতে পারছি না।'

মঞ্জুর কাদের জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'ওষুধ মানে কী?'

সাক্ষী জানালেন, ওষুধ বলতে এখানে টাকা-পয়সার কথা বোঝাচ্ছে। তারপর শেষাংশ পড়লেন তিনি: কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ক্রমে ক্রমে ঘরের মিস্ত্রিরা ভালো কাজ ক'রছে।'

মঞ্জুর কাদের জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'ঘরের মিস্ত্রি কী?'

সাক্ষী: মানে দলের কর্মীদের কথা বলা হ'য়েছে এখানে। তারপর আমির হোসেন আদালতে বললেন, অস্ত্রসস্ত্র এবং সমর্থন লাভের জন্য ভারত, চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের কনস্যুলেট জেনারেলদের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে তাদের মনোভাব জেনে নেওয়ার জন্য আমার ওপর নির্দেশ আসে পূর্বপাকিস্তান থেকে।

মঞ্জুর কাদের সাক্ষীর হাতে একটা চিঠি দিয়ে পড়তে বললেন। আমির হোসেন চিঠিটা পড়তে সুরু ক'রলে হঠাৎ তাঁকে থামিয়ে চিঠিতে বর্ণিত 'রোগীর অবস্থা ভালো' কথাটার মানে কী জানতে চান তিনি।

আমির হোসেন বললেন, 'রোগী বলতে এখানে পূর্বপাকিস্তানকে বোঝান হ'য়েছে। চিঠিটা লিখেছিল স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান।'

সরকারপক্ষের প্রধান-কৌঁসুলি আর-একটি চি সাক্ষীর হাতে দিয়ে পড়তে বললেন। চিঠিটা লিখেছেন সুলতানউদ্দীন আহমদ।

সাক্ষী আমির হোসেন পড়তে সুরু ক'রলেন: প্রিয় আমির সাহেব, প্রীতি জানবেন। আপনি অনেক কিছু জানতে চেয়ে চিঠি লিখেছেন। সব কিছুর জবাব আপাতত দেওয়া সম্ভব নয়। আপনি তো ভালো ভাবেই আমাকে জানেন, নতুন ক'রে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই আশা করি। আমি কাজের লোক, কাজ ক'রতেই ভালোবাসি। আপনি জ্ঞানী লোক, বেশি বলার দরকার করে না। আপনি আমার টেলিগ্রাম পেয়েছেন কিনা জানাবেন। আপনি ঐ দেশের সঙ্গে তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে ফেলুন।'

বাদীপক্ষের কৌস্নুলির এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী জানান, 'ঐ দেশ' বলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস বুঝানো হ'য়েছে।'

সাক্ষী এর পর বলেন, 'আমি লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদের কাছ থেকেও দু'খানি চিঠি এবং ২২শ' টাকা পাই। চট্টগ্রাম থেকে আগত একটি বাণিজ্য-জাহাজের স্টুয়ার্ড সুলতানউদ্দীন আহমদ এবং স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের নাম ক'রে টাকাটা আমাকে দিয়ে যায়।

চেষ্টা-চরিত্তির ক'রে ১৯৬৬ সালের ফেবরুয়ারিতে বদলি হ'য়ে আমি পূর্বপাকিস্তানে এলাম। এখানে আসার পর লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে তিনখানা ডায়েরী দিয়ে ভিতরকার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ ক'রতে বললেন।'

এই সময় মঞ্জুর কাদের একটি ডায়েরী হাতে নিয়ে সাক্ষীকে বললেন, 'দেখুন দেখি এটা চিনতে পারেন কিনা?'

সাক্ষী বললেন, 'হ্যাঁ, ওই তিনটে ডায়েরীর একটা এটা। ডায়েরীর হাতের লেখা লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেনের। আগে থেকেই আমি তাঁর হাতের লেখার সঙ্গে পরিচিত। ডায়েরীতে একটি অস্ত্র-শস্ত্রের তালিকা ছিল আর দলের প্রধানদের কতগুলো কোড নাম। শেখ মুজিবর রহমানের ছদ্মনাম 'পরশ'; স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান—'মুরাদ'; লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন—'তুহিন'; লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন আহমদ—'কমল'; সি. এস. পি. এ. এফ. রহমানের ছদ্মনাম দেওয়া হ'য়েছে 'তুষার'; লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদের নাম 'সবুজ'; 'শেখর' হ'লো সি. এস. পি রুহুল কুদ্দুসের নাম আর আমার নাম দিয়েছিল 'উল্কা'।

ডায়েরীতে আরও নির্দেশ ছিল 'আমার বদলির জন্য "কে জি."র সঙ্গে ঢাকায় যোগাযোগ ক'রবেন। অর্থাৎ করাচি থেকে চট্টগ্রামে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বদলির জন্য যেন আমি ঢাকায় ন্যাশন্যাল শিপিং করপোরেশনের ডিরেক্টর কাজী গিয়াসউদ্দীনের

সঙ্গে দেখা করি। 'কে. জি.' কাজী গিয়াসউদ্দীনের সংক্ষিপ্ত নাম। অন্যান্য নির্দেশগুলি হ'লো: ভাড়ার ব্যবস্থা ক'রবেন; সামাদ আর দোহার চাকুরির ব্যবস্থা ক'রবেন; টাকা জোগাড় ক'রে পাঠাবেন, সুলতান ও মুজিবুরের সঙ্গে দেখা ক'রবেন; কে. জি.-র কাছ থেকে জীপ নেবেন।

মঞ্জুর কাদের বললেন, 'আমির সাহেব আপনি কি এই সব নির্দেশগুলোর অর্থ বুঝতে পেরেছিলেন? থাকলে একটু ব্যাখ্যা করুন।'

আমির হোসেন বললেন, 'হ্যাঁ, এ নিয়ে আগেই কিছু কিছু আলোচনা হ'য়েছিল। 'ভাড়ার ব্যবস্থা ক'রবেন' বলতে বুঝিয়ে ছিলেন ঢাকায় আমার থাকার জন্য এবং ভারত থেকে যে-সব অস্ত্র পাব তা রাখার জন্য আমি যেন একটা বাড়ি ভাড়া করি এবং তার প্রয়োজনীয় অর্থ শেখ মুজিবুর রহমান এবং আহমদ ফজলুল রহমানের কাছ থেকে নিয়ে নিই। সামাদ আগে ছিল কর্পোরাল আর দোহা ছিল এয়ারম্যান। বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে যোগ দিলে ওদের যেন আমি চাকুরির ব্যবস্থা করে দিই। তার পরের নির্দেশটিতে শেখ মুজিবুর রহমান অথবা অন্য কারু কাছ থেকে টাকা জোগাড় ক'রে পাঠাতে বলেছে। এর পরের নির্দেশটি তো স্পষ্টই। কে. জি. আহমদের কাছ থেকে জীপটা নিতে বলা হ'য়েছিল। গিয়ে শুনলাম ওটা কামালউদ্দীন আহমদের জীপ। তাঁর কাছে আমি আর জীপটি চাই নি।

মঞ্জুর কাদের বললেন, 'আচ্ছা, এই যে '৬৪ সালের ১৮ জানুয়ারি তারিখের ডায়েরীতে যে-সব নির্দেশ রয়েছে, . . কার হাতের লেখা আপনি চেনেন কি?'

সাক্ষী: হ্যাঁ, লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেমের। 'এতো তাড়াতাড়ি নয়,' এই শিরোনামায় তিনটে নির্দেশে তিনি বলেছিলেন, বিচ্ছিন্নতা-

বাদী আন্দোলনে যোগাযোগমন্ত্রী সবুরকে আনতে চেষ্টা ক'রতে; ভারত, চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ ক'রতে এবং মাল খালাসের ব্যবস্থা ক'রতে অর্থাৎ মুজিবুর যদি ভারত থেকে সমরাস্ত্র পায়, তাহ'লে সেগুলো খালাস ক'রে জায়গা মতো রাখতে বলেছিল। তার পরের পাতায় 'তথ্যের তালিকা' শিরোনামায় ছিল জেলা-ভিত্তিতে বিভিন্ন গ্রুপের কারখানা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিশদ বিবরণ, এই সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্তাদের বাসার ঠিকানা, স্কুল-কলেজের নাম-ঠিকানা, সমুদ্রগামী ও অভ্যন্তরীণ শিপিং কোম্পানীর মালিক এবং ডিরেক্টরদের নাম-ঠিকানা। জেলে আটক ব্যক্তিদের খালাস পাওয়ার সম্ভাব্য তালিকা, বিশ্বস্ত ও যোগ্য পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টদের তালিকা, দক্ষ সি. এস. পিদের নাম-ঠিকানা, রেলওয়েতে কর্মরত উচ্চপদস্থ বাঙালী অফিসারদের ঠিকানা, সাবেক সার্ভিসমেন এবং তাদের বর্তমান যোগ্যতার পরিচয়, বাস-ট্রাকের ঠিকানা এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর, বিশিষ্ট চিকিৎসক ও আইনজীবিদের নাম-ধাম। সব শেষে ঢাকা, কুমিল্লা ও যশোর ক্যাণ্টনমেণ্টের মানচিত্র জোগাড় ক'রতে নির্দেশ দিয়েছিল। সুবেদার আশরাফ আলী আমায় একটা ক্যাণ্টনমেণ্টের স্কেচ দিয়েছিল। সেটা কোন্ ক্যাণ্টনমেণ্টের আমি জানি না। স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান আমায় বলেছিলেন যে, তিনি এম. ই. এস-এর এস. ডি-ও. র কাছ থেকে তিনটি ক্যাণ্টনমেণ্টের মানচিত্র সংগ্রহ ক'রেছেন।

সরকারপক্ষের কৌঁসুলী মঞ্জুর কাদের বললেন, 'ডায়েরীর এক জায়গায় যে শপথের কথা রয়েছে তার মানে কী?'

রাজসাক্ষী আমির হোসেন বললেন, 'বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে নয়া যোগদানকারীদের শপথ নেওয়ার কথা বলা হ'য়েছে।'

আমির হোসেন একটু থামলেন। একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন আদালতকক্ষে। থম থম ক'রছে দর্শকদের মুখ। তারপর বিচার-

পতির দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলতে সুরু ক'রলেন, '১৯৬৬ সালের ২ ফেবরুয়ারি করাচি থেকে আমি ঢাকায় আসি। তখন ঢাকা হোটেলে উঠেছিলাম। ৫ ফেবরুয়ারি আমি স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করার জন্য ঢাকা থেকে করাচি যাই। সেখানে 'হোটেল মিশকা'য় উঠি। সেই হোটেলেই স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, সুলতানউদ্দীন আহমদ, এ. বি. খুরশিদ, খুদে অফিসার রহমান—এবং লেফটেন্যাণ্ট হক একে একে আমার সঙ্গে দেখা করেন। আমাদের গোপন অধিবেশন হয় 'মিশকা হোটেলে'র ৪নং রুমে। সেনাবাহিনীর যাঁদের সঙ্গে এ পর্যন্ত যোগাযোগ ক'রতে পেরেছেন এ. বি. খুরশিদ সেই বৈঠকে তাঁদের নামের একটা তালিকা দেন। সেখানে ঠিক হয় যে, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের কাজকর্ম বর্ষার সময় সুরু করা হবে। কারণ, বর্ষার সময় পূর্ববাঙলার অধিকাংশ জায়গা বন্যায় প্লাবিত হ'য়ে যায়। ফলে মিলিটারির যাতায়াত এখনকার মতো তখন অত সহজ সাধ্য হবে না।

৬ তারিখে ওই রুমেই আবার আমাদের বৈঠক বসে। সেদিনের সভায় মানিক চৌধুরী, বিধানচন্দ্র সেন এবং ইস্টবেঙ্গল রেজিমেণ্টের সুবেদার রাজ্জাকও ছিলেন। স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। ওই বৈঠকেই পার্টির কাজের জন্য মানিক চৌধুরী আমার হাতে তিন হাজার টাকা দিলেন।

৮ ফেবরুয়ারি আমি ঢাকা চলে আসি। এবার উঠলাম 'হোটেল আরজু'তে।'

এই সময় PW 3/32 চিহ্নিত একটি চিঠি সাক্ষীর হাতে তুলে দিয়ে মঞ্জুর কাদের বললেন, 'এ চিঠি কে কার কাছে লিখেছে ?'

'সাক্ষী 'আলো' লিখছে 'উল্কার' কাছে, অর্থাৎ লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম হোসেন চিঠিটা আমার কাছে লিখেছিলেন।'

তারপর মঞ্জুর কাদের সাক্ষীর কাছে চিঠিতে উল্লিখিত কয়েকটি সাঙ্কেতিক কথার ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন।

প্রশ্ন : চিঠিতে যে 'কনট্রাক্টরী ব্যবসার' উল্লেখ আছে সেটা কী ?

উত্তর : সেটা আন্দোলন।

প্রশ্ন : 'মায়ের অসুখের' অর্থ কী ?

উত্তর : পূর্বপাকিস্তানের অবস্থার কথা বলা হ'য়েছে।

প্রশ্ন : 'ডাক্তার' কে ? আর ওষুধ-পত্রই-বা কী ?

উত্তর : ডাক্তার শেখ মুজিবুর রহমান, ওষুধপত্র হ'লো অস্ত্রসস্ত্র।

মঞ্জুর কাদের বললেন, 'বেশ, এবারে তার পরের ঘটনা বলুন।'

'১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেনের কাছ থেকে একটি নির্দেশ আসে। এক্স করপোরাল সামাদকে আহমদ ফজলুল রহমানের কাছে নিয়ে গিয়ে যেন তাঁর চাকুরির ব্যবস্থা ক'রে দিই। আহমদ ফজলুল রহমান তাঁকে ধানমণ্ডীতে গ্রীন ভিউ পেট্রোলপাম্পে ম্যানেজারের চাকরি দিলেন। তাঁর কাজ হ'লো ভারতীয় দূতাবাসের কর্মচারি এবং আহমদ ফজলুল রহমানের মধ্যে যোগাযোগের এজেন্ট হিসেবে কাজ করা। পেট্রোলপাম্পটির মালিক ছিলেন মিসেস ফজলুল রহমান।

মার্চ মাসেই মহাখালী এয়ারপোর্টের কাছে এক স্থানে গোপন বৈঠক ডাকলাম। কর্পোরাল সামাদ, সুবেদার আশরাফ আলী খান, ই. পি. আর. টি. সির ক্লার্ক মুজিবুর রহমান, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ইউসুফ কম্পাউণ্ডার, ই. পি. আর. টি. সি-র সিকিউরিটি অফিসার রাজ্জাক, এডুকেশনাল ইন্সট্রাক্টর ফ্লাইট সার্জেন্ট হক-নওয়াজ, জি. টি. জেড. এ. চৌধুরী, ও সার্জেন্ট মিয়া।'

মঞ্জুর কাদের-এর কথায় সাক্ষী তাঁদের সনাক্তও ক'রলেন। তারপর বলেন, 'ওই সভায় আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং অগ্রগতি সম্পর্কেই প্রধানত আলোচনা করি।'

এই সময় বাদীপক্ষের প্রধান-কৌঁসুলী মঞ্জুরকাদের সাক্ষী আমির হোসেনের হাতে একটি দলিল তুলে দিলেন। ভালো ক'রে দেখে আমির হোসেন বললেন, 'এটা একটা ক্যান্টনমেণ্টের স্কেচ। এটা আমায় দিয়েছিলেন সুবেদার আশরাফ আলী।

১২ মার্চ মোয়াজ্জেম হোসেন ঢাকায় এলেন। সেদিনই সন্ধ্যেয় আওয়ামীলীগ-সম্পাদক তাজউদ্দীনের বাসভবনে এক বৈঠক হ'লো। আমরা তো ছিলামই, শেখ মুজিবুর রহমানও ছিলেন সেই বৈঠকে।'

মঞ্জুর কাদের জিজ্ঞাসা ক'রলেন, 'কী আলোচনা হ'য়েছিল সেই বৈঠকে?'

সাক্ষী: বৈঠকে লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম বললেন যে, আমরা সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর বহু লোককে আমাদের আদর্শে ও কর্মে উদ্বুদ্ধ ক'রতে পেরেছি। ভারতের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র পেলেই আমরা বিপ্লবের দিন ঠিক ক'রবো। পূর্ববাঙলার সাড়ে ছয় কোটি মানুষও আমাদের পিছনে আছে। শেখ মুজিবুর রহমান জানালেন, অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে শীগ্গীরই হাবিলদার দলিলউদ্দীন এবং জয়দেবপুর থেকে একজন ক্যাপ্টেনকে ভারত পাঠানো হবে। অস্ত্র পাওয়া মাত্র গেরিলা ট্রেনিং-এর কাজ সুরু হবে রাঙামাটি এবং চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকায়।'

বাদীপক্ষের কৌঁসুলীর জিজ্ঞাসা: সেই বৈঠকে কি তাজুদ্দীন-সাহেব উপস্থিত ছিলেন?

উত্তর: না।

এর পর সুরু হয় বিবাদীপক্ষের জেরা। মুজিবুর রহমানের সমর্থনকারী বিখ্যাত ব্রিটিশ আইনজীবি এবং শ্রমিকদলের সদস্য টমাস উইলিয়াম আমির হোসেন মিয়াকে ঘণ্টা আড়াই ধরে জেরা ক'রলেন।

টমাস ইউলিয়াম আমির হোসেনকে জিজ্ঞেস ক'রলেন নাটকীয় ভঙ্গীতে, 'মিয়া সাহেব আপনি বিয়ে ক'রেছেন?'

আমির হোসেন একটু হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, 'জী হ্যাঁ।'

প্রশ্ন : ছেলেপুলে কয়টি?

উত্তর : ছেলেপুলে হয় নি।

প্রশ্ন : করাচিতে আপনি কোথায় থাকতেন?

উত্তর : জাহাঙ্গীর রোডে।

প্রশ্ন : ঢাকায় আসার পর কোথায় ছিলেন?

উত্তর : ঢাকা হোটেলে— ৪ ফেবরুয়ারি পর্যন্ত আমি সেখানে ছিলাম। পরে আরজু হোটেল-এ ছিলাম।

প্রশ্ন : আরজু হোটেল থেকে উঠে কোথায় গিয়েছিলেন?

উত্তর : ১০৭ দীননাথ সেন রোডে—ভাড়া বাড়িতে গিয়ে উঠি।

প্রশ্ন : বাড়ির মালিকের নাম কী?

উত্তর : এ্যাসিসট্যাণ্ট সেসন জজ হারুন-অর-রশিদ।

প্রশ্ন : আগে তাকে চিনতেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আপনি দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন কবে?

উত্তর : এপ্রিলের শেষে অথবা মে-এর প্রথম সপ্তাহে।

মিস্টার উইলিয়াম বললেন, 'তার মানে, দীননাথ সেন রোডের বাসায় ওঠার কিছুদিন বাদেই।'

'হ্যাঁ।'

'দল ছাড়ায় লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম আপনাকে ভয় দেখান কি?'

'দেখিয়েছিলেন।'

'সে-অনুযায়ী কোনো ক্ষতি ক'রেছিলেন কী?'

'না।'

' এর পর মিস্টার উইলিয়াম পি. ডব্লিউ ৩।৫৯ চিহ্নিত একটি দলিল দেখিয়ে বললেন, 'এটা আপনি চিনতে পারেন কি? নিশ্চয়ই পারছেন। আপনাকে করাচিতে ডেকে পাঠানো হ'য়েছে। কিন্তু কেন?'

'জানি না।'

'আপনি কখন গ্রেপ্তার হ'য়েছিলেন?'

'ওই বছরই ১৩ ডিসেম্বর ঢাকা এয়ারপোর্টে নামতেই ছ'জন সাদাপোশাক-পরা পুলিশ আমাকে ধরে সেণ্ট্রাল জেলে নিয়ে গেল।'

'আপনি যে গ্রেপ্তার হবেন সেটা কি আগে থেকেই জানতেন।'

'না। তারপর সেণ্ট্রাল জেল থেকে রাজারবাগে নিয়ে তিন-চার ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রল।'

টমাস উইলিয়াম একটু কাছে এগিয়ে ঝুঁকে গলার স্বরটা নামিয়ে বললেন, 'মিয়া সাহেব, অত্যাচার হয় নি, কেবল চার-ঘণ্টার জেরায়ই কি আপনি বন্ধুদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন?'

আমির হোসেন একটু উত্তপ্ত স্বরে বলল, 'বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্নই উঠতে পারে না।'

'কোন্ পুলিশ অফিসার আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রেছিলেন?'

'ডি এস পি মান্নাফ ও আর দু'-একজন।'

'ডাইয়েরী দুটো আনবার চিরকুট কার হাতে দিয়েছিলেন?'

'মান্নাফসাহেবের হাতেই।'

'পরে যে-চিঠিগুলি দাখিল ক'রলেন সে-সময় চিঠিগুলির কথা বললেন না কেন?'

'মনে ছিল না।'

'চিঠিগুলো আপনি রেখে দিয়েছিলেন কেন? এসব চিঠি নিশ্চয় নষ্ট ক'রে ফেলা বিধেয়।'

আমির হোসেন এসময় একটু থতমত খেয়ে বলল, 'ভেবেছিলাম, বুড়ো বয়সে আত্মজীবনী লিখব। তখন কাজে লাগবে।'

'চিঠি এবং ডাইয়েরীগুলো পুলিশের হাতে পড়লে খুবই বিপদ হ'তে পারে জেনেও আত্মজীবনী লেখার জন্য তা রেখে দিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ।'

টমাস উইলিয়াম মৃদু হেসে বললেন, 'মিয়াসাহেবের দেখছি, আত্মজীবনী লেখার খুবই সখ।'

এই কথায় দর্শকদের গ্যালারী থেকে চাপা হাসির রোল উঠল।

টমাস উইলিয়াম এবার টেবিল থেকে একটা টেলিগ্রাম তুলে নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, অগস্ট-সেপ্টেম্বরে কি আপনি ঢাকায় এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ। লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেমের নির্দেশ অনুযায়ী ২৮ অগস্ট তারিখে পার্টি-মীটিং-এ যোগ দিতে আমি ঢাকায় আসি।'

'আপনি কি ওই সময় করাচি অফিসে টেলিগ্রাম ক'রেছিলেন, 'পি আই-এ'র ফ্লাইট বন্ধ; পরামর্শ চাই।'

'হ্যাঁ, লিখেছিলাম। ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য ফ্লাইট বাতিল ক'রে দেওয়া হ'য়েছিল।'

টমাস উইলিয়াম এবারে টেলিগ্রামটি আমির হোসেনের হাতে দিয়ে বললেন, 'প্রেরকের ঠিকানাটা জোরে জোরে পড়ুন তো।'

সাক্ষী জোরে জোরে পড়লেন, '১০৭ ডি. এন. সেন রোড, ফরিদাবাদ, ঢাকা-৪।'

'পোস্ট-অফিসের স্ট্যাম্পের তারিখ কতো?'

কাচুমাচু ক'রে আমির হোসেন বললেন, '১১ সেপ্টেম্বর,

'আপনি বলেছেন এপ্রিলে ওই বাসায় যান এবং বাড়ির মালিককে আগে থেকে চিনতেন না। ব্যাপার কী?'

সাক্ষী আমির হোসেন হতবুদ্ধি হ'য়ে চুপ ক'রে থাকেন।

দর্শকদের গ্যালারিতে গুঞ্জন ওঠে। টমাস উইলিয়াম এবার জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'আচ্ছা, আপনাকে তো ভারত, আমেরিকা এবং চীনের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে সাহায্য চাইতে বলা হ'য়েছিল? আপনি যোগাযোগ ক'রেছিলেন কি?'

'আমি নিজে করি নি। জুন-জুলাই মাসে লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন করাচিতে মার্কিন-দূতাবাসের এ্যাসিসট্যান্ট নৌ-এ্যাটাচি মিস্টার নোবল-এর বাসায় আমায় নিয়ে যান। সেখানে তিনি আমাদের পরিকল্পনা জানিয়ে তাঁর কাছে সাহায্য চান।'

'তাহ'লে তো মোয়াজ্জেম সাহেব নিজেই যোগাযোগ ক'রলে পারতেন, আপনাকে বলেছিলেন কেন?'

'জানি না। যাঁরা ভার দিয়েছিলেন তাঁদের জিজ্ঞেস করুন।'

টমাস উইলিয়াম রহস্য ক'রে বললেন, 'ও! তাই নাকি!'

তারপর টমাস উইলিয়াম বসতে বসতে সালামসাহেবকে জেরা ক'রতে বললেন।

বিবাদীপক্ষের প্রধান-কৌঁসুলী আবদুস সালাম খান উঠে দাঁড়ালেন। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'আপনার গায়ের ওই হাওয়াই সার্টটা আপনার নিজিরই কেনা?'

আমির হোসেন একটু রুষ্ট ভাবেই জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

'কিসের শার্ট? কতো দাম?'

'টেট্রনের। বাইশ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম।'

'আচ্ছা, মিয়াসাহেব আপনার পায়ের জুতোজোড়াও কি কেনা?'

'আর যায় কোথা? ভয়ঙ্কর ক্ষেপে গিয়ে সাক্ষী বলল, 'রাবিশ! আপনার প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।'

সালাম খান ততোধিক জোর দিয়ে বললেন, 'জবাব আপনাকে দিতে হবেই।'

উত্তেজিত হ'য়ে চীৎকার ক'রে উঠল আমির হোসেন, 'না, দেবো না।'

সাক্ষীর ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে বিবাদীপক্ষের সকল কৌঁসুলী একযোগে দাঁড়িয়ে উঠে প্রতিবাদ জানালেন।

আমির হোসেনকে বিচারপতি ক্ষমা চাইতে বললেন। আমির হোসেন ক্ষমা চাওয়ার পর অবস্থা আবার শান্ত হ'লো। ফের জেরা সুরু হ'লো।

সালাম খান জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'আচ্ছা, আপনার সঙ্গী-সাথীরা যে গ্রেপ্তার হ'য়েছেন আপনি জানতেন না?'

'না।'

'আপনি কোন্ পত্রিকা পড়েন?'

'পাকিস্তান অবজারভার।'

'পাকিস্তান অবজারভারে কি আপনি ওই খবর দেখেন নি?'

'না।'

'গ্রেপ্তারের পর আপনাকে সার্চ ক'রে পুলিশ যে 'সীজার লিস্ট' তৈরি ক'রেছিল তাতে কি চাবির কথা উল্লেখ ছিল?'

'জানি না।'

সালাম খান বললেন, 'তা'হলে পুলিশের কাছে আগেই চাবিটা দিয়ে রেখেছিলেন আপনার ব্যাগটি খুলে ডায়েরী বার ক'রবার জন্য।'

'না। আমি গ্রেপ্তারের পর দিয়েছিলাম।'

'সালাম খান হেসে বললেন, 'আপনার কাছে চাবি থাকলে সেই সময় নিশ্চয়ই পুলিশ তা পেত এবং সীজারলিস্টে তার নাম থাকত।

'পুলিশ কেন লিস্ট করে নি আমি কী ক'রে বলব।'

'কে. জি. আহমদ কি আপনাদের দলের সদস্য ছিলেন?'

'না।'

'ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপনি বলেছিলেন কে. জি. আহমদ আপনাদের দলের সদস্য ছিলেন। আবার এখন বলছেন না। দু'রকম কথা কেন?'

সাক্ষী নীরব রইলেন।

আবার প্রশ্ন করেন আবদুস সালাম খান,

'অগস্টের শেষে কতোদিন ছিলেন আপনি ঢাকায়?'

'২৬ দিন। ঢাকা হোটেলেই ছিলাম।'

'ঢাকা হোটেলের রেজিস্টারে কি নাম ছিল আপনার?'

'না, আমি নাম তুলি নি।'

'হোটেল আরজুতে কি আপনার নাম ছিল?'

'নিজের নামে ছিলাম না সেখানে, আবদুর রহিম নামে থাকতাম।'

অগস্টে ঢাকায় এসে লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেমের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল কি?'

'হ্যাঁ, ২৯ অগস্ট ধানমণ্ডীর 'আলেয়া'তে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়।'

'যুদ্ধের সময় লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন কোথায় ছিলেন?'

'করাচির নৌবাহিনীর সদর দফতরে লিয়াজো অফিসার হিসাবে কাজ ক'রতেন।

'করাচির নৌবাহিনীর সদর দফতরটা কোথায়?'

'জানি না।'

'সমুদ্রবক্ষে কি?'

'আমি জানি না।'

'আপনি যখন ঢাকায় এসেছিলেন, যুদ্ধটা তখনই হ'য়েছিল; তাহ'লে লে. মোয়াজ্জেম ঢাকায় কী ক'রে এলেন সেই সময়?'

সাক্ষী নীরব।

'আলেয়া থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ির দূরত্ব কতটুকু?'

'মীরপুর রোড হ'য়ে গেলে এক মাইলের মতো।'

'মীরপুর রোড হ'য়ে কেন? সব চেয়ে সোজা রাস্তাটার কথা বলুন।'

'জানি না।'

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বললেন, 'পরে করাচি থেকে ঢাকায় বদলি হয়ে এসে ঢাকা হোটেলে ছিলাম, স্বনামেই। হোটেল ত্যাগ করি ৪ ফেবরুয়ারি।'

'ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম আপনি কিসে গিয়েছিলেন?'

'ট্রেনে।' পরক্ষণেই বললেন, 'আমি ঠিক মনে ক'রতে পারছি না, বিমানে না ট্রেনে গিয়েছি।'

'আপনি বলেছেন, আপনারা ক্যাণ্টনমেণ্টগুলো আক্রমণের জন্য 'ডি-ডে'র অপেক্ষা ক'রছিলেন। বেসামরিক স্ট্রাটেজী পয়েণ্টগুলো ছিল গভর্নর হাউস, সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, রেলওয়ে ডিপার্টমেণ্ট ওয়ারলেস সেণ্টার, পুলিশ হেডকোয়ার্টার ইত্যাদি—কেমন?'

'জী হ্যাঁ।'

হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে সালাম খান জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'হোসেন ফ্লাওয়ার মিল চেনেন?'

'হ্যাঁ। শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিয়ে আমি ওই আটার কল স্থাপন করার জন্য প্যাড ছেপেছিলুম।'

'আটার কল দিতে কতো টাকা লাগে?'

'দুই-তিন হাজারে হ'য়ে যায় সম্ভবতঃ।'

'প্যাডে ১০৭ ডি. এন. সেন রোডের ঠিকানা ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি আটার কলটা ক'রেছিলেন?'

'না। টাকার অভাবে ক'রতে পারি নি।'

'কিন্তু সেই সময় তো ব্যাঙ্কে আপনার ১০ হাজার টাকা ছিল।'

'হাঁ, তবে টাকাটার কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।'

'টাকার কথা ভুলে গিয়েছিলেন—স্ট্রেনজ্! আপনি তো দেখছি চাকরি আর আটার কল নিয়েই সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন। আন্দোলন করার সময় ছিল না মোটেই।'

'তা ঠিক।'

'আচ্ছা, ব্যাঙ্কে জমানো ১০ হাজার টাকা আপনি কোথেকে পেলেন?'

'চাকরি ক'রে টাকাটা জমিয়ে ছিলাম আমি।'

একটু মুচকি হেসে আবদুস সালাম খান বললেন, 'ও বেশ! বেশ! বিমান-বাহিনীতে তো আপনি ওয়্যারম্যান হিসেবে ঢোকেন। তখন কতো বেতন পেতেন?'

'৪৭ টাকা।'

'কতোদিন ওয়্যারম্যান ছিলেন?'

'মনে নেই।'

'করপোরাল হ'লেন কোন্ বছর?'

'স্মরণ ক'রতে পারছি না।'

'কর্পোরাল হিসাবে চাকুরিতে অবসর গ্রহণের সময় আপনার মাসিক বেতন ১৭৫ টাকা ছিল না কি?'

'জী হ্যাঁ।'

'আপনার একটা পোস্টাল সেভিংস একাউন্টও আছে।'

একটু ইতস্তত ক'রে আমির হোসেন বললেন, 'হ্যাঁ আছে।'

'অত কম বেতনে চাকরি ক'রে আপনি ওই টাকা জমিয়ে ছিলেন এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?'

'আপনাদের ভাবনার ওপর আমার হাত নেই।'

'বিপ্লবের জন্য আপনারা কি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ক'রেছিলেন?'

'আমি থাকা পর্যন্ত কিছুই হ'তে দেখি নি।'

'আচ্ছা দলে নতুন লোক নিলে আপনি তো শপথ গ্রহণ করাতেন। শপথের মানেটা কী ছিল?'

তোতলাতে তোতলাতে জবাব দিল সাক্ষী, 'মানে, পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমানদের স্বাধীনতা চাই···পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে—এই সব আর কি।'

'অর্থাৎ এর বেশি আপনি জানেন না।'

'না, আরও আছে।'

ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যানই বললেন, 'কী সেগুলো, বলুন।'

সাক্ষী বেশ ঘাবড়ে যান। বিচলিত স্বরে বলতে থাকে, 'পূর্বপাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিমপাকিস্তানে ব্যয় হ'চ্ছে···পূর্বপাকিস্তান অপেক্ষা পশ্চিমপাকিস্তানে বেশি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে—এই সব আর কি।'

সালাম খান তীব্রস্বরে জিজ্ঞেস করেন, 'শুধু এই?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'আপনার ওপর পাঁচজন জাঁদরেল সি. এস. পি. অফিসারকে দলে টানার নির্দেশ ছিল। কী এমন যোগ্যতা আপনার আছে যে, এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আপনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হ'লো? আপনি তাঁদের চেনেন না, তাঁদের দলে টানার মতো বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই আপনার নেই।'

'যাঁরা দিয়েছেন তাঁরা জানেন।'

'আমি যদি বলি মামলায় জড়ানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যে তাঁদের নাম ক'রেছেন?'

'না, তা ঠিক নয়।'

'আপনাকে ভারত, চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগের ভার দেওয়া হ'য়েছিল, সবুর খানের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রতে বলা হ'য়েছিল, সি. এস. পি অফিসারদের দলে টানতে

বলেছিল—কোনো কাজই করেন নি। তারপরেও দলের নেতাদের আপনার ওপর আস্থা ছিল এবং সমস্ত গোপনকথা আপনাকে জানানো যেন একটা অবশ্য কর্তব্য ছিল বলতে চান? যেখানে যত গোপন মীটিং হ'য়েছে আপনি রয়েছেনই, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

'আপনাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ওপর আমার হাত নেই।'

ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যানের দিকে চেয়ে আবদুস সালাম খান বললেন, 'স্যার, আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।'

বিচারপতি সেই দিনের মতো আদালতের অধিবেশন মূলতবী ঘোষণা ক'রলেন।

দলে দলে লোক বেরিয়ে এলো আদালতকক্ষ থেকে।

চট্টগ্রাম সিটি আওয়ামীলীগের সাবেক সহ-সভাপতি ডাঃ সাইদুর রহমানের সাক্ষ্য এবং জেরাও খুব উল্লেখযোগ্য। তিনিশ রাজসাক্ষী হ'য়েছিলেন। ডকে উঠে দাঁড়ানোর পর সরকারপক্ষের প্রধানকৌঁসুলী মঞ্জুর কাদের চৌধুরীর জিজ্ঞাসার উত্তরে ডাঃ সাইদুর রহমান বললেন,

জুন মাসে পনের দিন অন্তর আমার বাসায় দুটো গোপন বৈঠক হয়। প্রথম বৈঠকটিতে লেফটেন্যা' মোয়াজ্জেম হোসেন, এল. এস. সুলতানউদ্দীন, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ও এ. বি. খুরশিদ ছিলেন। দ্বিতীয় বৈঠকেও তাঁরাই ছিলেন। ওই বৈঠক দুটোতে বিপ্লবীদলের সদস্যদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ওইসব বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবনের ওপর তাঁরা জোর দেন। স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান বৈঠকে দলীয় কার্যের অগ্রগতি সম্পর্কে একটা রিপোর্ট পেশ ক'রেন। তাতে তিনি বলেছিলেন কোথায় কতো নতুন লো' রিক্রুট হ'য়েছে, সামরিক ইউনিটগুলোর সঙ্গে কতোটা যোগাযোগ ক'রতে পেরেছেন, ইত্যাদি। আন্দোলন চালনার ভবিষ্যত কর্মপন্থা এবং অর্থ-সংগ্রহের বিষয় নিয়েও

আমাদের মধ্যে আলোচনা চলে সেখানে। আলোচনা চলে সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল দিয়ে। বৈঠকের সকলেই লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেমের সঙ্গে একমত হই যে, সশস্ত্র-বিপ্লব ছাড়া পূর্বপাকিস্তানকে পশ্চিমপাকিস্তানের আওতা থেকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। পরবর্তী সময়েও লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। প্রায়ই তাঁর নাসিরাবাদ হাউসিং সোসাইটির বাসায় গিয়ে আন্দোলনের অগ্রগতি ও সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা ক'রতাম। অনেক সময় সে আলোচনায় এ. বি. চৌধুরী, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান এবং লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীনও থাকতেন।

ঠিক মনে পড়ছে না, সম্ভবত জুলাই মাসে মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী পি. এন. ওঝার সঙ্গে দেখা ক'রে একটা অস্ত্র-তালিকা দিয়ে আসতে বলেন। তালিকাটি মানিক চৌধুরীরই দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু গত মে মাসের ২১ তারিখে প্রতিরক্ষা আইনে সে গ্রেপ্তার হওয়ায় ভারটা আমার ওপর পড়ল। কারণ, মানিক চৌধুরীর সঙ্গে আগে দু' একবার আমি পি. এন. ওঝার কাছে গিয়েছি।

'৬৬ সালে ৮ জুন তারিখে শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেপ্তার হবার পর আওয়ামীলীগের জরুরি বৈঠক বসে। সেই বৈঠকে যোগ দিতে আমি আর মানিক চৌধুরী ঢাকায় গিয়েছিলাম। সেই সময়ই ভারতীয় ডেপুটি হাই-কমিশন অফিসে মানিক চৌধুরী মিস্টার ওঝার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ করিয়ে দেন। যাই হোক জুলাই মাসে কিন্তু আমি ওই-তালিকাটা মিস্টার ওঝাকে দিয়ে আসতে সাহস পেলাম না। কারণ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা প্রকাশ হওয়ার পর আওয়ামীলীগের কর্মীরা ব্যাপকহারে গ্রেপ্তার হ'তে সুরু হ'য়েছে তখন। জুলাই-এর শেষাশেষি একদিন হঠাৎ মিস্টার ওঝা নিজেই

চট্টগ্রামে আমার বাসায় এসে হাজির হ'লেন। প্রথমেই তিনি মানিক চৌধুরীর খোঁজ-খবর নিলেন। পরদিন সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম রেলওয়ে রিফ্রেসমেণ্ট রুমে তাঁর কাছে অস্ত্রশস্ত্রের তালিকাটি দিয়ে আসতে বলেন তিনি। নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর কাছে আমি অস্ত্র-শস্ত্রের একটি তালিকা পৌঁছে দিই। এ-সম্পর্কে আরও বিশদ আলোচনার জন্য লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম হোসেনকে ঢাকায় তাঁর ওখানে যত শীঘ্র সম্ভব নিয়ে যেতে বললেন আমায় তিনি।

মিস্টার ওঝা আমায় জানালেন, ঢাকায় গিয়ে কোনো পাবলিক ফোন থেকে আমি যেন সকাল দশটায় তাঁর সঙ্গে কথা বলে নিই। ফোনে বললেই হবে, আমি সাঈদ বলছি, ভিসার ব্যাপারে মিস্টার ওঝার সঙ্গে আলোচনা ক'রতে চাই। ফোন যেই ধরুক, বুঝে নেবে।

অগস্টের প্রথমে আমি মোয়াজ্জেম হোসেনকে নিয়ে ঢাকায় যাই। স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ঢাকায় গিয়ে পূর্বের নির্দেশ অনুযায়ী মিস্টার ওঝার সঙ্গে কথা বলে বৈঠকের দিনক্ষণ এবং স্থান ঠিক ক'রে নিই। চট্টগ্রাম থেকে মোয়াজ্জেম হোসেনের হিলম্যান গাড়িতে আমরা ঢাকায় আসি। পথে মোয়াজ্জেম হোসেন এক বাড়িতে যান। বাড়ির কর্তা ক্যাপটেন এস. আলমের সঙ্গে তিনি আমায় পরিচয় করিয়ে দিলেন। সে-সময় মিস্টার আলমের পরনে ছিল সামরিক পোশাক। ঢাকায় আমি গ্রীন হোটেলে উঠি। আর লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম হোসেন এবং স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ধানমণ্ডীতে তাঁর আত্মীয় ডাঃ খালেকের বাসায় ওঠেন।

মিস্টার ওঝার সঙ্গে যোগাযোগের পর 'সাকুরা'র সামনে আমরা অপেক্ষা করি। কিছুক্ষণ বাদেই একটা গাড়ি নিয়ে মিস্টার ওঝা আসেন। গাড়িতে আমাদের তুলে নিয়ে চলে যান ধানমণ্ডীর এক বাসায়। মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে মিস্টার ওঝার পরিচয় করিয়ে দিলাম আমি। অস্ত্রের-তালিকা নিয়ে অনেকক্ষণ মিস্টার ওঝার

সঙ্গে মোয়াজ্জেম হোসেনের আলোচনা হ'লো। মিস্টার ওঝা আশ্বাস দিলেন ভারত-সরকারের অনুমোদনের জন্য তালিকাটি পাঠানো হবে। মিস্টার ওঝার কাছে টাকাপয়সার সাহায্যও আমরা চেয়েছিলাম। সে-সময় তিনি ওই ব্যাপারে তাঁদের অপারগতার কথা জানান। তবে অস্ত্রসাহায্য সম্পর্কে মাসখানেক বাদে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ক'রতে বলেন। বৈঠক শেষে দ্বিতীয় রাজধানীর কাছে গাড়ি থেকে তিনি আমাদের নামিয়ে দিলেন।

মিস্টার ওঝার নির্দেশ মতো অস্ত্রসাহায্যের ব্যাপারে আমরা সেপ্টেম্বর নাগাদ তাঁর সঙ্গে ঢাকায় এসে আবার পাবলিক টেলিফোন থেকে কথা বলি। এবারে বলি, সাদেক বলছি। মিস্টার ওঝার তাই নির্দেশ ছিল। রাত ন'টায় সেরিমনিয়াল আর্চ-এর সামনে অপেক্ষা ক'রতে বললেন তিনি। নির্দিষ্ট সময়ে তিনি আমাকে আর লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম হোসেনকে গাড়িতে তুলে নিয়ে তাঁর বাসায় চলে গেলেন। সেখানে তিনি আমাদের জানালেন, ভারত-সরকার আমাদের অস্ত্র-সাহায্য ক'রতে সম্মত হ'য়েছে। তবে সকলেই এখন সাধারণ নির্বাচন নিয়ে বড়ো ব্যস্ত। কখন, কোথায়, কীভাবে অস্ত্র সরবরাহ ক'রব নির্বাচনের পর ঠিক হবে।'—এই পর্যন্ত একটানা জবাববন্দী দিয়ে ডাঃ সাইদুর রহমান থামলেন। দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন আদালতকক্ষে। সামনের দিকেই বসে রয়েছেন আওয়ামীলীগ নেতা আতাউর রহমান, পরিষদ-সদস্য ডক্টর আলিম-আর-রাজি, বিরোধীপক্ষের প্রধান-কৌঁসুলী আবদুস সালাম খান এবং ঢাকার আরও সব বাঘা বাঘা আইনজীবি এবং রাজনৈতিক নেতা।

ডাক্তার সাইদুর রহমান আবার বলতে সুরু ক'রলেন,

জানুয়ারিতে মানিক চৌধুরী মুক্তি পেলো। মোয়াজ্জেম হোসেনও ওই সময় চট্টগ্রামে ছিলেন। মার্চ মাসে তিনি সেখান থেকে বরিশালে বদলি হ'য়ে গেলেন। সেই সময় স্টুয়ার্ড মুজিবুর

রহমান আমার বাসায় এসে একদিন জানালেন, আমি যেন মানিক চৌধুরীকে নিয়ে শীগ্‌গীরই ঢাকায় গিয়ে মিস্টার ওঝার সঙ্গে দেখা করি এবং অস্ত্র-সাহায্যের ব্যাপারটা পাকা ক'রে ফেলি। নির্দেশ অনুযায়ী ৮ মার্চ আমি ঢাকায় এসে গ্রীন হোটেলে উঠলাম। মানিক চৌধুরীও আমার সঙ্গে একই হোটেলে ছিলেন। তিনি পরদিন বিমানে ঢাকায় এসেছিলেন। ১০ মার্চ রাত ন'টার দিকে সাকুরা হোটেলের সেরিমনিয়াল আর্চের কাছ থেকে মিস্টার ওঝা আমাদের গাড়িতে তুলে নিয়ে তাঁর বাসভবনে এলেন। লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেমও ছিলেন সে-সময় আমাদের সঙ্গে। তিনি তখন ঢাকায় ছিলেন। মিস্টার ওঝা আমাদের শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধান-মন্ত্রিত্বের নির্বাচন শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রতে বললেন। তারপর মানিক চৌধুরীকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে পাঁচ হাজার টাকা দিলেন। হোটেলে ফিরে আমি সে-কথা জানতে পারি। প্রথমে তো টাকা দিতে অস্বীকার ক'রেছিলেন মিস্টার ওঝা, পরে কবে আবার অর্থসাহায্যে সম্মত হ'য়েছিলেন আমি জানি না।

৩১ মার্চ আমরা তিনজন আবার মিস্টার ওঝার সঙ্গে দেখা ক'রলাম। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ততদিনে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হ'য়ে গেছেন।

মিস্টার ওঝা আমাদের জানালেন, তাঁর সরকার 'স্বাধীন পূর্ব বাঙলা' গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র-সাহায্য দিতে প্রস্তুত আছেন। এ ব্যাপারে কথা পাকা করার জন্য ভারতের কয়েকজন পদস্থ কর্মচারী এবং সামরিক বাহিনীর অফিসারের সঙ্গে বৈঠকে বসা প্রয়োজন। আগরতলায় বসবে সেই বৈঠক।

আগরতলা বৈঠকে গিয়েছিল স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান এবং মিস্টার আলী রেজা। স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান আমাকে পরে জানিয়েছিলেন, আগরতলা বৈঠক সফল হ'য়েছে। মানিক চৌধুরী আগের পাঁচ

হাজার টাকা ছাড়াও মিস্টার ওঝার কাছ থেকে আরও দশ হাজার টাকা পেয়েছিলেন। সবটাই তিনি লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেনের হাতে তুলে দিয়েছেন। মানিক চৌধুরী নিজেই আমায় ওই কথা জানিয়েছিলেন।

এই সময় বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলি খানবাহাদুর নাজিরউদ্দীন আহামদের এক প্রশ্নের জবাবে ডাক্তার সাইদুর রহমান জানান যে,

ডিসেম্বরে চট্টগ্রামে নিজের বাসা থেকেই তাঁকে রাত দুটোর সময় গ্রেপ্তার ক'রে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাঁকে পাঠান হয় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। তারপর ১৮ জানুয়ারি ঢাকা ক্যান্টনমেণ্টে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়।

কৌঁসুলি সালাম খান তখন উঠে বললেন, 'আপনি আটক অবস্থায় ১৫ ডিসেম্বর, স্বরাষ্ট্র-বিভাগের সেক্রেটারির কাছে দরখাস্ত ক'রেছিলেন—তাতে বলেছেন, আই. জি. স্পেশালব্রাঞ্চ অফিসে নিয়ে গিয়ে আপনাকে একটা কুঠরিতে আটকে রাখে, সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় আপনাকে চেয়ারের হাতল দিয়ে মারে, চপেটাঘাত করে এবং ঘুঁষি মেরে শরীরের নানান জায়গা জখম ক'রে দেয়। জ্ঞান না হারানো পর্যন্ত আপনার ওপর নির্যাতন চলতে থাকে। একনাগাড়ে তিন দিন ধরে এমনি ভাবে আপনার ওপর নির্যাতন চালায় পুলিশ এবং জোর ক'রে আপনাকে ডিক্টেশন দিয়ে স্বীকারোক্তি লিখিয়ে নেয়।'

ডাক্তার সাইদুর রহমান বললেন, 'দরখাস্ত আমি লিখেছি ঠিকই, তবে আপনি যা বললেন, তা সত্যি নয়।'

তখন আবদুস সালাম খান দরখাস্তটির একটি কপি সাক্ষীর হাতে তুলে দিয়ে জোরে জোরে পড়তে বললেন।

সাক্ষী বললেন, 'স্যার আমি বড়ো ক্লান্ত, আজ আর পড়তে পারব না।'

ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান তখন বলে উঠলেন, 'না না, আপনি ওটা এখনি পড়ুন।'

ডাক্তার সাইদুর রহমান অগত্যা আমতা আমতা ক'রে মৃদুস্বরে স্থানে স্থানে বাদ দিয়ে দরখাস্তটা পড়ে গেলেন। পড়া শেষ হ'লে বললেন, 'কিন্তু যা লেখা হ'য়েছে তা সত্যি নয়।'

এরপর সরকারপক্ষের কৌঁসুলির কথায় তিনি অভিযুক্ত মানিক চৌধুরী, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, এ. বি খুরশিদ, লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন আহমদ এবং মুজিবুর রহমানকে সঠিক ভাবে সনাক্ত করলেন।

অতঃপর তাঁকে জেরা ক'রতে উঠে দাঁড়ালেন বিবাদীপক্ষের প্রধান-কৌঁসুলি আবদুস সালাম খান। তিনি জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'আপনি আওয়ামী লীগে কতোদিন আছেন?'

'প্রায় সৃষ্টির পর থেকেই।'

'মুজিবুর রহমানের ৬-দফা সম্বলিত পুস্তিকা কি আপনি পড়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি জনসাধারণের মধ্যে সেগুলি প্রচার ক'রেছিলেন?'

'ক'রেছি।'

'আপনি কি স্বীকার করেন ওই ৬-দফার পুস্তিকার মোদ্দা বক্তব্য ছিল—পূর্বপাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আদায় করা।'

'হ্যাঁ।'

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, ৬-দফার দ্বিতীয় দফায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নির্দেশিত হ'য়েছে। তাতে দেশরক্ষা এবং বৈদেশিক নীতি কেন্দ্রীয়-সরকারের হাতে রাখার প্রস্তাব করা হ'য়েছে। বাকি বিষয়সমূহ স্টেট বা প্রদেশের হাতে থাকবে। একই দফায় বলা হ'য়েছে, দুইটি পৃথক্ অথচ অবাধ বিনিময় মুদ্রা

চালু কিংবা বর্তমানের মতোই সারা দেশে একই মুদ্রা চালু রাখা যেতে পারে। তবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে পূর্বপাকিস্তান থেকে পশ্চিমপাকিস্তানে মুদ্রা পাচার হ'তে না পারে। আর তার জন্যে পূর্বপাকিস্তানের জন্য আলাদা রিজারভ ব্যাঙ্ক গঠন করা প্রয়োজন।'

'জী হ্যাঁ, এসব আমি পড়েছি।'

'পঞ্চম দফায় বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্পর্কে বলা হ'য়েছে, কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা অঙ্গরাজ্যগুলিই সমহারে মিটাবে এবং তাতে আরও বলা হ'য়েছে, অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদি চলাচলে কোনো রকম বাধা নিষেধ থাকবে না?'

ঘাড় নেড়ে সালাম খানের কথায় সায় দিলেন সাক্ষী।

সালাম খান পুনরায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন, 'ষষ্ঠ দফায় আঞ্চলিক সেনাবাহিনী কথা বলা হ'য়েছে। আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্যই যে পূর্বপাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি গঠনের প্রয়োজন তারও উল্লেখ করা হ'য়েছে?'

'হ্যাঁ।'

লাহোরে শেখ মুজিবুর রহমান এই ৬-দফা ঘোষণা ক'রেছিলেন আপনি তা জানেন কি?'

'আমার ঠিক মনে নেই।'

'আপনি জানেন কি ৬-দফা কর্মসূচী প্রকাশের পর পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান ৬-দফা আদায়ের আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে অভিহিত ক'রে বলেন, এই আন্দোলন দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে পারে এবং তাকে দমানোর জন্যে অস্ত্র-প্রয়োগের প্রয়োজন হ'য়ে পড়বে।'

'আমার স্মরণ নেই।'

'জানেন কি জানেন ৬-দফা ঘোষণার পর বহু আওয়ামীলীগ কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়?'

মে মাসে সারা পূর্বপাকিস্তান থেকে বহু আওয়ামীলীগ কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়।'

'আপনি কি জানেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান পূর্বপাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গার বহু জনসভায় ৬-দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা ক'রেছিলেন?'

'চট্টগ্রামে একটি জনসভায় ৬-দফার কর্মসূচী ব্যাখ্যা ক'রে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তিনি। অন্য জায়গার কথা আমি জানি না।'

ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের পর পূর্বপাকিস্তানকে প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার দাবি তুলেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান?'

'হ্যাঁ।'

'চট্টগ্রামে নৌবাহিনীর সদর-দফতর স্থাপনের দাবি উঠেছিল, পূর্বপাকিস্তানে মিলিটারি একাডেমি এবং অরডন্যান্স ফ্যাক্টরি স্থাপনের দাবিও তুলেছিলেন তিনি—জানেন কি?'

'জী হ্যাঁ।'

'সে সব দাবি কি মেনে নেওয়া হ'য়েছে?'

'না, তবে শুনেছি জয়দেবপুরে একটি অরডন্যান্স ফ্যাক্টরি তৈরি হ'চ্ছে।'

'আপনি কি জানেন চট্টগ্রামে সমুদ্রের পানি থেকে ঘরে ঘরে-যে-লবণ উৎপাদন করা হয় কেন্দ্রীয় সরকার তাতে শুল্ক বসিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'পশ্চিমপাকিস্তান থেকে যাতে পূর্বপাকিস্তানে লবণ আমদানি বন্ধ না হয় তার জন্যই কি এই শুল্ক আরোপ করা হ'য়েছে?'

'আমি ঠিক বলতে পারব না।'

এই সময় সরকারপক্ষের প্রধান কৌঁসুলি মঞ্জুর কাদের দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার কী ক'রেছেন না-ক'রেছেন, এক্ষেত্রে তা উত্থাপন করা অপ্রাসঙ্গিক।'

সালাম খান মৃদু হেসে বললেন, 'প্রাসঙ্গিক যে, তাই প্রমাণ ক'রছি।'

বিচারপতি এস. এ. রহমান বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে আপনি জেরা করুন।'

আবদুস সালাম খান আবার জেরা সুরু ক'রলেন। সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, আপনি কি জানেন চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে সংখ্যা সাম্যের দাবি এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবি পশ্চিমপাকিস্তানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ?'

'আমি বলতে পারছি না।'

'ভারতীয় হাই কমিশনের পি. এন. ওঝার সঙ্গে আপনাদের যোগসাজসের কাহিনীটি সম্পূর্ণ কল্পিত; আর অভিযুক্ত ব্যক্তিদের 'রাষ্ট্রদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং সংখ্যা-সাম্যের দাবিকে বানচাল করার জন্যই এ-কাহিনী ফেঁদেছেন।'

'আমি সত্যি কথাই বলেছি।'

এরপর সালাম খান তাঁকে মানিক চৌধুরীর প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন করেন। জিজ্ঞাসা ক'রলেন, 'আপনি বলেছেন ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে মানিক চৌধুরী আপনাকে বলেছিলেন যে, শক্তি-প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাদেশিক সরকার থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হবে। আপনি কী ক'রে বিশ্বাস ক'রলেন যে, একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারকে শক্তি প্রয়োগে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে ?'

'মানিক চৌধুরী আমায় বুঝিয়ে ছিলেন যে, সামরিক-বাহিনীতে পূর্বপাকিস্তানের কর্মচারিরা বিদ্রোহ ক'রবে এবং তারা সব সামরিক

ছাউনি দখল ক'রে পূর্বপাকিস্তানকে পশ্চিমপাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলবে।'

'সেনাবাহিনীতে পূর্বপাকিস্তানীদের সংখ্যা কতো?'

'বলতে পারছি না।'

'আপনি কি জানেন যে, সেনাবাহিনীতে পূর্বপাকিস্তানী জোয়ানের সংখ্যা শতকরা ৪ জন মাত্র এবং প্রতি ৯০ জন অফিসারে একজনও পূর্বপাকিস্তানী নয়?'

'আমি জানি না।'

এরপর সালাম খান সাক্ষী ডাক্তার সাইদুর রহমানকে

সে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর ঢাকা আগমন এবং মিস্টার ওঝা সম্পর্কে জেরা ক'রতে লাগলেন।

'ঢাকায় এসে আপনি কি আরজু হোটেলে ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কয় দিন ছিলেন?'

'তিন দিন।'

'হোটেল রেজিস্টারে আপনি নাম এনট্রি ক'রে...লেন?'

'ক'রেছিলাম।'

'আপনি কবে ঢাকায় এসেছিলেম?

সালাম খান হোটেলের রেজিস্টারটি নিয়ে সাক্ষীর হাতে দিয়ে বললেন, 'কোথায় আপনার নাম এনট্রি রয়েছে দয়া ক'রে একটু দেখিয়ে দিন।'

অনেকক্ষণ ধরে রেজিস্ট্রী দেখে সাক্ষী আমতা আমতা ক'রে বললেন, 'আমার নাম এখানে দেখতে পাচ্ছি না।'

'আচ্ছা চট্টগ্রাম থেকে আপনি মোয়াজ্জেম হোসেনকে নিয়ে

যে কার-এ ঢাকায় এসেছিলেন ওঝার সঙ্গে দেখা ক'রতে—সেই মোটরগাড়িটি কি দুই দরজাওয়ালা অথবা চার দরজাওলা ?'

'আমার মনে নেই।'

'আপনি বলেছেন, গাড়িটি ছিল হিলম্যান।'

'হবেও-বা।'

'হিলম্যান গাড়ির কয় দরজা আপনি বুঝি জানেন না ?'

'না।'

'সেবার গ্রীন হোটেলে উঠে কি নাম এনট্রি ক'রেছিলেন ?'

'জানি না।'

'আমি বলছি ১৯ মে আপনি আদৌ ঢাকায় আসেন নি, বা হোটেল গ্রীনেও থাকেন নি।'

'তা সত্যি নয়।'

'তাহ'লে হোটেল রেজিস্টারে আপনার নাম এনট্রি নেই কেন ?'

'মিস্টার পি. এন. ওঝার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ ক'রতে চেয়েছিলাম বলেই হোটেল রেজিস্টারে নাম রেকর্ড করি নি।'

'কিন্তু ৮ মার্চ মিস্টার ওঝার সঙ্গে যখন গোপনে সাক্ষাৎ ক'রতে এসেছিলেন তখন তো নাম রেজিস্ট্রী করিয়েছিলেন ?'

এই প্রশ্নে সাক্ষী চুপ ক'রে থাকেন।

'আচ্ছা হোটেল সাকুরার লাগোয়া সেরিমনিয়াল আর্চ থেকে কোন্ পথে মিস্টার ওঝার বাড়িতে যেতে হয় ?'

'আমি ঠিক বলতে পারব না।'

'চট্টগ্রাম লালদীঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত সভাশেষে শেখ মুজিবুর রহমান কি আপনার বাড়িতে গিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ'।

'তাঁর সঙ্গে আর কে ছিলেন ?'

'মানিক চৌধুরী।'

'আপনার বাড়িতে সেই সময় আর কেউ ছিলেন ?'

'না।'

'মুজিবুর রহমান আর মানিক চৌধুরী ফিরেছিলেন কীসে ?'

'মানিক চৌধুরীর কারে।'

'মানিক চৌধুরীর কোনো 'কার' নেই।'

'আছে। আমি বহুবার সেই 'কারে' ঘুরেছি।'

'গাড়ির নাম কী ?'

'মনে নেই।'

'তার নম্বর কতো ?'

'তাও মনে নেই।'

'আমি বলছি, শেখ মুজিবুর রহমানকে 'ষড়যন্ত্র মামলায়' জড়ানোর জন্যই এই কথা বলছেন। শেখ মুজিবুর রহমান আপনার বাড়িতে কখনো যান নি।'

'না। একথা ঠিক নয়।'

৭ জুন আওয়ামীলীগ প্রদেশব্যাপী হরতালের ডাক দিয়েছিল কি ?'

'হ্যাঁ।'

'ঢাকা ও প্রদেশের প্রধান প্রধান শহরে সেদিন পূর্ণহরতাল পালিত হ'য়েছিল কি ?'

'হ্যাঁ।'

'এই হরতালের দিন বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশ গুলি চালিয়েছিল, তাতে অনেক লোক মারা গিয়েছিল। এটা কি সত্যি ?'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

অগস্টে কি আপনি ঢাকায় এসেছিলেন ?'

'হ্যাঁ। ২৯, কি ৩০ অগস্ট আমি ঢাকায় এসে গ্রীন হোটেলে উঠেছিলাম। মানিক চৌধুরীও আমার সঙ্গে ছিল।'

'মানিক চৌধুরী কি গ্রীন হোটেলেই উঠেছিলেন ?'

'না, তিনি উঠেছিলেন হোটেল ক্যাসেরিনায়।'

এই সময় আবদুস সালাম খান সাক্ষীর হাতে হোটেল ক্যাসেরিনার রেজিস্টার তুলে দিয়ে মানিক চৌধুরীর নাম বের ক'রতে বললেন।

সাক্ষী তাতে মানিক চৌধুরীর নাম খুঁজে পেলেন না।

'আপনি জবানবন্দীতে বলেছেন ওই সময় আপনি আর মানিক চৌধুরী একই হোটেলে অর্থাৎ গ্রীন হোটেলে ছিলেন।'

'না, তা ঠিক নয়।'

আবদুস সালাম খান আর প্রশ্ন ক'রলেন না। তারপর উঠে দাঁড়ালেন পূর্বপাকিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী এবং আওয়ামীলীগ নেতা আতাউর রহমান খান। দর্শকদের গ্যালারী পরিপূর্ণ। একটু গুঞ্জন উঠছিল সেখান থেকে। আতাউর রহমান খান উঠে দাঁড়াতেই গুঞ্জন থেমে গেল। তিনি সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, 'আপনি কি আওয়ামীলীগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন, না পিছনে কোনো রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য ছিল ?'

'না, আদর্শে বিশ্বাসী হ'য়েই পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম।'

'আচ্ছা, আওয়ামীলীগের ঘোষণাপত্রে যে-সব দাবি-দাওয়ার উল্লেখ রয়েছে—আপনি কি বিশ্বাস করেন যে তাতে পূর্ব-পাকিস্তানের বেশির ভাগ লোকের মনোভাব ব্যক্ত হ'য়েছে ?'

'হ্যাঁ, বিশ্বাস করি।'

'সে সব দাবি কি পূরণ হ'য়েছে ?'

'না।'

'আপনি আপনার দলের ওপর এবং লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম হোসেনের ওপর কেন আস্থা হারিয়ে ফেলেন ?'

'আমি যখন জানতে পারি, মোয়াজ্জেম হোসেন- পার্টির তহবিল তছরুপ ক'রেছেন এবং বরিশাল বদলির পর পার্টির কাজ কিছুই করেন নি, তখন থেকেই আমি পার্টির কাজে আস্থা হারিয়ে ফেলি।'

'আপনাকে রাজসাক্ষী হ'তে প্রথম বলেন কে ?'

'স্বীকারোক্তি দানের পর মেজর নাসের এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি রাজসাক্ষী হ'তে চাই কিনা।'

'মিস্টার ওঝার বাড়ি কী রকম ?'

'দোতলাবাড়ি।'

'সেটা রাস্তার কোন্ পাশে ?'

'ঠিক বলতে পারব না।'

'আপনি তাঁর বাড়িতে ক'বার গিয়েছেন ?'

'যতদূর মনে পড়ে, ছয়বার।'

'আপনারা কোথায় বসতেন ?'

'দোতলার ড্রয়িংরুমে।'

'মিস্টার ওঝার মাথায় কি টিকি ছিল ?'

'আমি লক্ষ্য করি নি।'

'আচ্ছা, ঢাকা থেকে জয়দেবপুর যাওয়ার পথে কোথাও কোনো ব্রিজ পড়ে ?'

'মনে নেই।'

'কুদ আদায়ের জন্যে টঙ্গীর সেতুতে আপনাদের গাড়ি থামিয়েছিল কি ?'

'আমি মনে ক'রতে পারছি না।'

আতাউর রহমান খান বসতে-না বসতেই বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী জুলমত আলী খান হঠাৎ জিজ্ঞেস ক'রলেন, '১৯৬৬ সালের ১৮ মে থেকে ২২ মে আপনি আপনার শ্বশুরবাড়ি সীতাকুণ্ডে ছিলেন ?'

'আমি 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই ক'রতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই আমাদের। আপনি এখন যেতে পারেন।'

এর পর সাক্ষ্য দিতে ওঠেন মির্জা রমিজ। ডকে উঠে আদালত-গৃহের চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। তারপর বলতে সুরু ক'রলেন; 'তারিখটা ঠিক মনে নেই, তবে জুন-জুলাই মাসে লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম হোসেন এবং মুরুজ্জামানের সঙ্গে এক সভায় 'স্বাধীন পূর্ববাঙলা' গঠন প্রসঙ্গে আমার আলোচনা হয়। ওই বছরই অন্য একটি গোপন সভায় কে. এম. এস. রহমান সি. এস. পির সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি তখন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান। দু'একবার আমার বাড়িতেও এসেছিলেন তিনি। এক সময় আমি তাঁকে জিজ্ঞেস ক'রেছিলাম, পূর্বপাকিস্তান আলাদা হয়ে কি টিকতে পারবে? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যাঁ। তারপর যুক্তি দিয়ে তাঁর কারণও ব্যাখ্যা ক'রেছিলেন। সেপ্টেম্বরের দিকে ঢাকায় আমার ফ্ল্যাটে একটা গোপন সভা হয়। তাতে লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম হোসেন, ক্যাপটেন আলম, ক্যাপটেন আলীম, ক্যাপটেন হুদা, ক্যাপটেন মুতালেব, লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন আহমদ এবং স্টুয়ার্ড আহমদ এবং স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানও উপস্থিত ছিলেন।

এই সময় লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন আহমদকে সনাক্ত ক'রতে বলা হ'লো। সাক্ষী বার-বার ক'রে দৃষ্টি বুলালেন সকলের ওপর। শেষে নূর মহম্মদকে দেখিয়ে বললেন, উনি সুলতান-উদ্দীন আহামদ। দর্শকদের গ্যালারিতে মৃদু হাসির গুঞ্জন উঠলো। সাক্ষী বুঝতে পারলেন তাঁর সনাক্তকরণ ঠিক হয় নি। বেশ বিব্রত দেখাল তাঁকে। তিনি তাড়াতাড়ি আবার বলতে সুরু ক'রলেন, 'সভায় লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম হোসেন জানালেন, 'ভারত

অস্ত্রসাহায্য ক'রতে রাজী হ'য়েছে। আন্দোলনের নেতৃত্ব কে ক'রবেন—এই নিয়েও সভায় আলোচনা হ'লো। কেউ বললেন কোনো সি. এস. পি অফিসার, কেউ-বা সামরিক অফিসার, আবার কেউ কেউ বললেন রাজনৈতিক নেতাদের হাতেই আন্দোলন-পরিচালনার ভার থাকা উচিত। এ-ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত অবশ্য সেদিন হ'লো না। সভায় আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম পূর্বপাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হ'লে তাকে কি অন্যান্য রাষ্ট্র সমর্থন জানাবে? কে. এম. এস. রহমান বললেন, ভারতের সঙ্গে এ-ব্যাপারে আলাপ হ'য়ে গেছে। ভারত এবং তার সমর্থক রাষ্ট্রগুলো স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের স্বীকৃতি দেবে। বললাম, পরে যদি ভারত আমাদের আক্রমণ করে? রহমানসাহেবই জবাব দিলেন, এ-যুগে তা সম্ভব নয়। অনেক আন্তর্জাতিক বাধানিষেধ রয়েছে। ওই সভায়ই লেফটেন্যান্ট মোয়োজ্জেম হোসেন ক্যাপটেন মুতালিবের ওপর প্রাক্তন সামরিক কর্মচারীদের সংঘবদ্ধ করার এবং অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের ট্রেনিং দেওয়ার ভার দিলেন।

অক্টোবর মাসে একদিন বিকেল চারটে নাগাদ লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন তাঁর 'মস্কোভিচ' গাড়ি · 'রে চিটাগাং ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গেলেন আমায়। সেখানে কর্নেল ওসমানী ও কর্নেল শেখের সঙ্গে আমায় পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারা তখন ই. পি. আর. সি-এর অফিসার মেসের মধ্যকার রাস্তায় পায়চারি ক'রছিলেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য ছিল, সামরিক বাহিনীতে আমাদের আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া যাচাই করা।

মার্চের দিকে লেফটেন্যান্ট কামাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন বরিশাল থেকে ঢাকায় আম. বাসায় এসে দেখা ক'রলেন। বরিশালে বদলি হ'য়ে মোয়াজ্জেম হোসেনের পদোন্নতি হ'য়েছে। আমার বাসায়ই এক বৈঠক হ'লো। মোয়াজ্জেম হোসেন সেখানে

বললেন, মিস্টার ওঝার কাছ থেকে আমরা অনেক অর্থ সাহায্য পাচ্ছি। রুহুল কুদ্দুস এবং আহমদ ফজলুল রহমান সাহেবও অনেক অর্থ সংগ্রহ ক'রছেন।' আরও টাকার প্রয়োজন। আমার মনে হয় আপাতত আমাদের হাতে যা টাকা আছে তা দিয়ে যদি একটা বাড়ি ভাড়া নিই এবং ব্যবসা করি, তাহ'লে ছুটো সুবিধে হবে। দলের সম্পদও বাড়বে এবং দলের কর্মীদের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের কর্মী বলেও চালানো যাবে।'

এই সময় বাদীপক্ষের কৌঁসুলি সাক্ষীর হাতে একটি টেলিগ্রাম দিয়ে বললেন, 'দেখুন তো মিস্টার রমিজ এই টেলিগ্রামটা চিনতে পারেন কিনা?'

টেলিগ্রামটা দেখে নিয়ে সাক্ষী মির্জা মহম্মদ রমিজ জবাব দিলেন, ২৯ মার্চ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন তাঁর ঢাকা আসার সংবাদ জানিয়ে আমার কাছে টেলিগ্রামটি করেন। আমায়ও ঢাকা যেতে বলেন। ঢাকায় আমার ফ্ল্যাটেই সভা হয়। ওই সভায় মোয়াজ্জেম হোসেন এবং স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ছাড়াও সাবেক করপোরাল সামাদ, কে. এম. শামসুর রহমান, ক্যাপটেন মুতালিবও ছিলেন। সভায় ওয়ারলেস সেট সংগ্রহ নিয়ে আলোচনা হয়। আমার হাতে পঁচিশ হাজার টাকা দেওয়া হ'লো ব্যবসা ও বাড়ি ভাড়া করার জন্য। এপ্রিলেই ১৩ গ্রীন স্কোয়ারে একটা বাড়ি ভাড়া নিলাম। প্রায়ই ওখানে আমাদের গোপন সভা বসত। ওইসব সভায় নতুন সদস্য সংগ্রহ, অস্ত্র জোগাড় করা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা হ'তো। কেবল মে মাসেই ছয়-সাতটি সভা হয় ওই বাড়িতে। প্রাক্তন নায়েব সুবেদার জে. ইউ. আহমদ, প্রাক্তন করপোরাল সামাদ, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, হাবিলদার দলিলউদ্দীন এবং লুৎফর হুদা ওই বাড়িতেই বাস ক'রতেন। ওই বাড়িতেই এক সভায় আলী রেজার সঙ্গে মোয়াজ্জেম হোসেন আমায়

আলাপ করিয়ে দিলেন। আগরতলায় ভারতীয় সামরিক অফিসারদের সঙ্গে বৈঠকে যোগদানের জন্য যে প্রতিনিধি-দল যাবে এক বৈঠকে তার সদস্যদের নামও ঠিক করা হ'লো। আরও ঠিক হ'লো যে, ফেণী হ'য়ে তাঁরা আগরতলা যাবেন।

১১ জুলাই ফেণী থেকে স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ট্রাঙ্ককল ক'রলেন আমায়। ফেণীতে যেতে বললেন। আগেই ঠিক হ'য়েছিল প্রতিনিধিদলটি, ফেণী 'ডেনোফা' হোটেলে থাকবেন। পি. আই. এ-র স্টাফকার 'ডজডার্ট' নিয়ে চাঁটগাঁ থেকে ফেণী গেলাম। ডজডার্টটা বেশি ব্যবহার ক'রতাম আমিই। ফেণী থেকে ফিরতে রাত হ'তে পারে ভেবে পি. আই. এ-র আনোয়ার হোসেনকেও সঙ্গে নিয়েছিলাম। মোয়াজ্জেম হোসেন আমায় আগেই প্রতিনিধি-দলটিকে ফেণী-সীমান্ত বেলুনিয়ায় পৌঁছে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিকেল ৬টা নাগাদ পৌঁছলাম আমি ফেণী। 'ডেনোফা হোটেল'-এ গিয়ে দেখলাম স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, প্রাক্তন নায়েব সুবেদার জে. ইউ. আহমদ, আলী রেজা, প্রাক্তন করপোরাল সামাদ আর হাবিলদার দলিলউদ্দীন আমার জন্য অপেক্ষা ক'রছেন। ঠিক হ'লো, প্রতিনিধিদল ভোর চারটেয় সীমান্ত অ ক্রম ক'রবে। নির্দিষ্ট সময়ে আমার 'ডজডার্ট' ক'রে বেলুনিয়ায় পৌঁছে বিদায় দিলাম তাঁদের। সীমান্তের অপর পারে তাঁরা অদৃশ্য না-হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। সেখানে যে-গাড়িটা দিয়ে তাঁদের পৌঁছে দিয়েছিলাম তার নম্বর ছিল কে. এ. ই. ৩১৯৪। যাবার সময় চাঁটগাঁ-ফেণী সড়কের উপর একটা ব্রীজে থেমেছিলাম 'কুদ' দেওয়ার জন্য। সীমান্তঘাঁটির রক্ষীদের ওপর নায়েব জে. ইউ. আহমদ তাঁর প্রভাব খাটিয়েছিলেন। তাই সীমান্ত পেরুতে কোনো অসুবিধাই হয় নি। আগরতলায় বৈঠক শেষে ফিরে এসে আলী রেজা আমার সঙ্গে দেখা ক'রলেন। তাঁর কাছেই শুনেছি সীমান্তে একজন ভারতীয়

ক্যাপটেন গাড়ি করে তাঁদের সাদরে আগরতলা নিয়ে গিয়েছিলেন। ভারত-সরকারের প্রতিনিধিত্ব ক'রেছিলেন একজন কর্নেল এবং এবং একজন মেজর। আমাদের প্রতিনিধিদল প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্রের একটা তালিকা ভারতীয় প্রতিনিধিদলের কাছে পেশ করে। মেসিনগান, সাব-মেসিনগান, হাতবোমা প্রভৃতি নাম সেই তালিকায় ছিল। ভারতীয় প্রতিনিধিরা জানালেন, তাঁরা তালিকার অস্ত্রশস্ত্র সাহায্যের ব্যাপারটা বিবেচনা ক'রে দেখবেন এবং শীগ্‌গীরই সে-খবর ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের মারফত তাঁদের জানিয়ে দেবেন আগরতলা থেকে ত্ব'লাখ টাকাও পাওয়ার কথা ছিল। ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের মারফতই টাকাটা পাঠাবেন বলে জানিয়েছিলেন ভারতীয় প্রতিনিধিরা।'

বাদীপক্ষের কৌঁসুলি মঞ্জুর কাদের জিজ্ঞাসা ক'রলেন, 'টাকাটা কি তাঁরা পঠিয়েছিলেন?'

সাক্ষী বললেন, 'আমি পরে মোয়াজ্জেম হোসেনকে এ-ব্যাপারে জিজ্ঞাসা ক'রেছি। কিন্তু জবাব পাই নি। আমার এই কৌতূহলে তিনি বিরক্ত হন। পার্টির টাকায় আমরা একটা হিলম্যান এবং একটা ফিয়াট গাড়ি কিনেছিলাম। পার্টির অন্য সব কাজের জন্যও কিস্তিতে কিস্তিতে আমাকে কয়েক হাজার টাকা দেওয়া হ'য়েছিল। তাতেই মনে হয় টাকাটা পেয়েছিল।'

জবানবন্দী শেষ হ'লো।

এবার বিবাদীপক্ষের প্রধান-কৌঁসুলি আবত্নস সালাম খান উঠে দাঁড়িয়ে জেরা ক'রতে স্থরু ক'রলেন। 'আপনার হাতে পার্টির কাজের জন্য কতো টাকা দেওয়া হ'য়েছিল?'

'পঁচিশ হাজার টাকা।'

'তা থেকে নিজের জন্য আপনি কতো টাকা খরচ ক'রেছিলেন?'

'ছ হাজার টাকা।'

'স্কুটার কিনতে কয় হাজার টাকা দিয়েছিলেন ?'

'দু'হাজার টাকা।'

'টাকাটা কি নগদ দিয়েছিলেন ?

'না, চেকে।'

'কী চেক—বীয়ারার না ক্রস ?'

'ক্রস-চেক।'

'গুপ্তকাজের জন্য কি ক্রস-চেক উপযোগী ?'

সাক্ষী নীরব রইলেন।

'আচ্ছা, আপনি তো পি. আই. এ-তে কাজ করেন, মাসে কতো বেতন পান ?'

"বারো শ টাকা।'

'আপনি বলেছেন যে, মে মাসে গ্রীন স্কোয়ারের বাড়িতে অনেকগুলি মীটিং হয়, ক্যাপটেন মোতালিবও সে-সব সভায় থাকতেন। আচ্ছা, ওই বছর এপ্রিল মাসে ক্যাপটেন মোতালিব কোথায় ছিলেন জানেন কি ? কোনো হাসপালে ছিলেন কি ?'

'হ্যাঁ। মার্চের শেষ-ভাগে ঢাকা হাসপাতালে এবং এপ্রিলে কুমিল্লা হাসপাতালে ছিলেন।'

'কিন্তু আমি যদি বলি তিনি ৩১ মে পর্যন্ত ঢাকা ক্যাণ্টনমেণ্ট হাসপাতালে ছিলেন ?'

'হ'তে পারে। আমি ঠিক বলতে পারছি না।'

জুন মাসে লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন আহমদ করাচিতে ছিলেন এটা কি ঠিক ?'

সাক্ষী বললেন, 'জানি না। তবে ওই মাসে তিনি ঢাকায় আমার ওখানে এক মীটিং-এ যোগ দিয়েছি ন।'

'যদি বলি সুলতানউদ্দীন সারা জুন মাসই করাচিতে ছিলেন ?'

'আমি তা জানি না।'

'ঢাকায় মে ও জুন :'সে যে মীটিং হ'য়েছিল তার তারিখ বলতে পারেন?'

'না।'

'মে মাসের মীটিংগুলো কয় দিন পর পর হ'য়েছে?'

'কখনো পর-পর দুই দিন, কখনো-বা সাত-আট-দশ দিন পরেও হ'য়েছে।'

'আপনি যে-আনোয়ার হোসনকে নিয়ে 'ডজডার্ট'-এ ক'রে ফেণী-সীমান্তে গিয়েছিলেন সে কে?'

পি. আই. এর একজন টেলিফোন অপারেটর।

'আপনি পি. আই. এ.-র ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার। আপনার সঙ্গে একজন টেলিফোন অপারেটরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কী ক'রে থাকে?'

'আনোয়ার হোসেন ছিলেন পি. আই. এ.-র এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের সেকরেটারি। সেই সূত্রে পরিচয়।'

'আপনি কি জানেন যে তিনিও রাজসাক্ষী?'

'না।'

'আচ্ছা, আলী আহমদ কে?'

'একসময় আমার ড্রাইভার ছিল।'

'আপনি আহম্মদ ফজলুর রহমানকে চেনেন?'

'নাম শুনেছি।'

'আপনি জানেন কি স্টয়ার্ড মুজিবুর রহমান কী কাজ ক'রতেন?'

'তিনি নৌ-বাহিনীর একটা অফিসার্স মেসে কাজ ক'রতেন।'

'তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা কতোটুকু?'

'আমি জানি না।'

'আমরা তো জানি 'স্টুয়ার্ড' মানে যে খাবার এনে দেয়। এমন

একটি লোককে কেন ভারতে অস্ত্রসংগ্রহের প্রতিনিধি দলভুক্ত ক'রলেন আপনারা?'

'মোয়াজ্জেম হোসেন আমায় বলেছিলেন অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের বেশ জ্ঞান আছে।'

'কেন, আপনাদের দলে তো কয়েকজন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এবং ক্যাপটেনও ছিলেন। নিশ্চয়ই তাঁরা অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান থেকে বেশি যোগ্য। তবু কেন স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে পাঠানো হ'লো সেখানে? আর আলী রেজারই-বা যাওয়ার কারণ কী? তিনিও তো অস্ত্রবিশারদ নন।'

'আমি বলতে পারছি না, মোয়াজ্জেম হোসেন জানেন।'

'আগরতলা-সীমান্তে প্রতিনিধিদের পৌঁছে দেবার দিন স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে যে-ট্রাঙ্ককল পান সেটা কখন?'

'ওই দিন বেলা তিনটের কাছাকাছি।'

'কতক্ষণ বাদে রওনা হন?'

'কিছুক্ষণ বাদেই।'

'ডজ গাড়ি ঘণ্টায় কতো মাইল যায়?'

'৫০ থেকে ৬০ মাইল।'

'চট্টগ্রাম থেকে ফেনীর দূরত্ব কতো?'

'৬৫ মাইল।'

আমি যদি বলি ওইদিন বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটার মধ্যে আপনি কোনো ট্রাঙ্ককল পান নি।'

'এ কথা ঠিক নয়।'

'আপনি ওই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে কতোদিন যুক্ত ছিলেন?'

'গ্রেপ্তার হওয়ার আগ পর্যন্ত।'

'কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রদত্ত বিবৃতিতে আপনি কি একথা

বলেন নি যে, মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক তিক্ত হওয়ার পর আর পার্টির সঙ্গে আপনার কোনো সংশ্রব ছিল না?'

'কী বলেছি আমার মনে নেই।'

আবদুল সালাম খান আর কিছু না বলে খানিকটা সময় ধরে একটা দলিল দেখলেন। আদালতকক্ষে থমথমে নীরবতা। হঠাৎ মুখ তুলে প্রশ্ন ক'রলেন তিনি, 'কর্নেল শেখ কি বাংলাভাষী?'

'জী না।' হাল্কাকণ্ঠে জবাব দিলেন রাজসাক্ষী মির্জা মহম্মদ রমিজ।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলির অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী জানালেন যে, স্বাধীন পূর্ববাঙলার জন্য পতাকার পরিকল্পনাও করা হ'য়েছিল। সবুজ আর সোনালি—দুই রঙের পতাকা। সবুজ পূর্ববাঙলার সবুজাভ প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতীক আর সোনালি হচ্ছে পাটের প্রতীক।

সালাম খান এবারে সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, 'আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রদত্ত বিবৃতিতে বলেছেন, স্বাধীন পূর্ববাঙলায় সব সম্পত্তি ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হবে। পৃথিবীর আর কোনো দেশ সম্পত্তি ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ ক'রেছে বলে আপনি শুনেছেন?'

'সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন ক'রেছে।'

'সভায় যে পরিকল্পিত পতাকাটি পেশ করা হ'য়েছিল তা কিসের তৈরি ছিল?'

'কাপড়ের।'

'ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কি আপনি বলেছিলেন, যে পতাকায় পাটের ছবি আঁকা আছে?'

সাক্ষী উত্তর দিলেন, 'আমার মনে নেই।'

'ক্ষমতা দখলের দিন অর্থাৎ 'ডি-ডে'র কোনো তারিখ ঠিক হ'য়েছিল কি?'

'না।'

বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলির অপর এক প্রশ্নের উত্তরে রাজসাক্ষী মির্জা মহম্মদ রমিজ বললেন যে, কমাণ্ডো স্টাইলে পূর্বপাকিস্তানের ক্যাণ্টনমেণ্ট সমূহ দখলের পর কী হবে ক্যাপটেন আলমের বাড়িতে সে-সম্পর্কে কোনো আলোচনা হয় নি।

সালাম খান জিজ্ঞাসা ক'রলেন, 'দলে রিক্রুট করার জন্য আপনি কারুর সঙ্গে যোগাযোগ ক'রেছিলেন কি ?'

'কে. এম. শামসুর রহমান ছাড়া আমি আর কারুর সঙ্গে যোগাযোগ করি নি।'

'শামসুর রহমান সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন ?'

'শামসুর রহমান সাহেব সি. এস. পি. পরীক্ষায় ফার্স্ট হ'য়েছিলেন। খুব মেধাবী ছাত্র।'

'পূর্বপাকিস্তানের কোনো বাঙালী সামরিক অফিসারকে কি আপনি চেনেন ?'

'কয়েকজনকে চিনি। তাঁরা হ'লেন কর্নেল রব, কর্নেল জাব্বার, কর্নেল রহমান, এবং লে. কর্নেল মাশকুরুল হক।'

'তাদের দলে আনার চেষ্টা ক'রেছিলেন কি ?'

'না।'

'ওসমানীর সঙ্গে দেখা ক'রতে যাওয়ার সময় ক্যাণ্টনমেণ্টের গেটে আপনার চোখে কী কী জিনিস পড়েছিল ?'

'একটা বাঁশের ফাঁড়ি, একজন সেন্ট্রি ও একটা সাইনবোর্ড।'

'আচ্ছা ওয়ারলেস-সেটের আকৃতি সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে কি ?'

'ওয়ারলেস সেট দুই-বাই-এক ফুট বা তারও ছোটো হ'তে পারে।'

'এ-ধরণের যন্ত্রে কতো দূরের খবরাখবর আদান-প্রদান করা যায় ?'

'জানি না।'

'ট্র্যান্সমিটার সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?'

'একটি রেডিও সেটে কিছু পার্টস সংযোজন ক'রলেই তাকে ট্র্যান্সমিটার-সেটে পরিণত করা চলে।'

'ওয়্যারলেস সেট সম্পর্কে আপনাদের সভায় কি কোনো আলোচনা হ'য়েছিল?'

'হ'য়েছিল। মোয়াজ্জেম হোসেনই জানিয়েছিলেন, আমাদের ৬টি স্লেভ সেট এবং একটি মাস্টার সেটের প্রয়োজন। স্লেভ সেটগুলো মাস্টার সেটের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।'

সালাম খান জিজ্ঞাসা ক'রলেন, 'বলতে পারেন—একটি ট্র্যানজিসটারাইজড এবং একটি ওয়্যারলেস সেটের মধ্যে পার্থক্য কী?'

'আমার জানা নেই।'

'আপনাদের দলের কেউ ওয়্যারলেসসেট ব্যবহার ক'রতে জানতেন কি?'

'যতটুকু জানি—কেউ জানতেন না।'

'আপনি কি জানেন যে করপোরাল সামাদ ওয়্যারলেস ইন্সপেক্টর ছিলেন?'

'আমি জানি না।'

এরপর সালাম খান বসে পড়লেন। এবারে উঠে দাঁড়ালেন পূর্বপাকিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী এবং বিশিষ্ট আইনজীবী আতাউর রহমান খান। তিনি জেরার গোড়াতেই জিজ্ঞাসা ক'রলেন 'আপনার প্রকৃত নাম কী।'

সাক্ষী একটু নীরব থেকে উত্তর দিলেন, 'রমিজউদ্দীন মোল্লা। ১৯৫৩ সালে বিমানবাহিনীতে চাকুরি নেওয়ার সময় আমি আমার নাম পরিবর্তন করি।'

'আপনি কি বোধাই মণ্ডলকে চেনেন?'

একটু ইতস্তত ক'রে সাক্ষী জবাব দিলেন, 'জী হ্যাঁ। তিনি আমার প্রপিতামহ। আমার পিতার নাম আলিমউদ্দীন।'

'রোজিয়া বিবিকে চেনেন?'

সাক্ষীকে এবার একটু ক্রুদ্ধ মনে হ'লো। বলল, 'না, চিনি না।'

আতাউর রহমান একটু হেসে বললেন, 'সে কি! নিজের খালাকে চেনেন না!'

সাক্ষী নীরব রইলেন। আতাউর রহমান সাহেব মুচকি হেসে বসে পড়লেন। তারপর আরও কয়েকজন দু'চারটি প্রশ্ন করার পর মির্জা মোহম্মদ রমিজের জেরা শেষ হ'লো। কয়েক দিনের জন্য অধিবেশনও মূলতবী রইল।

ক্যাণ্টনমেণ্টের বাইরে যখন এলাম, বেলাশেষের আলো তখন আমগাছের মাথায়। গাঢ় নীল আকাশে সাদা সাদা হালকা মেঘ ভেসে ভেসে যাচ্ছে।

ক্যাণ্টনমেণ্টের ছায়া-ছায়া রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে আমার বার বারই কেবল একটা কথা মনে হচ্ছিল, 'আগরতলা মামলা'টা দাঁড় করাতে আয়ুবকে তো বেশ কাঠখড় পোড়াতে হ'য়েছে। কিন্তু যত চেষ্টাই করুক শেখ মুজিবুর রহমান দেশদ্রোহী একথা পূর্বপাকিস্তানের সাড়ে ছয় কোটি লোক কখনোই মেনে নেবে না। গণ-আদালতে ভেস্তে যাবে সব জারিজুরি।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ২৮ জানুয়ারিটা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন। ওইদিন শেখ মুজিবুর রহমান, লেফটেন্যানট মোয়াজ্জেম হোসেন স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, প্রমুখরা তাঁদের বিরুদ্ধে সরকারি অভিযোগের জবাব দেন। দর্শকদের

গ্যালারিতে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না সেদিন। বাইরেও হাজার হাজার মানুষ।

আজও মনে আছে ঠিক দশটা বেজে পনের মিনিটের সময় শেখ মুজিব এসে আসামীর ডকে এসে উঠলেন। চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা। গুঞ্জন উঠল আদালত-গৃহে। শেখ মুজিব ডকে দাঁড়িয়ে চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। গুঞ্জন থেমে গেল। শুরু হ'লো তার জবাব : স্কুলের ছাত্র যখন, তখন থেকেই পাকিস্তান হাসিলের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ি আমি। প্রাক্-স্বাধীনতাকালে আমি মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলাম। পড়াশুনা ক্ষতি ক'রেও দেশের কাজ করে গেছি তখন।

স্বাধীনতা অর্জনের পর যখন দেখলাম মুসলিম লীগ জন-সাধারণের আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়নের পরিবর্তে কেবল ধোঁকা দিয়ে চলেছে, যখন দেখলাম যে-জন্য পাকিস্তান হাসিল হ'য়েছে সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'তে চলেছে, তখন আমরা ১৯৪৯ সালে হোসেন শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ গঠন ক'রলাম। আওয়ামীলীগ আইনসিদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান।

'৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হই আমি। আমি হু'হুবার পূর্বপাকিস্তান মন্ত্রী হই। আমি গণ-চীনে পূর্ব-পাকিস্তানের পার্লামেণ্টারি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলাম। জনগণের মঙ্গলের জন্য শক্তিশালী বিরোধী দল ক'রতে গিয়ে ইতি মধ্যেই আমি বহুবার জেল খেটেছি।

সামরিকশাসন জারির পর, বর্তমান সরকার আমার ওপর নানাভাবে নির্যাতন শুরু করে। পূর্বপাকিস্তান জননিরাপত্তা আইনে '৫৮ সালের ১২ অক্টোবর তারা আমায় গ্রেপ্তার ক'রে দেড় বছর হাজতে আটকে রাখে। আমি হাজতে থাকাকালেই তারা আমার বিরুদ্ধে গোটা ছয়েক 'ক্রিমিনাল কেস' শুরু করে। কিন্তু এসব

চক্রান্ত সত্ত্বেও আদালতে আমাকে তাঁরা দোষী প্রমাণ ক'রতে পারে না। আদালত আমাকে সসম্মানে মুক্তি দেয়।

জেলগেট থেকে বেরুতে-না-বেরুতে আমার ওপর এক আদেশ জারি করা হ'লো, ঢাকা ছেড়ে কোথাও যেতে হ'লে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। এবং ঢাকা পৌঁছে আবার তাদের জানাতে হবে আমার পৌঁছ-সংবাদ।

আমার নেতা সুহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে আমাকেও জননিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার ক'রে বিনাবিচারে ছয় মাস আটকে রাখে।

সুহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের মৃত্যুর পর জানুয়ারিতে আবার আওয়ামী লীগ পুনর্গঠিত হয়। আমরা সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রতিনিধি হিসাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মিস ফাতিমা জিন্নাহ্‌কে মনোনয়ন দিলাম। ফলে সরকার আবার আমার ওপর নিগ্রহ শুরু ক'রল।

যুদ্ধের সময় প্রেসিডেন্ট আয়ুব ঢাকায় এলে আমি তাঁকে বলি, পূর্বপাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন দিন। পূর্বপাকিস্তানকে সব দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ক'রে তুলুন। যুদ্ধের সময় বলতে গেলে পূর্বপাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিমপাকিস্তানের সব রকম যোগাযোগ বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। পূর্বপাকিস্তান যে-কোনো সময় আক্রান্ত হ'তে পারত। সেজন্য পূর্বপাকিস্তানকে সামরিক দিক থেকেও মোটামুটি প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

আমি তাসখন্দ চুক্তি সমর্থন ক'রেছি। আমি শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক সমস্যাসমাধানে বিশ্বাস করি।

গোড়ায় লাহোরে এক সর্বদলীয় সম্মেলন হয়। তাতে আমি পূর্ব-পশ্চিমের সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে আমার দলের পক্ষ থেকে আমি ছয়দফা প্রস্তাব দেই। পরে আমরা এই

ছয়দফার সমর্থনে জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে নানা স্থানে সভা অনুষ্ঠান ক'রতে থাকি।

তখন সরকার আবার আমার বিরুদ্ধে আধ-ডজন মামলা রুজু ক'রল। '৬৬ সালের এপ্রিলে যশোর থেকে আমায় তারা প্রথম গ্রেপ্তার ক'রল। আমি তখন খুলনায় এক মীটিং সেরে যশোর হ'য়ে ঢাকা ফিরে আসছিলাম।

সেইদিন রাতেই পুলিশ-প্রহরায় আমাকে সিলেট নিয়ে গেল। পরদিন মহকুমা হাকিম আমার জামিন নাচক করায় আমাকে জেলে পাঠানো হ'লো।

যশোর থেকে জামিনে খালাস পেলাম পরদিন। ঢাকা পৌঁছেই ঢাকা সদর মহকুমা হাকিমের কাছে হাজিরা দিলাম। কিন্তু জামিন পেলাম না। সেশন জজের কাছে আবেদন জানালাম। তিনি জামিন মঞ্জুর করায় ওইদিনই খালাস পেয়ে গেলাম। সাতটা নাগাদ বাড়ি পৌঁছলাম। আটটার সময়ই সিলেটে থেকে জারি করা এক গ্রেপ্তারি-পরোয়ানা নিয়ে হাজির হ'লো পুলিশ। অপরাধ, ওখানে এক জনসভায় আমি নাকি আইন-বিরোধী বক্তৃতা দিয়েছি।

সেই রাত্রেই পুলিশ-প্রহরায় আমাকে নিয়ে গেল সিলেটে। সিলেটের মহকুমা হাকিম আমার জামিনের আবেদন না-মঞ্জুর করায় হাজতে যেতে হ'লো আবার। পরের দিন সিলেটের সেশন জজ আমার জামিন মঞ্জুর করায় আমি মুক্ত হলাম। হায়, জেলগেটেই ফের ময়মনসিংহ থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এসে হাজির। অভিযোগ, ওই একটাই। সিলেট থেকে নেওয়া হ'লো আমাকে ময়মনসিং।

অন্যান্য স্থানের মতো ওখানকার মহকুমা হাকিমও জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করলেন। আমিও ঠিক আবার সেশন জজের

কাছে আবেদন করি, আবার মুক্তি পাই। এবারে ঢাকা ফিরতে পারলাম।' মুজিব একটু থামলেন।

আয়ুবের বশংবদ মহকুমা ম্যাজিস্টেটরা যে আয়ুবের নির্দেশেই শেখ মুজিবকে বেল দেননি এটা স্পষ্টই বোঝা যায়। আয়ুবের ষড়যন্ত্র, নীচতা এবং নির্লজ্জতায় সকলে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল।

শেখ সাহেব আবার সুরু ক'রলেন, 'মে-র গোড়ায় সম্ভবত ৮ মে, আমি নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে বাড়ি এলাম রাতে। রাত একটায় পুলিশ পাকিস্তান-রক্ষা আইনের ৩২ ধারায় আমাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে চলে গেল। তারপরই আমার দলের বহু নেতা এবং কর্মীকেও গ্রেপ্তার ক'রলেন সরকার।

আমার দলকে অনেক সময় সমর্থন করায় জনপ্রিয় দৈনিক 'ইত্তেফাক' প্রকাশনা নিষিদ্ধ ক'রে দিল, প্রেস বাজেয়াপ্ত ক'রল। পত্রিকার সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেনকে গ্রেপ্তার ক'রল। সরকার তাঁর বিরুদ্ধেও কতগুলো মামলা দায়ের করে।

আমার দল ৭ জুন আমাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এবং ছয়-দফার সমর্থনে সর্বাত্মক হরতাল ডাকল। হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে ১৩ জন নিহত হ'লো এবং ৮০০ কর্মী গ্রেপ্তার হলেন।

অনেকেই জানেন, অনেক সভায় মোনেম খান বলেছেন, আমি যতদিন ক্ষমতায় আছি, মুজিবকে হাজতেই থাকতে হবে।

গ্রেপ্তারের পর থেকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে অনেক দফা শুনানী চলে। ২১ মাস বাদে ১৮ জানুয়ারি বেলা ১টায় জেল থেকে খালাস পেলাম। কিন্তু জেলগেট থেকেই কিছু মিলিটারি অফিসার আমাকে জোর করে ধরে ঢাকা ক্যানটনমেণ্টে নিয়ে এলো।' একটু থামলেন আবার তিনি। বোধহয় সেদিনকার ছবিটা একবার ভেবে নিলে মনে মনে। শেখ সাহেবকে সৈন্যরা যখন নিয়ে যায়,

তিনি বুঝলেন, এবার আর তার নিস্তার নেই। তাই তিনি জেল গেটের সামনে থেকে খানিকটা মাটি তুলে, কপালে ছুঁইয়ে বললেন, মাগো তোমার কোলে জন্ম আমার, যেন তোমার কোলেই মরি, বার বার যেন তোমার বুকেই জন্মাই। যেমনটা বরিশালের কবি জীবনানন্দ বলেছিলেন :

'কখন মরণ আসে কে বা জানে—কালীদহে কখন যে ঝড়
কমলের নাল ভাঙে—ছিঁড়ে ফেলে গাংচিল শালিকের প্রাণ
জানি নাকে ;—তবু যেন মরি আমি এই মাঠ-ঘাটের ভিতর,

এবং

'আবার আসিব ফিরে এই ধান সিঁড়িটির তীরে—এই
বাঙলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে ;'

শেখ সাহেব আবার ধীরে ধীরে বলতে শুরু ক'রলেন, 'সেখানে একটা ঘরে আমাকে বন্ধ ক'রে রাখে। কারু সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ পর্যন্ত ক'রতে দেওয়া হয় না আমাকে। পত্রিকা পর্যন্ত দেখতে পারিনি সেখানে। বস্তুত দীর্ঘ পাঁচ মাস সারা পৃথিবী থেকে আমি সম্পূর্ণ নির্বাসিত ছিলাম। আমাকে এই সময়টা মানসিক নির্যাতন সইতে হ'য়েছে অনেক। শেষে এই মামলা শুরু হওয়ার একদিন আগে ১৮ জুন আমাকে আমার উকিল আবদুস সালাম খানের সঙ্গে দেখা ক'রতে দেওয়া হয়।

আমি বলছি, আমি কখনো লেফটেন্যাণ্ট কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, লেফটেন্যাণ্ট মোজাম্মেল হোসেন, প্রাক্তন কর্পোরাল আমির হোসেন, লেফটেন্যাণ্ট সার্জেণ্ট সুলতানউদ্দীন আহমদ এবং কামালউদ্দীন আহমদ, স্টুয়ার্ট মুজিবুর রহমান, ফ্লাইট সার্জেণ্ট মফিজুল্লাহ্ এবং সেনাবাহিনীর অন্যান্য লোকদের আমি চিনি না।

তিনজন সি. এস. পি অফিসারকে আমি চিনি। মন্ত্রী থাকাকালেই আমি তাদের চিনতাম।

আমি কখনো করাচিতে লে. কমানডার মোয়াজ্জেম হোসেন বা কামালউদ্দীনের বাসায় যাই নি। তারাও কখনো আমার ঢাকার বাসায় আসেন নি।

মানিক চৌধুরী একজন সাধারণ গোছের ব্যবসায়ী এবং সাইদুর রহমান একজন এল. এম. এফ. ডাক্তার মাত্র। আমার দলের হাজার হাজার কর্মীর মতোই তাঁরাও সাধারণ কর্মী ছিল মাত্র। তাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রতে পারি কি আমি? সাইদুর রহমানকে আওয়ামীলীগ থেকে সাসপেণ্ড করা হ'য়েছে।

আমি আওয়ামীলীগের প্রেসিডেন্ট। আমার দল আইনসম্মত একটি রাজনৈতিক দল। এর গঠনতন্ত্র এবং কর্মসূচী আছে। আমি ছয়-দফার ভিত্তিতে দুই অঞ্চলের মধ্যে শুধু বৈষম্য দূর ক'রতে চেয়েছি। যা কিছু ক'রতে চেয়েছি আমি শাসনতান্ত্রিক উপায়েই চেয়েছি। কিন্তু পূর্বপাকিস্তানের মানুষদের ওপর শোষণ চালিয়ে যাবার জন্য, তাদের দমিয়ে রাখার জন্য বর্তমান সরকার আমার বিরুদ্ধে বার বার ষড়যন্ত্র ক'রেছে।

. মাননীয় বিচারপতির কাছে আমার এই নিবেদন যে, আমাকে অন্যায়ভাবে এই ব্যপারে জড়ানো হ'য়েছে।

৬ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে যে প্রেস-বিজ্ঞপ্তি বের করা হ'য়েছে তাতে আমার নাম ছিল না। প্রেস-বিজ্ঞপ্তিতে বলা হ'য়েছিল, ধৃতব্যক্তিরা অপরাধ স্বীকার করেছে। তাঁদের সম্পর্কে তদন্ত প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। শিগ্‌গীরই কোর্টে মামলা তোলা হবে। আমি জানি গুরুত্বপূর্ণ প্রেস-বিজ্ঞপ্তিতে প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন প্রয়োজন।

এই মামলা আগেকার নির্যাতনেরই আর-একটা রূপ।

শাসকগোষ্ঠীর এটা একটা ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি কখনো পূর্বপাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার মতো কিছু করি নি।

আমি এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনঅবহিত।'

ডক থেকে নেমে এলেন শেখ মুজিব।

এবার উঠলেন ২নং আসামী লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম হোসেন। তিনি ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, 'গ্রেপ্তারের পর আমাকে ম্যাস্ট্রিটের কাছে এই মর্মে একটি বিবৃতি দিতে বলে যে, আমি শেখ মুজিবুর রহমান, ফজলুল কাদের চৌধুরী, এস. এম. মোর্শেদ, সি. এস. পি অফিসার এ. এফ. রহমান শামসুর রহমান এবং আরও অনেক নাম বলে গেলো, তাঁদের চিনি এবং বলি, তাঁরা সকলে স্বাধীন পূর্ববাঙলা আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। বিবৃতিতে যেন আরও উল্লেখ করি কমাণ্ডো স্টাইলে বিপ্লব করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান সৈনিকদের সংঘবদ্ধ ক'রতে বলেন আমাকে; বলি, ভারত আমাদের অর্থ এবং অস্ত্র সাহায্য দিচ্ছে মিস্টার ওঝার মারফত।

আমি এই ধরণের মিথ্যা বিবৃতি দিতে অস্বীকার করায় কর্নেল আমির ঘুঁসি মেরে আমার একটি দাঁত ভেঙে দেন। এই বলে লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম হোসেন আদালতে একটি ভাঙা দাঁত দাখিল ক'রলেন এবং বলতে লাগলেন, 'তারা আমায় আরও বললেন, আমি যদি তাঁদের কথানুযায়ী বিবৃতি দিই তাহ'লে আমার অবসর গ্রহণের আবেদন মঞ্জুর করা হবে এবং পেনসন দেওয়া হবে। অন্যথায় শেখ মুজিবুরের সঙ্গে আমাকেও ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠাবে। কর্নেল আমির বললেন, তুমি সহযোগিতা না ক'রলেও অনেকেই ক'রবে। বেসামরিক আদালতে যদি শেখ মুজিব রেহাই পায়-ও সামরিক আদালতে তার মুক্তিলাভের কোন চান্স নেই। মুজিবকে আমরা শেষ ক'রবই। আমাদের প্রেসিডেন্টের বড়ো শত্রু সে!

প্রলোভন এবং ভীতি সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রাজী হ'লাম না। শেখ মুজিব কখনো দেশদ্রোহী হ'তে পারেন না, তিনি দেশপ্রেমিক। পূর্ববাঙলার সাড়ে ছয় কোটি মানুষের নেতা তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে আল্লাহ্ আমায় ক্ষমা ক'রবেন না। বিবৃতি দিতে রাজী হইনি বলেই আক্রোশ বশতঃ আমার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা মামলা সাজিয়েছেন সরকার। আমি নির্দোষ।' কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইশ পৃষ্ঠার একটি লিখিত বিবৃতিও আদালতে দাখিল ক'রলেন তিনি।

লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম হোসেনের পর আসামীর ডকে দাঁড়িয়ে স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁর ওপর যে-নৃশংস নির্যাতন হ'য়েছে মর্মস্পর্শী ভাষায় তার বিবরণ দিতে থাকেন। তিনি বলেন, ৯ ডিসেম্বর ঢাকা থেকে আমাকে গ্রেপ্তার ক'রে প্রথমে রাজারবাগ, পরে কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যায়।

১১ ডিসেম্বর আবার আমাকে রাজারবাগ নিয়ে গেল। আমি একটা কক্ষে বসে আছি, একটু বাদে কয়েক শীট টাইপ করা কাগজ হাতে ঢুকলেন লেফটেন্যাণ্ট শরীফ। তিনি কাছে এসে টাইপ-করা সীটগুলো পড়ে গেলেন। তাতে বহু আর্মি অফিসার সি. এস. পি অফিসার এবং রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর নাম উল্লেখ ছিল। উল্লেখ ছিল, তাঁরা কীভাবে 'স্বাধীন পূর্ববাঙলা' গঠন ক'রবার চেষ্টা ক'রছেন। লেফটেন্যাণ্ট শরীফ আমাকে ওই তৈরি স্টেটমেণ্ট অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি বিবৃতি দিতে বললেন। বলতে বললেন, আমি তাঁদের চিনি এবং ওই দলে ছিলাম।

এই মিথ্যা বিবৃতি দিতে অস্বীকার ক'রলাম আমি। তখন একটা নির্জনকক্ষে নিয়ে গেল আমাকে। তারপর সুরু হ'লো

নির্যাতন। নখের ভিতর পিন ঢুকিয়ে দিল। রুল দিয়ে পিটোতে লাগল একটা লোক। জামাকাপড় রক্তে সপসপে হ'য়ে উঠল। নাক মুখ মাথা দিয়ে রক্ত গড়াল আমার। জ্ঞান হারালাম। বিকেল চারটের দিকে জ্ঞান ফিরলে দেখলাম মেজর নাসের ঘরে ঢুকছেন। তিনিও আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ওই মিথ্যা জবানবন্দী দিতে বললেন। আমি 'পারব না' বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড চড় কষালেন তিনি আমার গালে। মারপিটে আমার অবস্থা শোচনীয় হ'য়ে উঠল। শেষে ডাক্তারের পরামর্শে কয়েকটা দিন মারপিট বন্ধ রাখল তারা।

১৮ ডিসেম্বর আবার সুরু হ'লো অত্যাচার। ন্যাংটো ক'রে আমাকে বরফের মধ্যে শুইয়ে রাখল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় দশ মিনিটে শরীর জমে গেল। তখন কম্বলে জড়িয়ে অন্য ঘরে নিয়ে গেল।

পনেরো-ষোলো বারেরও বেশি মেজর নাসের, কর্নেল শরীফ আমাকে মিথ্যা বিবৃতি দিতে চাপ দেন। আমি অস্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গেই বারবার আমার ওপর ওমনি নৃশংস নির্যাতন চালানো হয়। বিবৃতি দিতে অস্বীকার করার জন্যই আমার বিরুদ্ধে পূর্ববাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ আনা হ'য়েছে।'

এমন সময় বাইরে স্লোগান ওঠে: 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই', 'মিথ্যা মামলা তুলে নাও', 'আয়ুবশাহী ধ্বংস হউক'। গ্যালারির ভিতর থেকেও একদল ছাত্র 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই' বলতে বলতে বেরিয়ে পড়ে। বাইরে এসে দেখি মিলিটারির প্রহরায় শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে যাচ্ছে ক্যাণ্টনমেণ্ট জেলে। জনতা স্লোগান দিচ্ছে তখনো। মিলিটারিরা রাইফেলের কুঁদো দিয়ে চার্জ সুরু করে। জনতা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে যায়। শেখ মুজিবকে নিয়ে মিলিটারিরা চলে গেল।

সেদিনকার মতো অধিবেশন মুলতবী রইল।

শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে সারা দেশ তখন উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে। আয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে তুরখাম থেকে টেকনাফ পর্যন্ত পাকিস্তানের বার কোটি মানুষ জেগে উঠেছে; ঘর-মাঠ-কল-কারখানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়—পুলিশ মিলিটারির বুলেট আর বেঅনেটের সামনে। কণ্ঠে তাদের ফেটে পড়েছে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ। পাকিস্তানের তখত তো গোলাম মোহাম্মদ-মির্জা-আয়ুবই কায়েমী ক'রে রেখেছেন। সাধারণের স্থান কোথায় সেখানে, পাকিস্তানের তখতে সত্যিকারের গণপ্রতিনিধি আজো আসেন নি। জনসাধারণের বিক্ষোভ এই সব কায়েমী শাসকদের বিরুদ্ধে। বিক্ষোভ শোষক আর শোষণের বিরুদ্ধে। কৃষক-শ্রমিকের রক্ত শুষে জড়ো ক'রছে যারা দেশের সমস্ত সম্পদ এই বিক্ষোভ তাদের বিরুদ্ধে। পাকিস্তানের মানুষ আর বুনিয়াদী নির্বাচনের ভাঁওতায় ভুলতে নারাজ। এই বুনিয়াদী নির্বাচনে আয়ুবকে হটানো যাবে না কিছুতেই। মাত্র এক লক্ষ বিশ হাজার বুনিয়াদী গণতন্ত্রী সাড়ে এগারো কোটি মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা হ'তে পারে না। শাসন-ক্ষমতা কায়েমী ক'রে রাখার চক্র হ'লো এই বুনিয়াদীগণতন্ত্রী নির্বাচন প্রথা। এ-চক্র ভেদ ক'রে আয়ুবকে হটানো দুঃসাধ্য। '৬৪ সালের নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহ্‌র পিছনে দাঁড়িয়েছিল সাড়ে দশ কোটি মানুষ। গ্রামে গ্রামে ঘুরে আজম খান তাঁর 'চাষীভাই, জেলে ভাইদের' কাছে ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। তবু ফাতেমা জিন্নাহ্‌ জিততে পারেন নি। তাই পাকিস্তানের মানুষের আজ প্রধান দাবি—প্রাপ্ত বয়স্কের ভিত্তিতে নির্বাচন, পার্লামেণ্টারি প্রথার পুনঃপ্রবর্তন এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। কায়েমীশাসনের অবসান ঘটাতে আজ পাকিস্তানের সাড়ে এগারো কোটি মানুষ আওয়াজ তুলছে, বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। রক্তে লেগেছে সর্বনাশের মাতন। নভেমবর ডিসেমবর

জানুয়ারি—একটার পর একটা মাস পেরিয়ে গেছে দুরন্ত বেগে। এসেছে শুধু খবরের পর খবর—মিছিল বিক্ষোভ সৈন্যতলব কার্ফু মৃত্যু। মহাত্মা অশ্বিনী দত্তের স্মৃতি-জড়িত বরিশাল টাউন-হলের নামকরণ করা হ'য়েছিল আয়ুব-হল। সাদা পাথরের বুকে কালো হরফে খোদাই ক'রেছিল সে নাম, কিন্তু বরিশালের সাধারণ মানুষের মনে দাগ কাটতে পারে নি তা। মুছে দিতে পারে নি তাদের হৃদয় থেকে মহাত্মা অশ্বিনী দত্তের নাম। বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিল টাউন-হলের ফটক থেকে আয়ুবের নাম মুছে দিয়ে লিখতে গেছে মহাত্মা অশ্বিনী দত্তের নাম। বাধা দিয়েছে পুলিশ। জনতা আর পুলিশে চলেছে লড়াই। টিয়ারগ্যাস লাঠিচার্জ—কিছুই রুখতে পারে নি হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ মানুষের অগ্রগতি। মিছিলের পর মিছিল এসে ভেঙে পড়েছে টাউন-হলে। কতো লোক জানি না, বিশ-ত্রিশ হাজারও হ'তে পারে। পুলিশ গুলি ছুড়েছে। রক্ত ঝরেছে। তাজা রক্ত। লাল সুরকি ঢালা পথ আরও লাল হ'লো। এ. কে. স্কুলের ছাত্র কিশোর আলাউদ্দীন শহীদ হ'লো। আরও জন হ'লো বুলেটবিদ্ধ। ক্রুদ্ধ ছাত্র আর জনতা ভেঙে গুড়িয়ে দিল আয়ুব-নামাঙ্কিত ফলক। শহীদের তাজা রক্তে লিখল মহাত্মা অশ্বিনী দত্তের নাম। কারও সাধ্য নেই মুছে ফেলে সে নাম।

বৈদ্যের বাজার (নারায়ণগঞ্জ) থেকে খবর আসে, ছাত্ররা সেখানে পূর্বপাকিস্তান পরিষদের কনভেনশন মুসলিমলীগের চীপ হুইপ এম. এ. জাহেরের বাড়িতে গিয়ে দাবি জানিয়েছিল কালো পতাকা তোলার। জাহেরের ভাই নূর মোহাম্মদ পুলিশের হাত থেকে রাইফেল কেড়ে নিয়ে বুলেটে দিয়েছে তার জবাব। লুটিয়ে পড়েছে একের পর এক ছাত্র। শহীদ হ'য়েছে দু'জন। আহত হ'য়েছে ১২ জন। কিন্তু বৈদ্যের বাজারের ক্রুদ্ধ মানুষের আক্রোশ থেকে বাঁচতে সপরিবারে জাহেরকে আশ্রয় নিতে হ'য়েছে ঢাকা

মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টে। জনতার আক্রোশ থেকে রেহাই পায় নি সেই কলঙ্কিত গৃহ। পুড়ে খাক হ'য়ে গেছে।

ঢাকায় গভর্নর হাউস থেকে হট লাইনে মোমেনের শুষ্ক এবং উদ্বেগজড়িত কণ্ঠে শুনতে পান আয়ুব একটার পর একটা ঘটনা। খবর যায় পশ্চিমপাকিস্তানের গভর্নর মুসার কাছ থেকে।

ঢাকা এলেন আয়ুব। বিমান-বন্দরে ভি. আই. পি. রুমে বসে সাংবাদিকদের আয়ুব বললেন, শীগ্‌গীরই জরুরি অবস্থা তুলে নেবার কথা ভাবছি। আর শাসনতন্ত্রও প্রয়োজনবোধে পাল্টানো যেতে পারে। শাসনতন্ত্র কোনো ঐশী বাণী নয় যে তার রদবদল করা চলবে না। দেশের মঙ্গল হয় এমন শাসনতন্ত্র গঠনে আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা ক'রতে রাজী আছি। আমি তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চাই। ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলোও বিবেচনা করা হ'চ্ছে। আয়ুবের স্বর নরম। আগেকার সেই জোরালো আওয়াজ আর নেই। একবারও আগের মতো দম্ভ ক'রে বলতে পারলেন না, বিশৃঙ্খলাকারীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

তেজগাঁ বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে উঠলেন গিয়ে বাইরে অপেক্ষমান বিরাট ফিকে সবুজ ক্যাডিলাক গাড়িটায়। যেতে যেতে পথের দু'পাশে দেখলেন, দোকান বাড়ি স্কুল ট্রাক বাস জীপ সাইকেল—সর্বত্র উড়ছে কালোপতাকা। সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় জ্বল জ্বল ক'রছে দেওয়ালে দেওয়ালে সাঁটা পোস্টারগুলি। তাতে লেখা: জালিম আয়ুব ফিরে যাও, ছাত্র হত্যার জবাব চাই, বুলেট নয় খাবার চাই, আপোস নয় সংগ্রাম, গোলটেবিলে নয় রাজপথে, ১১-দফা মানতে হবে, রাজবন্দীদের মুক্তি চাই, মনি সিংএর মুক্তি চাই, রাজ্জাক-দোলনের মুক্তি চাই, ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার কর ইত্যাদি। অনেক পোস্টারে কার্টুনও আঁকা রয়েছে। পোস্টার

দেখে অবাক হ'লেন মোনেম খান। বিমানবন্দরের দু'পাশের রাস্তার পোস্টারগুলো তো লোক লাগিয়ে ছিঁড়ে ফেলা হ'য়েছিল—এরই মধ্যে আবার কে সেঁটে গেল! লোকচলাচলও তো এদিকে নিষিদ্ধ! রমনা গ্রীনের পাশ দিয়ে প্রেসিডেণ্ট হাউসে ঢুকবার মুখেই আয়ুব দেখলেন, অদূরে সারিসারি ভাঙা একচালার ওপরেও উড়ছে কালোপতাকা।

১২ ফেবরুয়ারি ঢাকা ছাড়ার আগে আয়ুব সকল রাজবন্দীদের মুক্তির আদেশ দিয়ে গেলেন। দীর্ঘদিন বাদে কারাপ্রাচীরের বাইরে বেরিয়ে এলেন রাজবন্দীদের প্রথম ব্যাচটি। উল্লসিত জনতার পুষ্পমাল্যে সংবর্ধিত হ'লেন তাঁরা।

১৪ ফেবরুয়ারি।

ডাক আজ হরতালের ডাক দিয়েছে সারা দেশে। খাইবার থেকে টেকনাফ সারাদেশ সাড়া দিয়েছে সে ডাকে। রাস্তায় নেই যানবাহন। খোলা নেই দোকানপাট-বাজার-রেল-স্টিমার-বিমান-ডাক কিছুই। অন্যদিনের মতো রাস্তায় মিলিটারির একটা ভ্যানও দেখতে পেলাম না; পুলিশ পর্যন্ত না। সকাল থেকে লাল আর কালোঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল আসা সুরু হ'য়েছে পল্টনে। মিছিলের বুঝি শেষ নেই। কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনসাধারণ সকলের মিছিল। আজকের স্লোগান: 'হরতাল হরতাল,' 'আমার ঝাণ্ডা তোমার ঝাণ্ডা—লাল ঝাণ্ডা, লাল ঝাণ্ডা' 'চোখের মণি—মনি সিং-এর মুক্তি চাই', 'শেখ মুজিবের মুক্তি 'চাই—মুক্তি চাই,' 'কৃষক-শ্রমিক-ছাত্রনেতা এক হও—এক হও', সংগ্রাম চলছে চলবে,' ইত্যাদি। নগরে বন্দরে উত্তাল জনতরঙ্গের ওই একই গর্জন। চারটের মধ্যে পল্টন হ'লো জনতার সাগর। যতদূর দৃষ্টি যায়—শুধু মানুষ আর মানুষ, পতাকা আর পতাকা। লাল আর কালো পতাকা।

ডাক-নেতা মুজাফ্ফর আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম মিসেস

আমেনা বেগম, মহীউদ্দীন আহমদ, নুরুল আমিন, ফরিদ আহমদ, তোফায়েল আরও অনেকে বক্তৃতা দিলেন। ডাক দিলেন সংগ্রামের।

রাজশাহীর হাজার হাজার ছাত্র এগারোটা নাগাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে জমায়েত হ'য়েছিল সেদিন। উদ্দেশ্য, শোভাযাত্রা বের ক'রবে আয়ুবের জুলুমের প্রতিবাদে। শহরে একশ চুয়াল্লিশ ধারা রয়েছে। তাই ছাত্ররা ঠিক ক'রলো তিনজন তিনজন ক'রে বেরুবে। মিছিল বেরুতে যাবে এমন সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে এসে একটা মিলিটারি জীপ দাঁড়াল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট। দেখে ছাত্ররা উত্তেজিত হ'য়ে উঠল। প্রমাদ গুনলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা। ছাত্ররা ডক্টর জোহাকে খুব শ্রদ্ধা ক'রে, মানে। তাই ভাইস-চ্যানচেলার ডক্টর জোহাকে পাঠালেন অবস্থা আয়ত্তে আনতে। ডক্টর জোহা ছাত্রদের গেট থেকে ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে বাইরে অপেক্ষমান ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা ক'রলেন। বললেন, অযথা মিলিটারি আসায় ছাত্ররা উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে। অবিলম্বে মিলিটারিদের চলে যেতে বলুন। ম্যাজিস্ট্রেট রাজী হ'লেন। মিলিটারির প্রথম জীপটি চলে যেতে-না-যেতেই ছুটে এলো একটা মিলিটারিভ্যান। মুহূর্তে লোহার হেলমেট পরা সৈনিকরা লাফিয়ে পড়ল মাটিতে। কোনো হুঁশিয়ারি না ক'রেই গুলি ছুড়ল তারা এলোপাথাড়ি। ডক্টর জোহার সঙ্গে আরো কয়েকজন অধ্যাপকও ছিলেন। আত্মরক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ছুটে গেলেন তাঁরা। ছুটলেন ডক্টর জোহা। বেঅনেট উঁচিয়ে পিছনে ছুটে আসছে চার-পাঁচজন সৈনিক। ডক্টর জোহা হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। পিছন থেকে তিন চার জন মিলিটারি এসে বেঅনেটের খোঁচায় খোঁচায় রক্তাক্ত ক'রলো ডক্টর জোহাকে। ডক্টর জোহার আর্ত চীৎকারে মতিহারের রাস্তা কেঁপে উঠল। ভিতর থেকে কেঁদে

উঠল ছাত্ররা। কেঁদে উঠলেন অধ্যাপকরা। কেউ-এগিয়ে যেতে পারছেন না। তখনও এলোপাথাড়ি গুলি চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন রীডারকে এমন নৃশংসভাবে জখম ক'রতে পৃথিবীতে বোধ হয় একমাত্র আয়ুবের সৈন্যরাই পারে। মিলিটারিরা তুলে নিয়ে গেল সেই রক্তাক্ত দেহ।

ডক্টর জোহাকে হাসপাতালে নেওয়া হলো। হাজার হাজার ছাত্র শিক্ষক আর সাধারণ মানুষ হাসপাতালের প্রাঙ্গণে অপেক্ষা ক'রছেন। রাত নেই বিরেত নেই মখতুমহলের ছাত্রদের অসুখ-বিসুখে পাশে আছেন জোহা। ফুটবল খেলায় জিতেছেন ছাত্ররা—আনন্দোৎসবে যোগ দিচ্ছেন তিনি ছাত্রদের সঙ্গে। ছাত্রের কাঁধে হাত রেখে বন্ধুর মতো কতোদিন তাঁকে মতিহারের রাস্তায় বেড়াতে দেখা গেছে। 'ভাই' ছাড়া ছাত্রদের যিনি সম্বোধন করেন না, সেই স্বাস্থ্যবান ফুর্তিবাজ মানুষটি আজ মৃত্যুশয্যায়! সকলে ডক্টর জোহার খবর শোনার জন্য উদগ্রীব হ'য়ে রয়েছে। থম থম ক'রছে তাদের মুখ। কয়েকজন ছাত্র কেঁদে চলেছে। বেগম জোহার দুগাল বেয়ে গড়িয়ে চলেছে জলের ধারা। ভুলে গেছেন যে তিনি সন্তানসম্ভবা। কেঁদে কেঁদে বাইরের বেঞ্চিতে ঘুমিয়ে পড়েছে তাঁদের ছোট্ট মেয়ে সাবিনা।

রাত এগারোটায় খবর পাওয়া গেল, ডক্টর জোহা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রেছেন। সাবিনা বড়ো হ'য়ে হয়তো বাবার ফিকে স্মৃতি নিয়ে সান্ত্বনা পাবে। কিন্তু যে-শিশু এখনো পৃথিবীর আলো দেখে নি সে কী বলবে? সে যখন জিজ্ঞেস ক'রবে: মা গো, বাবা কোথায়? বেগম জোহা হয়তো বলবেন, জালিম আয়ুবের সৈন্যরা তোমার বাবাকে মেরে ফেলেছে। শিশু যখন ফের জিজ্ঞেস ক'রবে, কেন? কে দেবে সেই 'কেন'র জবাব? সারা দেশের মানুষের কণ্ঠেও সেদিন ছিল ওই একই প্রশ্ন?

কেন—কেন—কেন? মুখে তাদের ফুটে উঠেছে বজ্রকঠিন শপথ।

রাত তখন বারোটা। গাঢ় কুয়াশা জমেছে। সেই কুয়াশা ভেদ ক'রে মশাল হাতে মহল্লার লেন-বাইলেন থেকে হাজার হাজার মানুষ বেরিয়ে আসছে রাস্তায়। মনে হ'চ্ছে অসংখ্য কালো কালো ছায়া মশাল হাতে কুয়াশা ভেদ ক'রে এগিয়ে আসছে। মুখে তাদের স্লোগান: 'সান্ধ্য আইন মানি না,' 'ডক্টর জোহাকে হত্যার জবাব চাই', 'গণহত্যা চলবে না', 'আগরতলা ষড়যন্ত্রমামলা তুলে নাও', 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই', '১১-দফা মানতে হবে', ইত্যাদি। সেই স্লোগানে মধ্যরাত্রির ঘুমন্ত শহর জেগে উঠেছে। হাতের কাছে ছেঁড়া কাপড়-জামা যা পাচ্ছে খুঁটির মাথায় জড়িয়ে কেরোসিন ঢেলে মুহূর্তে মশাল বানিয়ে বেরিয়ে পড়ছে ছেলেরা রাস্তায়। কমলাপুরের দিকে বিশাল জনতা মশাল হাতে এগিয়ে চলেছে নবনির্মিত স্টেশনের দিকে; সৈন্যরা যে কোথায় ওঁৎ পেতে আছে, কুয়াশার জন্য বোঝা যাচ্ছিল না। যদিও মশালের আলোয় আলোকিত হ'য়ে উঠেছে অনেকটা জায়গা। এগিয়ে চলেছে বিশাল জনতা। কমলাপুর বাসডিপো অতিক্রম ক'রে টি এণ্ড টি স্কুলের সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল তারা শাহজাহানপুরের দিকে। মিছিলে মেহনতী মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। শাহজাহানপুরের রাস্তায় বসাবো-মুগাপাড়া থেকে আর একটি মিছিল এসে মিলল আগেকার মিছিলটির সঙ্গে। এগিয়ে চলল সেই দীর্ঘ মিছিল বড়ো রাস্তার দিকে। কোত্থেকে একটা মিলিটারি জীপ হঠাৎ এসে পথ আটকে দাঁড়ালো তাদের। মিছিল থেকে একজন গিয়ে জীপটিকে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ ক'রল। ফল হ'লো না। এগিয়ে চলল জনতা। মুহূর্তে জীপ থেকে চার-চারটে রাইফেল একসঙ্গে গর্জে উঠলো। লুটিয়ে পড়ল অনেকে। তবু থামল না তারা।

মগবাজার, পুরানো পল্টন, নয়া পল্টন থেকেও এগিয়ে আসছে অনেক মিছিল। রাতের নৈঃশব্দ্য বিদীর্ণ ক'রে স্টেনগান আর রাইফেলের আওয়াজ উঠছে থেকে থেকে। মিছিল, চারিদিকে শুধু মিছিল। নাখলিপাড়া, মালিবাগ, চৌধুরী পাড়া, খিলগাঁও, নওয়াবগঞ্জ, রামপুরা, হাতির পুল এলাকায়ও হাজার হাজার মানুষ মশাল হাতে বেরিয়ে পড়েছিল সেই রাতে। ক্যাট-ক্যাট-ক্যাট-ক্যাট শব্দে গর্জে উঠেছে সাব মেসিনগান। মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে বহু মানুষ। তবু তারা এগিয়ে গেছে হামাগুড়ি দিয়ে সামনে। কতো মায়ের বুক ভেঙেছে জানা গেল না সঠিক। কতো মায়ের আর্ত চীৎকারে সেই রাতটা হাহাকার ক'রে উঠেছিল জানি না আজও।

হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, মারা গেছে ৩০ জনের মতো, আহত হ'য়েছে ক'য়েক শ মানুষ। জানি, সঠিক হিসেব এটা নয়; আহত আর নিহতের সংখ্যা হয়তো এর কয়েকগুণ হবে। অবস্থা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত সঠিক খবর পাওয়া যাবে না। অনেকের কথা হয়তো কোনোদিনই জানতে পারা যাবে না।

শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হ'লেন আয়ুব। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'ই তুলে নেওয়া হ'লো। মুক্তি পেলেন মণি সিং, অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী, রাশেদ খান মেনন—সকলে।

২৪ ফেবরুয়ারি সংবর্ধনা হ'লো রেসকোর্স ময়দানে। একক-দশক-শতক নয় অযুত-লক্ষ-নিযুত জনতা দলে দলে হাজির হ'লো সেই সভায়। কণ্ঠে তাদের নতুন ফাগুয়ার নতুন গান ঃ

জেলের তালা ভেঙেছি
শেখ মুজিবকে এনেছি।
জেলের তালা ভেঙেছি
রাশেদ-মতিয়াকে এনেছি।

জেলের তালা ভেঙেছি
রাজবন্দীদের এনেছি।

সেই সংবর্ধনা সভায়ই ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ শেখ মুজিবকে ছাত্র এবং জনতার পক্ষ থেকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়ার প্রস্তাব দিল। বিপুল করতালিতে অভিনন্দিত হইলেন শেখ মুজিব। শেখ মুজিবুর রহমান সেদিন থেকে হলেন বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান।

অদূরে উপর্যুপরি কয়েকবার বোমা ফাটল। বোধহয় দু'দলে সংঘর্ষ চলছে। আজকের কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের এটা নিত্যনৈমিত্তিক চিত্র। পটকার আওয়াজে সংবিত এ'লো; ঢাকা থেকে ফিরে এলাম কলকাতায়। শাহাবউদ্দিনের চিঠিটা তখনো হাতে ধরাই ছিল। বাকি অংশটা পড়তে শুরু করলাম:

'উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান দিবস স্মরণে ২২ জানুয়ারি ঢাকার শিল্পী, সাংবাদিক, শিক্ষক-ছাত্রের এক বিশাল মৌন মিছিল বেরুয়। মিছিলের পুরোভাগে ছিল এক কালো ব্যানার। তাতে লেখা:

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।'

প্রত্যেকের খালি পা। হাতে লাল-কালোর ব্যাজ। অসংখ্য কালো পতাকা মাথাও ওপর। স্মরণকালের মধ্যে ঢাকায় এমন মৌন মিছিল হয়নি। নানা রাস্তা পরিক্রমণ শেষে সাড়ে এগারোটায় মিছিল এসে শেষ হ'লো বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।

একটা ভালো খবর দিচ্ছি, শোন। দীর্ঘদিন বাদে জানুয়ারির ৩ তারিখে আলো এসেছিল কুমিল্লা থেকে। আতোয়ারের মৃত্যুর

পর ওর সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। আতোয়ারের মৃত্যুর খবর আমি জানাতে পারিনি। আমার সাহস হয়নি ওর মুখোমুখি হবার। তবেও জেনে ছিল। সেদিন রেসকোর্স ময়দানে পূর্ববাঙলার নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ছিল। তা দেখতে এসেছিল।

দৃষ্টি যতদূর যায়, রেসকোর্স মাঠে সেদিন দেখা গেছে শুধু মানুষ, মানুষ আর মানুষ। মাঠে মানুষ, গাছে মানুষ, ছাদে মানুষ। পাবলিক লাইব্রেরি, ইনজিনীয়ারিং ইনসটিটুট বাঙলা একাডেমি, ঢাকা ক্লাবের রাস্তায় শুধু দেখা গেছে মানুষের ঢল। সংখ্যার হিসাবে গোনা তা মানুষের সাধ্যাতীত। পি. পি. পি আন্দাজ ক'রেছিল, কুড়ি লক্ষেরও বেশি। বাজনার তালে তালে লাঠির কসরৎ দেখাতে দেখাতে এসেছে অনেকে। জনতার মুখে সেদিন বার বার শোনা গেছে 'জয় বাংলা' ধ্বনি। শোনা গেছে তোমার দেশ আমার দেশ—বাঙলাদেশ বাঙলাদেশ 'জয় জয় জয়—বাঙলার জয়,' ইত্যাদি শ্লোগান। ময়দানের উত্তরপ্রান্তে নির্মিত হ'য়েছিল নৌকাকৃতি ১২০ ফুট দীর্ঘ মঞ্চ। নৌকোর হালের সঙ্গে ছিল ছয় দফা-এগারো দফার ব্যানার। পিছনের পর্দায় পূর্ববাঙলার বিশাল মানচিত্র আঁকা। তাঁরই মাঝে ছিল শেখ মুজিবের প্রতিকৃতি; পাশে জয় বাংলা স্লোগান লেখা। আর লেখা সোনালি ও রুপোলি জরিতে ছয়-দফা এগারো দফা শব্দ দু'টি। মঞ্চের চারপাশে উড়ছে সবুজের ওপর ছয় তারা খচিত আওয়ামী লীগের পতাকা। মঞ্চের সামনেই বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিকদের বসবার আসন এবং একপাশে দেশী-বিদেশী দুশো সাংবাদিকের বসবার ব্যবস্থা। ভাবী, মানে মুজিবের ভাইয়ের স্ত্রীও এসেছেন আজ সভায়। আমি যতটুকু জানি, স্বামীর জনসভায় এই তার প্রথম আসা। ভাবির চোখ-মুখ খুশিতে, গর্বে উজ্জ্বল। জীবনে

কম কষ্ট তো করেন নি, ক'টা দিনই বা কাছে পেয়েছেন স্বামীকে। শেখ সাহেবের বিবাহিত জীবনের বেশিটাই কেটেছে জেলে জেলে। ভাবীকে সংসার দেখতে হ'য়েছে। পাছে দেশের কাজে বিঘ্ন ঘটে, এইজন্য স্বামীকে কখনো তিনি বিব্রত করেন নি। এই যে দিনরাত বাড়িতে হাজার লোকের আনাগোনা, যত ঝক্কি-ঝামেলা সব তো তাঁকেই পোহাতে হয়।

যে-জনগণ শেখ মুজিবকে নির্বাচিত ক'রেছে, শেখ সাহেব ঠিক করেছেন, সেই জনতার দরবারেই তিনি শপথ নেবেন।

বেলা ঠিক দুটো বেজে দশ মিনিটে শেখ মুজিব এসে উঠলেন মঞ্চে। পরনে তাঁর সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। গায়ে হাফকোট। লোকে তার নাম দিয়েছে বঙ্গবন্ধু-কোট। গলায় জড়ানো সুদৃশ্য পশমী চাদর —হাতে পাইপ। শেখ মুজিব মঞ্চে উঠে দাঁড়াতেই জনতার সাগরে দোলা লাগল। আনন্দে আত্মহারা জনতা করতালিতে করতালিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত ক'রল। শেখসাহেবও হাত তুলিয়ে তাদের অভ্যর্থনায় সাড়া দিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের মুখ তখন দুর্লভ তৃপ্তির অনির্বাণ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। শেখ সাহেব আওয়ামী স্বেচ্ছাবাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ ক'রলেন। স্বেচ্ছাবাহিনীর প্রধান আবদুল রেজ্জাক এম-পি ছিলেন সেই বাহিনীর পুরোভাগে। রেজ্জাক আগে পর পর দু'বার ছাত্রলীগের সাধারণ-সম্পাদক ছিলেন। এর পর শেখসাহেব বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে নৌকার পাল উত্তোলন ক'রলেন। পালে আঁকা, পূর্ববাঙলার সবুজ মানচিত্র। তার পাশে, লালে লেখা 'জয়বাংলা'। ওই সময় সমবেত কণ্ঠে 'জয় জয় জয় জয় বাঙলার জয়' গানটি গেয়ে চলেছেন শিল্পীরা জাব্বারের পরিচালনায়। গানটির একটা লাইন শেখ-সাহেবের খুব প্রিয়। 'বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান' লাইনটি সময়ে-অসময়ে এমনকি সভা-সমিতিতেও আওড়াতেন তিনি। তারপর শেখসাহেব

ছয়দফা ও এগারো দফায় প্রতীক ১৭টি পায়রা উড়িয়ে দিলেন আকাশে। আবার নিযুত হাতের করতালিতে মুখরিত হলো ঢাকার আকাশ। পৌষের নির্মেঘ আকাশে পায়রাগুলোর অনেকে ডানা ঝাপ্টাতে ঝাপ্টাতে উড়ে গেল, মিলিয়ে গেল বিন্দু হ'য়ে। একটা পায়রা একটু উড়েই গিয়ে বসল নৌকোর পালে, 'জয় বাংলা' লেখাটার ওপর। আর একটা দু'-এক হাত উড়ে শেখ সাহেবের হাতেই এসে বসল। শেখ সাহেব পায়রাটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে হাসতে হাসতে বললেন, ওরা আমায় ছেড়ে যেতে চায় না।' জনতাও সেই আলতো হাসিতে যোগ দিল। শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে শেখ মুজিব সেদিন অনেক উপহার পান। সময় নষ্ট হবে বলে উপহারগুলো নেওয়া হয়েছিল আওয়ামীলীগ অফিসে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপহার দিয়েছে ছাত্রলীগ। তারা ৬-দফা ও ১১-দফার প্রতীক হিসাবে শেখ মুজিবকে ১৭টি রক্তগোলাপ উপহার দেন।

তারপর শুরু হ'লো শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠান। শেখসাহেবের অভিমত, আমরা জনতার প্রতিনিধি। জনতার দরবারেই আমরা শপথ নেব। শেখসাহেবের ডান পাশে এসে দাঁড়ালেন জাতীয় পরিষদের ১৫১ জন সদস্য এবং বামপাশে প্রাদেশিক পরিষদের ২৬৮ জন সদস্য। প্রত্যেকের হাতে শপথনামা। মাইকে শেখসাহেবের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কণ্ঠ মেলালেন আরও ৫১৮ জন জনতার প্রতিনিধি। তাঁদের ডান হাত শপথের ভঙ্গিতে উত্থিত ছিল। তাঁদের শপথ ছিল এই :

'আমরা—জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নবনির্বাচিত আওয়ামী লীগ সদস্যবৃন্দ শপথ গ্রহণ করিতেছি পরম করুণাময় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তালার নামে ;

আমরা শপথ গ্রহণ করিতেছি সেইসব বীর শহীদদের নামে,

যাঁহারা আত্মাহুতি দিয়া চরম নির্যাতন নিপীড়ন ভোগ করিয়া আজ আমাদের প্রাথমিক বিজয়ের সূচনা করিয়াছেন ;

আজ আমরা শপথ গ্রহণ করিতেছি এই দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র মেহনতী মানুষ—তথা সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের নামে ;

জাতীয় সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে এই দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মেহনতী মানুষ আওয়ামী লীগের কর্মসূচী ও নেতৃত্বের প্রতি যে বিপুল সমর্থন ও অকুণ্ঠ আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন, উহার মর্যাদা রক্ষাকল্পে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করিব ;

ছয়-দফা ও এগারো-দফা কর্মসূচীর উপর প্রদত্ত সুস্পষ্ট গণ-রায়ের প্রতি আমরা একনিষ্ঠরূপে বিশ্বস্ত থাকিব এবং শাসনতন্ত্রে ও বাস্তব প্রয়োগে ছয়-দফা কর্মসূচিভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন ও এগারো দফা কর্মসূচীর প্রতিফলন ঘটাইতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিব ;

আওয়ামীলীগের নীতি, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর প্রতি অবিচল আনুগত্য জ্ঞাপনপূর্বক অঙ্গীকার করিতেছি যে, অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষে মানুষে বিরাজমান চরম রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের চির অবসান ঘটাইয়া শোষণমুক্ত এক সুখী সমাজের বুনিয়াদ গড়িবার এবং অন্যায় অবিচার বিদূরিত করিয়া সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইব ;

জনগণ অনুমোদিত আমাদের কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রয়াসী যে-কোনো মহল ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে আমরা প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিব এবং সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা-কল্পে যে-কোনোরূপ ত্যাগ স্বীকার করতঃ আপোসহীন সংগ্রামের জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তুত থাকিব। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন। জয় বাংলা। জয় পাকিস্তান।

জনতার দরবারে এমন শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠান কে কবে দেখেছে! সে এক ইতিহাস।

তারপর শেখ সাহেব ভাষণ দিলেন। মাইকে মাইকে সারা রমনায় ছড়িয়ে পড়ল তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর: আজকের এই দিনে স্মরণ করি সেই সব শহীদদের যারা নিজের জন্মভূমিকে ভালোবাসার অপরাধে অত্যাচারী শাসকের মারণযজ্ঞে অকালে আত্মাহুতি দিয়েছে।

আজ স্মরণ করি সেইসব শহীদদের যাঁরা নিজের মায়ের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে গিয়ে পদলেহনকারী শাসকদের বুলেটে প্রাণ হারিয়েছেন। স্মরণ করি, সেইসব ছাত্রভাইদের গত ২৩ বছর বাঙালীকে মানুষের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আত্মাহুতি দিয়ে শহীদ হ'য়েছেন যারা। স্মরণ করি, ৭ জুনের সেইসব শহীদদের যাঁরা ছয়-দফার দাবি উচ্চারণ ক'রে বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়েছিলেন। স্মরণ করি গণ-বিস্ফোরণের বীর সন্তানদের।

যতদিন বাঙলার আকাশ থাকবে, যতদিন বাঙলার বাতাস থাকবে, যতদিন এদেশের মাটি থাকবে, যতদিন বাঙালীর সত্তা থাকবে, ততদিন শহীদদের আমরা ভুলতে পারব না। আমরা কোনোক্রমেই শহীদদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না। 'এই বিজয় সাতকোটি বাঙালীর বিজয়, দরিদ্র জনসাধারণের বিজয়।' একটু থামলেন তিনি। বিশাল জনতার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন, তারপর আবার জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলতে শুরু ক'রলেন, 'ইয়াহিয়া-সরকারের মধ্যে এমন একটা দল আছে যারা নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচন বানচাল ক'রে দিতে চেয়েছিল, যারা এখনও নির্বাচনের ফলাফল নস্যাৎ ক'রে দিতে চায়।

আমি জানি কয়েকদিন আগে ঢাকায় এসে তারা মীটিং ক'রে গেছেন। আমি জেনারেল ইয়াহিয়াকে অনুরোধ করি, এই ষড়যন্ত্রকারী দলটিকে সামলান, ঠাণ্ডা করুন। ষড়যন্ত্রকারীদের

বলি, আপনাদেরও কামান-বন্দুকে কাজ হয়নি, হবেও না। আপনাদের বিষদাঁত চিরতরে ভেঙে দেবার জন্য বাংলার জাগ্রত মানুষ লাঠি নিয়েই আপনাদের সঙ্গে লড়াই ক'রবে।

ভায়েরা আমার, চরম সংগ্রামের জন্য আপনাদের প্রস্তুত থাকতে হবে, ষড়যন্ত্রের ফলে গণতন্ত্র যদি ব্যর্থ ক'রে দেওয়ার প্রচেষ্টা হয়, আমি আপনাদের ডাক দেব। সেদিন আপনাদের চরম সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

এই ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে আমি যদি চিরতরে আপনাদের ছেড়ে যাই, আমার মৃত্যুর পর বঞ্চিতা দেশমাতৃকার আর গরীব-দুঃখিনী মানুষের মুখের দিকে চেয়ে আপনারা কি পারবেন আন্দোলন করে দাবি আদায় ক'রতে? শেখসাহেবের কণ্ঠ আবেগে আপ্লুত।

মুহূর্তে বিদ্যুস্পৃষ্টের মতো লক্ষ লক্ষ হাত ওপরে ওঠে। জনতার মুখে শোনা যায়: পারব। পারব। আর বুকে তাদের তখন গুঞ্জরণ চলছে: নেতা আমাদের, বন্ধু আমাদের, তুমি এগিয়ে চলো, মাভৈঃ। আমার আছি তোমার পিছনে।

বীর প্রসবিনী বাঙলার মানুষের এই প্রত্যয়-দৃঢ় শপথবাণী শুনে নেতার মুখে অলৌকিক দ্যুতি খেলে গেল। শীতের মিঠে নরম রোদ তখনও মাঠময় ছড়িয়ে রয়েছে।

এরপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে শেখসাহেব তাঁর স্বভাবসুলভ কণ্ঠে জোর দিয়ে দিয়ে বলে চললেন, 'দ্রব্যমূল্যের বিরুদ্ধে গূঢ় কারসাজি আছে। গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলতে চায়। তাদের বলি, জিহ্বা সংযত করুন, নয়তো জিহ্বা কেটে দেব। [জনতার করতালি]

আইন ক'রে শিল্পের মালিকানা শ্রমিকের মধ্যে বণ্টন ক'রে দেওয়া হবে। আওয়ামী লীগকে টাকা দিয়ে বশ করবার ক্ষমতা কোনো শিল্পপতির নেই।

উত্তরবঙ্গের ভাইবোনেরা শোনো, ইনশ্‌আল্লাহ্‌ যমুনা নদীর পুল হবে, রূপপুর-প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। বুড়িগঙ্গা-শীতলক্ষ্যায়ও পুল হবে।

যে-শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের কল্যাণে আসে না, তা বাতিল করা হবে।

সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে বলেন, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ভাইয়েরা আপনারা শুনে রাখুন, আপনারা পাকিস্তানের সমান নাগরিক। আপনাদের ওপর এযাবৎ ক্ষেত্র বিশেষে অত্যাচার হ'য়েছে জানি, আমি আপনাদের এই আশ্বাস দিচ্ছি আর আপনাদের ওপর অত্যাচার হবে না।

তারপর সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশে বলেন, 'আপনাদের খাসিলৎ পরিবর্তন করুন। মনে রাখবেন, আপনারা যাদের ওপর ডাণ্ডা ঘুরান, সেইসব দরিদ্র মানুষের টাকায়ই আপনাদের সংসার চলে। আপনারা দুর্নীতি পরিহার করুন। ইয়াহিয়া ৩০৩ জনকে ছাঁটাই করেছেন, আমরা আর তা ক'রব না। জনসাধারণকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দেব—ওই যে দুর্নীতিবাজ কর্মচারী। তাদেরকেই বলব—সাফ করো ওই জঞ্জাল।

বড়োকে আর বড়ো হতে দেব না। ছোটোকে আর ছোট হতে দেওয়া হবে না। সমাজে ছোট-বড়র ভেদাভেদ তুলে দেব। ব্যাংক বীমা কোম্পানী অবশ্যই জাতীয়করণ করা হবে।

আওয়ামীলীগের কেউ যদি আপনাদের স্বার্থের সঙ্গে বেইমানী করে, তবে তাকে জ্যান্ত কবর দিন।'

মুহুর্মুহু করতালির মাঝে শেখসাহেব এক সময় তাঁর ভাষণ শেষ ক'রলেন।

ফিরে চলেছে জনতার দল। মুখে তাদের তৃপ্তির আলোক। শপথের দৃঢ়তা।

ইউনিভার্সিটির সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আলো সেদিন আমায় বলল, ওদের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। বাঙলার মানুষ জেগেছে। বন্দিনী মায়ের মুক্তির আর দেরী নেই।

আনোয়ারের নামটা ও মুখে উচ্চারণ ক'রল না। ও দুঃখ পাবে বলে আমিও কিছু বললাম না।

আলো পরের দিনই কুমিল্লা চলে গেল। বলে গেছে, একুশে ফেবরুয়ারিতে আসবে। অনেক হ'লো। আজ এখানেই শেষ ক'রছি।

তোর শাহাব

.ক

রি ও

ার ওপর

শীত গেল, এলো রক্ত-পলাশের দিন। একুশে ফেবরুয়ারি। মুখের ভাষার জন্য বুকের রুধির ঢেলে দিয়েছিল এইদিন বাঙলা মায়ের দামাল ছেলেরা। একুশে ফেবরুয়ারি বারবার আসে কিন্তু বার বার তার চেতনার রঙে নতুনের ছোঁয়া নিয়ে আসে। ভাষা-আন্দোলনের চেতনা পূর্ববাঙলার মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত সাহিত্য আর সংস্কৃতিকে বরফ-গলা নদীর জলের মতো সমৃদ্ধতর ক'রেছে। ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিতে গড়ে উঠেছে পূর্ববাঙলার শিল্পসাহিত্যের প্রগাঢ় নিকুঞ্জ। বায়ান্নর একুশ মনীষা জুগিয়েছে উনসত্তরের গণ-জাগরণের; স্বাধিকার হারা মানুষ হ'য়ে উঠেছে অধিকারসচেতন; বাক্‌রুদ্ধ হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠ সোচ্চার হ'য়ে উঠেছে, মিছিলে, মিছিলে। একুশের: প্রাণ-প্রবাহে, একুশের চেতনায়, একুশের প্রেরণায় আজও মানুষ লড়ছে। একুশ পূর্ববাঙলার সংগ্রামমুখর পথযাত্রাকে দেখিয়েছে আলোর ইসারা। একুশের স্মৃতিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে বিরাট শহীদ মিনার। এ মিনার শুধু স্মৃতির মিনার নয়, এ মিনার বাঙালীর সংগ্রামমুখর দুস্তর পথযাত্রাকে অনুপ্রেরণা দেয় মাভৈঃ মন্ত্রে। আমার দুঃখ, আলো, প্রজেশ, শাহাবউদ্দীন ওদের পাশে পাশে মিনারে মাজারে গিয়ে দু'হাত ভরে ছড়িয়ে পারব না রক্তগোলাপ। দূর থেকে আমার সালাম জানালাম রফিক-বরকত-সালাম-রফিক-জাব্বারের উদ্দেশে।

কয়েকদিন বাদে একটা চিঠি পেলাম ঢাকা থেকে। আমি ভাবতেও পারিনি আলো আমাকে চিঠি লিখবে। এতদিন আমিও লিখিনি, লিখতে সাহস পাইনি।

আলো লিখেছে :

সাথী,

কেমন আছ ?

যেখানেই থাকি না কেন, জানতো একুশের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারি না। আসব না ভেবেছিলাম। তবু না এসে পারলাম না সাথী। 'আমার ভাইয়ের রক্তে-রাঙানো একুশে ফেবরুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি?' একুশে ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকা যায় না যে।

শহীদদিবসের এমন প্রস্তুতি, এমন সাড়া আর কখনো দেখিনি। পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠছে শহীদ-মিনার। আগের দিন (শনিবার) রাত বারোটা বেজে এক মিনিটে মাজার জিয়ারত দিয়ে উদ্বোধন হ'লো এক শহীদ-দিবসের। মুজিবভাই মাজারে পরম শ্রদ্ধাভরে তুলে দিলেন প্রথম ফুলের তোড়া। তারপর দিলেন আরও অনেকে তাজউদ্দীন আহমদ, কামরুজ্জামান, গাজী গোলাম মোস্তাফা, তোফায়েল আহমদ, ওবায়েদুর রহমান, প্রমুখ আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ। ফুল ছড়িয়ে দিলাম আমরা, ছিল ছাত্রছাত্রীরা, দিলেন শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিকরা। সকলেরই খালি পা বুকে কালো ব্যাজ। মেয়েদের শাড়ির পাড় কালো।

সেখান থেকে এক দীর্ঘ মশাল মিছিল বেরুল। আগুনের শিখায় দীপ্ত হ'য়ে চেনা-অচেনা হাজারো মুখ। রাতের অন্ধকার অপসৃত হ'লো। মুজিবভাই নেতৃত্ব দিলেন সেই মশাল-মিছিলের। আমরা তার পিছনে। আমাদের মধ্যে এক শাহাবউদ্দীনের হাতেই ছিল মশাল। হাত বদল ক'রে প্রজেশ আর আমিও নিলাম, যেমনটা নিয়েছিলাম উনসত্তরে।... আজিমপুর গোরস্তান থেকে শহীদমিনার পর্যন্ত সারাটা রাস্তায় আলপনা দিয়ে রেখেছে চারু ও কারু কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। কী বলব! সেই আলপনার ওপর

দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে কী এক অনুভূতি আমার অসাড় করে' ফেলল। মশাল মিছিল গিয়ে পৌছল শহীদ-মিনারে। সকলে শহীদমিনারে ছড়িয়ে দিলাম হাতের ফুলগুলি। ফুলে ফুলে ভরে গেছে সারাটা বেদী। শেখসাহেব শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে জনতার উদ্দেশে দৃপ্ত ভাষণ দিলেন। বললেন, বাঙলার মানুষ যাতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক স্বাধিকার নিয়ে বাঁচতে পারে, জীবন দিয়ে শহীদরা সেই পথই দেখিয়ে গেছেন। '৫২ সালের রক্তদানের পর, —বার বার বাঙালীকে রক্ত দিতে হ'য়েছে। কিন্তু স্বাধিকার দাবির পিছনে আজও ষড়যন্ত্র চলছে। এই ষড়যন্ত্র প্রতিহত করবার জন্য বাঙলার ঘরে ঘরে প্রস্তুতি চালাতে হবে। এবার চূড়ান্ত সংগ্রাম। আর এই সংগ্রামে আমরা গাজী হ'য়ে ফিরে আসতে চাই। তাই বাঙলার প্রতিটি ঘরকে এক-একটি স্বাধিকারের দুর্গে পরিণত করুন। দেখিয়ে দিন বাঙালীকে পায়ের নিচে দাবিয়ে রাখার শক্তি পৃথিবীর কারু নেই।। সেই সব ষড়যন্ত্রকারী শোষক গণ-দুশমনের দল যারা বার বার বাঙালীর রক্তে এদেশের মাটি লাল করেছে, যারা নির্মম শোষণ-লুণ্ঠনে বাংলার মানুষকে কাঙালে পরিণত করেছে, তারা আজও নিজেদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার চক্রান্তে লিপ্ত।

এই ষড়যন্ত্রকারীরা জেনে রাখুন, '৫২ সাল আর এক নয়। আমরা ষড়যন্ত্রকারীদের বিষদাঁত ভেঙে দেব।

কারু প্রতি আমাদের আক্রোশ নেই, বিদ্বেষ নেই। আমরা চাই স্বাধিকার। আমরা চাই আমাদের মতোই পাঞ্জাবী, সিন্ধি, বেলুচ, পাঠানরাও নিজ নিজ অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকুন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কেউ আমাদের ওপর প্রভুত্ব করবে। ভ্রাতৃত্বের অর্থ দাসত্ব নয়। সম্প্রীতি বা সংহতির নামে বাঙলাকে আর কলোনী বা বাজার হিসাবে ব্যবহার ক'রতে দেওয়া হবে না।' একটু থেমে

কণ্ঠে বজ্রের মতো জোর এনে তিনি বললেন, 'দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টির এত বড় রায়ের পরও যারা সাত কোটি বাঙালীর স্বাধিকারের দাবি বানচালের ষড়যন্ত্র ক'রছে, বাঙালীদের ভিখারী বানিয়ে, ক্রীতদাস করে রাখতে চাচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্য যে-কোনো মূল্যে ব্যর্থ করে দেওয়া হবে।'

শেখসাহেবের কণ্ঠ এবার ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে, সামনে আমাদের কঠিন দিন। আমি আপনাদের মাঝে নাও থাকতে পারি। মানুষকে তো একদিন মরতেই হয়। আমি জানি না, আবার কবে আপনাদের সামনে এসে ফের দাঁড়াতে পারব। তাই আজ আমি আপনাদের, বাঙলার সকল মানুষকে ডেকে বলছি, চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হোন, বাঙলার মানুষ যেন আর শোষিত-বঞ্চিত না হয়, বাঙালী যেন আর অপমানিত লাঞ্ছিত না হয়, শহীদের মাঝে নাও থাকতে পারি। মানুষকে তো একদিন মরতেই হয়। আমি জানি না, আবার কবে আপনাদের সামনে এসে ফের দাঁড়াতে পারব। তাই আজ আমি আপনাদের, বাঙলার সকল মানুষকে ডেকে বলছি, চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হোন, বাঙলার মানুষ যেন আর শোষিত-বঞ্চিত না হয়, বাঙালী যেন আর অপমানিত লাঞ্ছিত না হয়, শহীদের রক্ত যেন বৃথা না যায়। যতদিন বাঙলার মানুষ বেঁচে থাকবে, যতদিন বাঙলার আকাশ বাতাস, মাঠ নদী থাকবে, ততদিন তারা চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে।

সেই বীর শহীদের অতৃপ্ত আত্মা আজ দুয়ারে দুয়ারে ফরিয়াদ ক'রে ফিরছে : বাঙালী তোমরা কাপুরুষ হ'য়ো না। চরম ত্যাগের বিনিময়ে হ'লেও স্বাধিকার আদায় করো। আমিও আজ শহীদ মিনারে দাঁড়িয়ে বাঙলার মানুষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। বাঙালী প্রস্তুত হও, স্বাধিকার আমরা আদায় ক'রবই।'

মশালের আলো তখন নিভতে শুরু ক'রেছে। পুব আকাশে আলোর ছোপ লেগেছে। গাছের ডালে ডালে পাখির কলরব জাগছে। শহীদ মিনারের দিকে তখন লোকের দল আসছে। রাতে কারু চোখে ঘুম ছিল না। এবারকার শহীদদিবস ছিল স্বাধিকার আদায় এবং শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েমের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার শপথ। বাঙলামায়ের দামাল ছেলেমেয়েরা শহীদবেদী ছুঁয়ে শপথ নিল। 'মাগো তোমায় মুক্ত ক'রব শপথ নিলাম।' কার্জনহলের ঈষৎ কুয়াশা-ভেজা দূর্বাঘাস মাড়িয়ে মাড়িয়ে প্রেস-ক্লাবে এলাম। সাংবাদিক-ইউনিয়নের উদ্যোগে সেখানে চলছে গণ-সংগীতের আসর। আমরা গিয়ে শেষটুকু দেখেছি। তখন ভোর-ভোর। ভোরের বাতাসে, একুশের গানে হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে এক আশ্চর্য শিহরণ জাগে।

সেখান থেকে বাড়ি ফিরে এলাম। সাথী, ভাবছিলাম তোকে একটা কথা বলব না। কিন্তু না বলে পারলুম না। যখন শাহাবউদ্দীনের হাত থেকে মশাল তুলে নিলাম আমার মনে পড়ে গেল, আতোয়ারের কথা। ঊনসত্তরের-মশাল এমনি ক'রে মশাল হাতে এগিয়ে গিয়েছিল আতোয়ার। ওর পাশে পাশে গিয়েছিলাম আমি, তুই, প্রজেশ। আতোয়ার আজ নেই। বুকটা কান্নায় উথলে উঠল। বাড়ি ফিরে দীর্ঘক্ষণ কাঁদলাম—প্রাণ ভরে কাঁদলাম।

জানো সাথী, আতোয়ারের মৃত্যুর পর এমন ক'রে অনেকদিন কাঁদিনি, কাঁদতে পারিনি। আজ বাঙলা মায়ের মুক্তির দিন যতই ঘনিয়ে আসছে, আমার সারা হৃদয় মথিত ক'রে একটা কথাই বারবার মনে হ'চ্ছে, আহা, আতোয়ার ওর সাধের 'স্বাধীন বাঙলা দেশ' দেখে যেতে পারল না।

যতই ষড়যন্ত্রই হোক, আজ যে রকম গণ-জাগরণ দেখছি তাতে

তোকে বলে রাখলাম সাথী, বাঙলার স্বাধীনতার আর বেশি দেরি নেই।

মাঝে মাঝে দু'একটা ছত্র লিখে খোঁজ নিস।

তোর

মেমসাহেব

আলোর চিঠি পড়তে পড়তে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল যে-রকম ষড়যন্ত্র চলছে, তাতে শেষ পর্যন্ত পূর্ববাঙলা পশ্চিমা শাসক আর শোষকের হাত থেকে মুক্তি পাবে কি?

১৫ ফেবরুয়ারি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের পরামর্শ দিয়েছিলেন শেখসাহেব। ইয়াহিয়া খান কিন্তু ভুট্টোর কথামতো ৩ মার্চ পরিষদের অধিবেশন ডাকলেন। তবু অধিবেশনের দিন যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল, ভুট্টোর টালবাহানা বেড়ে চলল ততই। ভুট্টো একবার বললেন, আমার দল অপজিশনে বসবে। আবার বললেন, আমরা বিরোধীদলের আসনে বসবার ভাগ্য কিছুতেই মেনে নেব না। শুধু তাই নয়, তিনি আরও এক পা এগিয়ে বললেন, ওসব মেজরিটি-ফেজরিটি বুঝি না, আওয়ামীলীগের সঙ্গে আমিও ক্ষমতার সমান বখরা চাই। রক্ষে এই, ভুট্টোর পাগলামিতে সাড়া দিলেন না কেউ—না মুজিব, না ইয়াহিয়া, না অন্য কোনো রাজনৈতিক দল।

এর পর ভুট্টো হাইজ্যাকিং-এর বিষয়টা নিয়ে একটা জাতীয় সংকট পাকিয়ে তোলার চেষ্টা ক'রলেন। তিনি বললেন, যে-কোনো সময় ভারত আক্রমণ ক'রতে পারে। তাই পশ্চিম-পাকিস্তান অরক্ষিত রেখে আমরা পূর্বপাকিস্তানে যাই কী করে? ভারত কিন্তু বার বার ঘোষণা ক'রেছেন। আমরা বিষয়টা নিয়ে

এমন কিছুই ক'রতে চাই না। যাতে ইয়াহিয়া-সরকার নির্বাচনটা ভেস্তে দেওয়ার অজুহাত পায়।

ভুট্টোর এই চেষ্টাও ব্যর্থ হ'লো। তখন তিনি হুমকি দিলেন, আওয়ামী লীগ যদি শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে তাঁর দলকে স্থান না দেয়, ছয়-দফার প্রশ্নে আপোস না করে, তা'হলে তিনি পরিষদ বয়কট ক'রবেন। সেইসঙ্গে তিনি পশ্চিমপাকিস্তানে অন্যান্য দলকেও হুমকি দিলেন, পশ্চিম-পাকিস্তানের কেউ যদি পরিষদ-অধিবেশনে যোগ দিতে ঢাকা যান, তাহ'লে তাঁকে তিনি দেখে নেবেন। তাঁর হুমকিকে কেউ আমলেই আনল না। অধিবেশনের কাজ এগিয়ে চলল। কায়ুম খান ছাড়া আর সব দলই পরিষদ-অধিবেশনে তাদের যোগদানের সিদ্ধান্ত জানাল। যতই অধিবেশনের দিন ঘনিয়ে আসতে লাগল, ভুট্টো ততই অস্থির হ'য়ে উঠলেন। তিনি বুঝলেন, তাঁকে কেউ আমলেই আনছেন না। এবং তাঁকে ছাড়াই তিন-চতুর্থাংশ ভোটে আওয়ামীলীগের শাসনতন্ত্র পাশ হ'য়ে যাবে। তাঁর জন্য আটকাবে না। তিনি পরিষদ-অধিবেশনে যোগ না দিলে বরং শেখ মুজিবের সুবিধাই হবে। তাই পরিষদ-অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য মনে মনে তিনি ব্যগ্র হ'য়ে উঠলেন। দলের ভিতর থেকেও তাঁর ওপর চাপ আসছিল খুব। অথচ এত কাণ্ডের পর তিনি কোনো অজুহাত ছাড়া পরিষদে যোগ দেনই-বা কেমন করে। মনে থাকে না যে, তিনি তাই সুর নামিয়ে তাঁর পরিষদে যোগ দেওয়ার প্রশ্নে একটি সাধারণ সর্ত দিলেন। বললেন, শেখমুজিবের সঙ্গে আলোচনার জন্য হয় কয়েকদিনের জন্য অধিবেশন মূলতবী রাখা হউক অথবা শাসনতন্ত্র-প্রণয়নের সময় সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হোক।

সেই সময় পরিষদের স্পীকার পর্যন্ত ঢাকায় গিয়ে হাজির। পশ্চিমপাকিস্তানের অনেক পরিষদ-সদস্যও ঢাকায় চলে গেছেন।

১ মার্চ দুপুরের খবরে প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান নির্ধারিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা ক'রলেন। খবরটা পেতেই পূর্ববাঙলার মানুষ ক্রুদ্ধগর্জনে ফেটে পড়ল। ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় নেমে এলো বিক্ষুব্ধ মানুষের খণ্ড খণ্ড মিছিল। দোকান-পাট বন্ধ হ'য়ে গেল ঝপাঝপ্। একদল লোক গিয়ে 'নাজ' সিনেমাহলে আগুন লাগিয়ে দিল। স্টেডিয়ামে বিশ্ব একাদশ এবং বি সি সি পি-র মধ্যে ক্রিকেট খেলা চলছিল। দর্শকরা খবর পেতেই 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে দিতে গ্যালারি ছেড়ে বেরিয়ে এলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছিল ক্লাস, চলছিল পরীক্ষা। সব বাতিল হ'য়ে গেল স্কুল-কলেজ কল-কারখানা অফিস-আদালত থেকে বেরিয়ে এলো অগণিত ছাত্র-শিক্ষক শ্রমিক কেরানী। টেলিগ্রাম টেলিফোন ডাকবিভাগ এবং বিমানবন্দরের কর্মীরাও সেই বিক্ষোভ-মিছিলের সামিল হ'লো। যোগাযোগ বন্ধ হ'য়ে গেল বাইরের জগতের সঙ্গে। তেজগাঁ বিমানবন্দরের কাছে মিলিটারি আর জনতায় সংঘর্ষ হ'লো। ১ জন মারা গেল। কম করেও ৭ জন আহত হ'লো। রাত ৮টা থেকে ভোর ৭টা পর্যন্ত কারফিউ জারি হ'লো।

ওইদিনই ইকবাল হলের একটা ঘরে বসে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের নেতারা সিদ্ধান্ত নিলেন 'স্বাধীন ও সার্বভৌম বাঙলাদেশ ঘোষণার', সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'লো বাঙলাদেশের জাতীয় সংগীত হবে বাঙালীর জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালোবাসি' সংগীতটি ; সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'লো, পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে বাঙলাদেশের নিজস্ব জাতীয় পতাকা ব্যবহার

করার। এ-সবকিছু সিদ্ধান্তের পিছনে যাঁর মাথা, নাম তার সিরাজুল আলম খান। ঢাকার ছাত্রদের সকলের শ্রদ্ধার, ভালোবাসার 'সিরাজভাই' তিনি।

মঞ্চে আমরা তাঁকে দেখিনি, কিন্তু ছাত্র এবং গণ-আন্দোলনের নেপথ্য-নায়ক এই সিরাজুল আলম খান। ছাত্ররা কেউ-বা তাঁকে ডাকেন 'মাও সে তুং' কেউ-বা 'চে-গুয়েভারা'। আওয়ামী লীগের প্রবীণেরা তাঁকে বলেন, 'কমিউনিস্ট'। সাম্প্রতিককালে পূর্ববাঙলার ছাত্র এবং গণ-আন্দোলনকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা মূলত শেখ মুজিব (তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা সহ) এবং তাঁর। পূর্বপাকিস্তান ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তিনি। এখন কেউ নন, আওয়ামী লীগেরও নন। ঢাকার ছেলেরা বলেন, চার আনার সদস্যও নন। কিন্তু তিনি অনেক কিছুই। ছাত্রলীগের একজন প্রভাবশালী সদস্যের কাছে শোনা একটা ঘটনার উল্লেখ করছি এখানে। ঢাকায় যখন শেখ মুজিবুরের ডাকে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল, তখন একজন ইতালীয় সাংবাদিক শেখ মুজিবুরকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার উপদেষ্টা কে? উত্তরে মুজিবুর রহমান তাঁকে একটু অপেক্ষা ক'রতে বলে ফোন করেন, 'সিরাজ তুমি এক্ষুনি আমার বাড়ী চলে এস।' মোটরসাইকেল চড়ে সিরাজুল আলম খান শেখ সাহেবের বাড়ি পৌছুতেই শেখ সাহেব হেসে সিরাজুল আলম খানকে দেখিয়ে ইতালীয় সাংবাদিকটিকে বললেন, 'এই যে আমার উপদেষ্টা।' আশ্চর্য চরিত্রের লোক এই সিরাজুল আলম খান। দিনের পর দিন একনাগাড়ে ঘুমুতেও পারেন, আবার না ঘুমিয়ে একনাগাড়ে কাজও করে যেতে পারেন। দিনের বেলা ছাত্র-নেতারা তাঁর নাগাল বড়ো-একটা পেতেন না। আয়ুব-ইয়াহিয়ার চর হন্যে হ'য়ে তাঁর খোঁজ করেছে। ছাত্র-নেতারা তাঁর সঙ্গে গভীর রাত্রে—রাত

ছুটো-তিনটেয় কয়েকটা নির্দিষ্ট রেস্তোরায় মিলতেন। ঢাকার ছাত্রদের কাছে, বিশেষ করে ছাত্রলীগের ছেলেদের কাছে তিনি 'ফ্রেণ্ড, ফিলজফার এণ্ড গাইড'। জনমতের চাপে আয়ুব যখন শেখ মুজিবের ওপর থেকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা তুলে নিলেন, শেখ সাহেব এবং অন্যান্যরা জেল থেকে ছাড়া পেলেন, তখন পল্টন ময়দানে এক জনসভায় শেখ সাহেব এবং অন্যান্যদের সংবর্ধনা জানানো হয়। তখন এই সিরাজুল আলম খানের নির্দেশেই তাঁরই হাতে গড়া ছেলে, গণ-আন্দোলনের অন্যতম ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ ওই জনসভায় শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' খেতাব দেওয়ার প্রস্তাব করেন।

'জয় বাংলা' ধ্বনি আজ এপার-বাঙলা ওপার-বাঙলার হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠে রণিত হচ্ছে। বাঙলাদেশের রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজের বীজমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে এই 'জয় বাংলা'। গত ডিসেম্বরের নির্বাচনে আওয়ামীলীগের অভূতপূর্ব জয়ের পিছনে 'জয় বাংলা' স্লোগানটি একটি 'ফ্যাক্টর'। শেখ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে ঢাকায় দেখা গেছে, একজন রিকশাওয়ালা আর-একজন রিকশাওয়ালাকে দেখলে 'জয় বাংলা' বলে কুশল বিনিময় ক'রছে। ক্রমশ সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এটা একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে যায়। এই 'জয় বাংলা' ধ্বনির উদ্‌গাতাও সিরাজুল আলম খান। ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে নির্মিত মঞ্চের দেবদারু পাতার পশ্চাৎপটের ওপর ফুল দিয়ে প্রথম 'জয় বাংলা' শব্দ হু'টি লেখা হয়। তারপর 'জয় বাংলা' লেখাটি নিয়ে ছাত্রলীগের ছেলেদের মিছিলও বের হয়। কিন্তু সাধারণের মধ্যে ধ্বনিটির প্রচার ঘটে ১১ জানুয়ারি থেকে। গণ-বিক্ষোভের সুযোগ নিয়ে আয়ুবকে সরিয়ে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এলেন।

২৫ মার্চ আবার সামরিকশাসন জারি হ'লো। ইয়াহিয়া বা আয়ুবের পক্ষে কাজটা ছিল বে-আইনী। কেননা, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে মার্শাল 'ল জারির বিধান ছিল। সেই বিধান অনুযায়ী ইস্কান্দার মির্জা মার্শাল 'ল জারি ক'রেছিলেন। এবং ওই সামরিক আইনের সাহায্যেই আয়ুব পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হ'য়েছিলেন। কিন্তু আয়ুব যে-সংবিধান রচনা করেন, তাতে কোনো অবস্থায়ই মার্শাল 'ল জারির কোনো বিধানই ছিল না। কিন্তু, ইয়াহিয়া, এস. এম. আহ্সান এবং টিক্কা খানের পিস্তলের নলের কাছে আয়ুবকে নিজের সংবিধান-বিরোধী কাজটিই ক'রতে হ'লো। আয়ুব বেআইনীভাবে মার্শাল 'ল জারি ক'রলেন। সেই মার্শাল 'ল-র সাহায্যেই ইয়াহিয়া পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হ'য়েছেন। যেহেতু মার্শাল ল জারিটাই আইন-বিরোধী, সেইহেতু ইয়াহিয়া খানের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত থাকাটাও বেআইনী। ইয়াহিয়া যে প্রেসিডেন্টপদে এখনো অধিষ্ঠিত রয়েছেন এটা নেহাতই গায়ের জোরে, তার পিছনে আইনের কোনো সমর্থন নেই। যাক্ যা বলছিলাম। জানুয়ারির গোড়ায় রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর থেকে ইয়াহিয়া-আরোপিত বাধা-নিষেধ তুলে নেওয়া হলো। রাজনৈতিক সভা অনুষ্ঠানের ওপর থেকে বাধানিষেধ তুলে নেওয়ার পর ১১ জানুয়ারি শেখ সাহেব পল্টন ময়দানে প্রথম জনসভা ক'রলেন। ওইদিনই প্রথম প্রকাশ্যে সভামঞ্চের সামনে হার্ডবোর্ডে বড়ো বড়ো হরফে ছাত্ররা লিখে দিলেন 'জয় বাংলা' শব্দ দু'টি।

২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস বিল্ডিং-এর প্রাঙ্গণে ছাত্র-সংগ্রাম-পরিষদের আয়োজনে ছাত্রদের একটি বিরাট সভা হ'লো। ছাত্রদের সভা সাধারণত বেলতলাতেই হয়। কিন্তু ওই দিন অসংখ্য ছাত্রছাত্রীতে সারা অঙ্গন ছয়লাপ হ'য়ে গেল। ছাত্র-নেতারা

তখন ছাদের ওপর উঠে ভাষণ দিলেন। ওই দিনের সভাপতি ছিলেন ছাত্রনেতা নূরে আলম সিদ্দিকী। ছাত্র-নেতা আ. স. ম. আবছুর রব জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে 'উপনিবেশবাদী পাকিস্তানী পতাকা' পুড়িয়ে বাঙলাদেশের জাতীয় পতাকা ব্যবহার করার ডাক দিলেন।

পোড়ানো হ'লো পাকিস্তানী পতাকা। যে দিয়াশলাই দিয়ে প্রথম পাকিস্তানী পতাকা পোড়ানো হয়, ঢাকার একজন ছাত্রনেতা আজও পরমযত্নে সেই দিয়াশলাইটা রেখে দিয়েছেন। স্বাধীন বাঙলাদেশের মিউজিয়ামে তা সংরক্ষিত হবে ভাবীকালের ছেলেমেয়েদের জন্য।

পাকিস্তানী পতাকা তো পোড়ানো হ'লো। কিন্তু জাতীয় পতাকা কোথায়? ছাত্রলীগের জঙ্গীবাহিনীর (রেজিমেণ্টাল) পতাকাটাই এগিয়ে দিল একজন। ছাত্রনেতা আবছুর রব সেই পতাকা হাতে তুলে নিয়ে ঘোষণা ক'রলেন, এই আমাদের স্বাধীন বাঙলাদেশের পতাকা। পতাকার জমিন সবুজ। মাঝে সিঁদুর-রঙা গোলাকার সূর্য। তারই মাঝে সোনালিতে আঁকা পূর্ববাঙলার মানচিত্র। ছাত্র-ছাত্রীরা বিপুল করতালি আর হর্ষধ্বনিতে বরণ করে নিল সেই পতাকা। তারপর সেই পতাকা সামনে নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা মিছিল বের ক'রলেন। রমনা এলাকায় ঘুরল সেই মিছিল। বাঙলাদেশের মানুষ সেই প্রথম দেখল তাদের জাতীয় পতাকা। সকলে সশ্রদ্ধ চিত্তে সম্মান জানাল সেই পতাকাকে। পরের দিন ছাত্রলীগ আয়োজিত প্রকাশ্য জনসভায় ১নং ইস্তাহার বিলি করার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা দেশের জাতীয় পতাকা হিসেবে সেই পতাকাও তোলা হ'লো।

ফেবরুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে ছাত্র লীগের জঙ্গীবাহিনীর পতাকারূপে এই পতাকার পরিকল্পনা করা হয়।

এই পরিকল্পনাও সিরাজুল আলম খানের। ১৫ ফেবরুয়ারি সার্জেন্ট জহুরুল হকের স্মৃতি-স্মরণে ছাত্রলীগের জঙ্গীবাহিনীর কুচকাওয়াজ হয়। তাতে ওই পতাকার প্রথম বাস্তবরূপ দেখা যায়। কিন্তু প্রকাশ্যে পতাকাটি ব্যবহৃত হয় ৭ জুন সকাল সাড়ে আটটায়। ৬-দফা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ছাত্রলীগের স্বেচ্ছা-বাহিনীর কুচকাওয়াজ হয় পল্টন ময়দানে। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন। তার মধ্যেই শেখসাহেব ছাত্রলীগ স্বেচ্ছাবাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ ক'রলেন। গোল ক'রে মোড়ানো ছাত্রলীগের পতাকাটা একজন শেখসাহেবের হাতে তুলে দিলেন। শেখসাহেব তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে ওই পতাকা খুলে ছাত্রনেতা আ. স. ম. আবছুর রবের হাতে তুলে দিলেন কুচকাওয়াজ শুরু হবার ঠিক আগে।

'স্বাধীন এবং সার্বভৌম বাঙলাদেশ ঘোষণা নিয়েও ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। ১২ অগস্ট ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির এক বর্ধিত সভা হয় ইকবাল হলে। সভায় দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি এবং নির্বাচন নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে আলোচনা এবং বিতর্ক হয়। ছাত্রনেতাদের গরিষ্ঠ দলের বক্তব্য ছিল, পূর্ববাঙলা পাকিস্তান-সরকারের একটি উপনিবেশ। তাই জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন তীব্র ক'রতে হবে। তাঁদের লক্ষ্য হবে 'স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশ' প্রতিষ্ঠা। নির্বাচনে জয়ী হলেই গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে জঙ্গীশাসক ইয়াহিয়া খান গণ-প্রতিনিধিদের হাতে আপসে ক্ষমতা হস্তান্তর ক'রবেন এ তাঁরা বিশ্বাস করেন না। নির্বাচনে যোগ দেওয়ার পিছনে তাঁদের উদ্দেশ্য, জনমত গঠন করা। নির্বাচনে যোগ না দিলে আওয়ামীলীগ জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন তো হয়ে পড়বেই তত্বপরি, আওয়ামীলীগ

নির্বাচন বয়কট ক'রলে মুসলিমলীগ, জামাতে, জমিয়িতে ওলামা প্রভৃতি দলের একটা প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ক্ষমতায় চলে আসবে অনায়াসেই। তার ফলে শোষণ-মুক্তির বাস্তবায়ণের স্বপ্ন হবে সুদূরপরাহত। তাঁদের মতে, নির্বাচন জনমত গঠনের একটি মাধ্যম মাত্র। সেই ঐক্যবদ্ধ জনতার আন্দোলনকে একদিন সশস্ত্র রূপ ধারণ ক'রতেই হবে।

ছাত্রদের ওই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল 'স্বাধীন ও সার্বভৌম বাঙলাদেশ' ঘোষণার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। কিন্তু ছাত্রদের একাংশ প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন। তাঁরা যে 'স্বাধীন ও সার্বভৌম বাঙলাদেশ' গঠনের বিরোধী ছিলেন তা নয়, তবে ওই মুহূর্তে তাঁরা স্বাধীন ও সার্বভৌম বাঙলাদেশ' ঘোষণার বিরোধী ছিলেন। অর্থাৎ মতবিরোধটা ছিল, সময় নিয়ে।

সমস্যা সমাধানের জন্য ছাত্র নেতারা গেলেন শেখ মুজিবের কাছে। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেই পয়োজনে সাধারণ সংখ্যা-গরিষ্ঠের অনুমোদনে দলের গুরত্বপূর্ণ সব নীতি নির্ধারিত হয়। শেখ মুজিব কিন্তু কখনোই চাইতেন না, ছাত্রলীগ বা আওয়ামী লীগে এমন কোনো প্রস্তাব পাশ হোক যার প্রতি একাংশের অনুমোদন নেই। কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে প্রস্তাব পাশ কর: যায় ঠিকই, কিন্তু তাতে দলে ভাঙন দেখা দেয়। তিনি ছাত্র নেতাদের বললেন, 'তোমরা যা খুশি প্রস্তাব পাশ করতে পার। সে অধিকার তোমাদের আছে। তবে শুধু প্রস্তাব পাশ ক'রেই বিপ্লব হয় না। বাস্তব দিকটাও বিচার ক'রতে হবে। সরকার ভালোই জানেন, আমরা কী ক'রছি বা ক'রতে যাচ্ছি। কিন্তু প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তারা আমাদের কিছু করতে পারছেন না 'স্বাধীন ও সার্বভৌম বাঙলাদেশ' গঠনের প্রস্তাবটা এই মুহূর্তে লিখিতভা: পাশ হলেই জঙ্গী-সরকার তার সমস্ত শক্তি নিয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমরা

প্রস্তুত হওয়ার আগেই সব কিছু বানচাল হ'য়ে যাবে। প্রস্তাবটা লিখিত না থাকলেও ইতরবিশেষ কিছু হবে না। ছাত্র নেতারা শেখ সাহেবের কথা মেনে নিল।

শেখ সাহেবের একটা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আছে। সেই সঙ্গে তাঁর কথায় আছে জাদু, আছে গণতন্ত্রের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। দলের সহকর্মী বা ছাত্রদের কোনো প্রস্তাব তার মনঃপূত না হ'লে তিনি সরাসরি তা নাকচ করে দেন না। তিনি শুধু তাঁর নিজস্ব অভিমতটা ব্যক্ত করেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের এবং যুক্তির এমনই প্রভাব যে, প্রস্তাবক সানন্দেই শেখ সাহেবের কথায় সায় দিয়ে দেন। শেখ সাহেব 'থিয়োরী'র পোকা নন। তিনি অত্যন্ত বাস্তববাদী। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি দলের সব নীতি নির্ধারণ করেন।

শেখ সাহেবের এই বিপুল জনপ্রিয়তার পিছনে অন্যান্য কারণের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের ছোটো-খাটো কয়েকটা বৈশিষ্ট্যেরও প্রভাব আছে। যেমন, শেখসাহেবের বাড়ি কোনো অপরিচিত লোক দেখা ক'রতে গেলে শেখ সাহেব লোকটিকে না চিনেই বলে ওঠেন, 'আরে আরে কী খবর? কেমন আছেন? কী যেন আপনার নাম—ওই যে—কী যেন নামটা—আঃ—।'

শুধু এই মুহূর্তে হয়তো মনে পড়ছে না, কিন্তু শেখসাহেব তাঁর নাম জানেন না। লোকটা খুশিতে গদগদ হ'য়ে বলে, 'আজ্ঞে আমি মানিকগঞ্জের সোহবান আলী।'

শেখসাহেব সোল্লাসে চিৎকার ক'রে ওঠেন, 'আরে হ্যাঁ হ্যাঁ এখন মনে পড়েছে এতক্ষণ পেটে ছিল, মুখে আসছিল না।'

লোকটা খুশি হ'য়ে ফিরে যায়। সে তার গাঁয়ে ফিরে গিয়ে সবাইকে নিশ্চয়ই ফলাও ক'রে কাহিনীটা বলবে। হয়ত বলবে, একদিন কবে মানিকগঞ্জে এসেছিলেন, ভিড়ের মধ্যে কবে দেখেছেন, ঠিক মনে রেখেছেন। এর একটা প্রভাব আছে নিশ্চয়ই। শেখ

সাহেবের অভিমত, সামান্ত কথায়ই যদি কাউকে খুশি করা যায়, কেন করব না। ছাত্রদের মধ্যে শেখসাহেবের জনপ্রিয়তার পিছনেও এমনি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেকখানি কাজ ক'রেছে। আশ্চর্য তাঁর স্মরণশক্তি। যে ছাত্রের সঙ্গে একবার তিনি পরিচিত হন, ভোলেন না তিনি তাঁর নাম, তাঁর পরিচয়। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের ছেলেরা যখন তাঁর বাড়ি যায় তিনি তাদের নিয়ে অনেক সময় হৈ-হুল্লোড় করেন। কার পিঠে একটা দুম্ ক'রে শব্দ করে কিল মারলেন, স্নেহের পরশে কারু কানটা মুলে দিলেন, নাকটা টানলেন, চুলটা টানলেন। শেখসাহেব হয়ত আবদুর রব বা তোফায়েল বা সাহাজান সিরাজের সঙ্গে কথা বলছেন একই সঙ্গে রফিককে হয়তো একটা চোখ টিপে দিলেন, নজরুলকে হয়তো ভেংচি কাটলেন, আফতাবকে হয়তো জিব দেখালেন। কথা বলার সময় শেখ সাহেবের কাঁধ দুটো নাচতে থাকে। ছাত্রদের সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গভাবে আর কোনো নেতা কখনো মিশতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই।

১ মার্চ সিরাজুল আলম খান এবং তাঁর সহযোগী ছাত্রনেতারা পরবর্তী গণ-আন্দোলনের রূপ এবং কর্মপন্থা নির্ধারণ ক'রে একটি ইস্তাহারের খসড়া করেন। এটা প্রকাশ করা হয় ৩ মার্চ পল্টনে ছাত্রলীগের সভায়। শেখ মুজিব সেই সভায় ভাষণ দেন। ইস্তাহারটি আজ একটি ঐতিহাসিক দলিল। মার্চের সমস্ত গণ-আন্দোলন পরিচালনা স্বাধীনতা ঘোষণা শেখ মুজিবুর রহমানকে 'স্বাধীন ও সার্বভৌম বাঙলাদেশের' সর্বাধিনায়ক ঘোষণা—সব কিছুই ওই ইস্তাহারের নির্দেশ মতোই হ'য়েছে। আমি এখানে ইস্তাহারটি হুবহু তুলে ধরছি।

জয় বাংলা

ইশতেহার নং/এক

স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশ ঘোষণা ও কর্মসূচী।

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাঙলাদেশ ঘোষণা হয়েছে।

গত তেইশ বছরের শোষণ, কুশাসন ও নির্যাতন একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে যে, সাত কোটি বাঙালীকে গোলামে পরিণত করবার জন্যে বিদেশী পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র, তা থেকে বাঙালীর মুক্তির পথ স্বাধীন জাতি হিসাবে স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিক হয়ে বেঁচে থাকা। গত নির্বাচনের গণ-রায়কে বানচাল করে শেষবারের মতো বিদেশী পশ্চিমা শোষকরা সে কথার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে প্রমাণ করেছে।

৫৪ হাজার ৫ শত ৭৬ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকার ৭ কোটি মানুষের জন্যে আবাসভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ রাষ্ট্রের নাম 'বাঙলাদেশ'। 'স্বাধীন ও সার্বভৌম বাঙলাদেশ' গঠনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষ্য অর্জন ক'রতে হবে।

(১) স্বাধীন ও সার্বভৌম বাঙলাদেশ গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালী জাতি সৃষ্টি ও বাঙালীর ভাষা, সাহিত্য কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পূর্ণবিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে ও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসন করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েম করতে হবে।

(৩) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ গঠন' করে ব্যক্তি, বাক্ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে।

বাঙলার স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্যে নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ক) বাঙলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, থানা, মহকুমা, শহর ও জেলায় 'স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করতে হবে।

(খ) সকল শ্রেণীর জনসাধরণের সহযোগিতা কামনা ও তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

(গ) শ্রমিক এলাকায় শ্রমিক ও গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সংগঠিত করে গ্রামে গ্রামে, এলাকায় এলাকায় 'মুক্তিবাহিনী' গঠন করতে হবে।

(ঘ) হিন্দু-মুসলমান ও বাঙালী-অবাঙালী সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে।

(ঙ) স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুশৃঙ্খলতার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

স্বাধীনতা-আন্দোলনের ধারা নিম্নরূপ হবে।

(অ) বর্তমান সরকারকে বিদেশী উপনিবেশবাদী শোষক সরকার গণ্য করে এ বিদেশী সরকারের ঘোষিত সকল আইনকে বেআইনী বিবেচনা করতে হবে।

(আ) তথাকথিত পাকিস্তানের তল্পীবাহী পশ্চিমা অবাঙালী মিলিটারিদের বিদেশী ও হামলাকারী সৈন্য হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং ও হামলাকারী শত্রুসৈন্যকে খতম করতে হবে।

(ই) বর্তমান বিদেশী উপনিবেশবাদী শোষক সরকারকে সকল প্রকার ট্যাক্স খাজনা দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

(ঈ) স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণরত যে-কোনো প্রতিরোধ, প্রতিহত, পাল্টা আক্রমণ এবং খতম করার জন্যে সকল প্রকার সশস্ত্র প্রস্তুতি নিতে হবে।

(উ) বৈজ্ঞানিক ও গণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সকল প্রকার সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

(ঙ) স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে 'আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালোবাসি' সংগীতটি ব্যবহৃত হবে।

(চ) শোষক রাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্তানী দ্রব্য বর্জন ক'রতে হবে। এবং সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

(ছ) উপনিবেশবাদী পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে বাঙলাদেশের জাতীয় পতাকা ব্যবহার ক'রতে হবে।

(জ) স্বাধীন সংগ্রামে রত বীর সেনানীদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে বাঙলার স্বাধীন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাঙলাদেশের সর্বাধিনায়ক।

স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন আন্দোলনের এ পর্যায়ে নিম্নলিখিত জয়ধ্বনি ব্যবহৃত হবে—

- স্বাধীন সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' দীর্ঘজীবী হউক।
- স্বাধীন কর স্বাধীন কর বাঙলাদেশ স্বাধীন কর।
- স্বাধীন বাঙলার মহান নেতা—'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিব।
- গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড়—মুক্তিবাহিনী গঠন কর।
- বীর বাঙালী অস্ত্র ধর—বাঙলাদেশ স্বাধীন কর।
- মুক্তি যদি পেতে চাও—বাঙালীরা এক হও।

বাঙলা ও বাঙালীর জয় হোক্

জয় বাঙলা

স্বাধীন বাঙলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

কেন এই বাঙলাদেশ গঠন, কী তার লক্ষ্য, স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্যে কী কী ব্যবস্থা নিতে হবে, কী হবে আন্দোলনের

ধারা, আন্দোলনের স্লোগানই বা কী কী হবে—সব কিছুর স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে ইস্তাহারে।

বাঙলাদেশ গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালী জাতি গঠন, অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসন করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েম করা, গণতন্ত্র মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, এই আন্দোলন জাতীয়তাবাদী এবং সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েমের আন্দোলন। দেখা যাচ্ছে, এই স্বাধীনতা-আন্দোলন পশ্চিমা শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে, সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে নয়। পশ্চিমা শোষক-শ্রেণীকেই ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ 'বিদেশী' এবং 'উপনিবেশবাদী' আখ্যা দিয়েছেন। পশ্চিমা এই শোষকশ্রেণীর মধ্যে আছে ইয়াহিয়া সরকার এবং পুঁজিপতিরা। স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্যে তাঁরা জনসাধারণের সহযোগিতা এবং ঐক্যের ওপর জোর দিয়েছেন, শ্রমিকদের এবং কৃষকদের সংগঠিত করে 'মুক্তিবাহিনী' গঠন করার নির্দেশ দিয়েছেন। পাকসৈন্য খতম করা এবং সশস্ত্র প্রস্তুতির ডাকও দেওয়া হয়েছে। এই আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য স্বার্থান্বেষী মহল যে হিন্দু-মুসলমান এবং বাঙালী-অবাঙালীতে দাঙ্গা লাগাতে পারেন সে সম্পর্কেও জনসাধারণকে আগেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। অসহযোগ আন্দোলনের নির্দেশিকা এই ইস্তাহারেই রয়েছে। পরবর্তী সমস্ত আন্দোলন এই ইস্তাহারের নির্দেশ মতোই পরিচালিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের যে-একাংশ এতদিন 'স্বাধীন ও সার্বভৌম স্বাধীন বাঙলাদেশ' ঘোষণা ঠেকিয়ে রেখেছিলেন, ইয়াহিয়ার অগণতান্ত্রিক মনোভাবের দরুণ তাঁদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হলো। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার পর, পূর্ববঙ্গে নির্বিচার গণহত্যা চালানোর পর তাঁদের পক্ষে ইস্তাহারের নির্দেশ

সমর্থন না করে আর কোনো উপায়ই রইল না। ২৮ ফেবরুয়ারি আর ১ মার্চের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ঘটে গেল। পূর্ববঙ্গের রাজনীতিতে, গণ-আন্দোলনে এক নতুন অধ্যায় সূচনা হয়ে গেল ১ মার্চ দুপুরের পর।

৩ মার্চ পল্টন ছাত্রলীগ আয়োজিত জনসভায় স্বাধীন বাঙলাদেশের পতাকা তোলা হ'লো। 'স্বাধীন বাঙলাদেশ' গঠনের কথা ঘোষণা ক'রে ইস্তাহার বিলি করা হলো শেখ মুজিব ওই জনসভায় অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাবার আহ্বান জানালেন। শেখ মুজিব বললেন, হিংস্রতা আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতির কারণ হ'য়ে দাঁড়াবে। তিনি আরও বললেন, জনগণের মৌল অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে। ওই দিনই শাসনতন্ত্র নিয়ে আপোস-আলোচনার জন্য ১০ মার্চ পার্লামেণ্টারি দলের নেতাদের এক বৈঠক ডাকলেন ইয়াহিয়া। শেখ মুজিব এবং পি ডি পি-র নুরুল আমিন ছাড়া প্রথমটায় সব দলের নেতাই ওই বৈঠকে যোগ দিতে রাজী হন। কিন্তু শেখসাহেব বৈঠকে যোগ দেবেন না শুনে জামাতে ইসলামীর নেতা আবদুল গফুর, জমিয়ত-উল-উলেমা-ই-ইসলামী (হাজারভি গ্রুপ) এবং মুসলিমলীগের (কনভেশন পন্থী) নেতৃবৃন্দ তাদের বৈঠকে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নাকচ করে দেন। ফলে ইয়াহিয়ার প্রস্তাবিত বৈঠকের পরিকল্পনাও ভেস্তে যায়।

শেখসাহেব বললেন, ইয়াহিয়ার সৈন্যরা যেখানে নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমি বৈঠকে গিয়ে বসতে পারি না।

৫ মার্চ তিনি একটা হিসাব দেন যে, একমাত্র ঢাকা এবং তার আশেপাশেই চার দিনে ৩০০ লোক নিহত হ'য়েছে। চট্টগ্রামে নিহত হয়েছে ৭০ জন, রংপুরে ৭০ জন। তাছাড়া আরও নানান জায়গা থেকেও বিক্ষিপ্ত হতাহতের খবর আসছিল।

রোজই অসংখ্য খণ্ড খণ্ড মিছিলে ধিক্কার আর সংগ্রামের বাণী সোচ্চারিত হচ্ছিল। ৬ মার্চ, স্বাধিকারের দাবিতে, গণহত্যার প্রতিবাদে ঢাকার পথে পথে নেমে আসে সাংবাদিক, শিক্ষক, শিল্পী, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ), গণ-শিল্পীগোষ্ঠী, বাঙলা ন্যাশন্যাল লীগ, ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের আলাদা আলাদা মিছিল। মেয়েরাও সেদিন ঘরে বসে ছিলেন না। আওয়ামীলীগ মহিলা শাখার উদ্যোগে বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদমিনারের পাদদেশে এক সভা হয়। বক্তৃতা করেন ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম, বেগম নূরজাহান মুর্শেদ, বেগম বদরুন্নেছা আহমদ (সভানেত্রী), বেগম সাজেদা চৌধুরী, মিস রাফিয়া আক্তার ডলি। সভাশেষে মেয়েদের একটি মিছিল জিন্নাহ্ এভিনিউ (সুভাষ এভিনিউ), আবদুল গণি রোড প্রদক্ষিণ করে। তারা স্লোগান দেয়: মা-বোনেরা লাঠি ধর, বাঙলা দেশ স্বাধীন কর', 'মা-বোনেরা বেরিয়ে আস,—বাঙলা দেশ মুক্ত কর'—ইত্যাদি। পল্টনে ন্যাশনাল লীগের সভা হয়। সভাপতি ছিলেন অলি আহাদ। শিল্পীদের সভা হয় বাঙলাএকাডেমির প্রাঙ্গণে। সভানেত্রী ছিলেন প্রখ্যাত গায়িকা লায়লা আর্জুমান্দ বানু। সভায় বক্তৃতা দেন বিশিষ্ট পটুয়া কামরুল হাসান, চিত্র-জগতের মোস্তফা, হাসান ইমাম (অভিনেতা), রাজ্জাক (অভিনেতা), খান আতাউর রহমান (অভিনেতা-প্রযোজক-পরিচালক), আতিকুল ইসলাম (গায়ক—রবীন্দ্রসংগীত), মোস্তাফা জামান আব্বাসী (গায়ক—পল্লীগীতি) ওয়াহিদুল হক (সাংবাদিক-গায়ক) প্রমুখ। বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে মহিলা পরিষদের একটি সভা হয়। সভানেত্রী ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল। নারায়ণগঞ্জে বর্শা-লাঠি নিয়ে শ্রমিকদের একটি বিরাট মিছিল বেরুয়।

হাজার হাজার স্বাধীনতাকামী বেপরোয়া মানুষ যখন ইয়াহিয়ার সৈন্যদের রাইফেলের নলের সামনে বুক পেতে দিচ্ছে, সর্ব স্তরের

লক্ষ লক্ষ বিক্ষুব্ধ মানুষ যখন পথে পথে নেমে আসছে স্বাধিকারের দাবিতে, গণহত্যার প্রতিবাদে, তখনও কিন্তু ইয়াহিয়ার চৈতন্যোদয় হ'লো না। তিনি এই কয়দিনের ব্যাপক গণহত্যার জন্য সত্যি-সত্যি অনুতপ্ত তো হলেনই না, উপরন্তু ৬ মার্চ দুপুরের বেতার-ভাষণে আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ তথা পূর্ববাঙলার মানুষের বিরুদ্ধে হুমকি ছাড়লেন। আমি এখানে বেতার ভাষণটি তুলে ধরছি :

'প্রিয় দেশবাসী, আচ্ছালামু-আলায়কুম। আমার ১ মার্চের ভাষণে আমি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আমার পদক্ষেপ বর্ণনা করেছি।......

আপনারা জানেন, ও-ব্যাপারে আমার সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসাবে আমি সকল পার্লামেণ্টারি দলের নেতৃবৃন্দকে ১০ মার্চ আমার সঙ্গে এক সম্মেলনে মিলিত হবার আহ্বান জানিয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, মতানৈক্য নিরসনের ব্যাপারে আমার আন্তরিক প্রয়াসকে সম্পূর্ণ ভুল বোঝা হয়েছে। বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, যিনি বেতারে সম্মেলনের তারিখ ঘোষণার আগে এই ধরনের সম্মেলনের প্রতি কোনো বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন না বলে আভাস দেন, তিনি সেই আহ্বান প্রত্যাখ্যান ক'রেছেন। তাঁর সরাসরি প্রত্যাখ্যান বিস্ময়কর এবং হতাশাব্যঞ্জক। আপনারা জানেন জনাব নুরুল আমিনও সম্মেলনে যোগ দিতে অস্বীকৃত হ'য়েছেন। ফলে প্রস্তাবিত সম্মেলনে পূর্বপাকিস্তান থেকে কোনো প্রতিনিধিই থাকছেন না।

নির্বাচন শেষ হবার পর আমি ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে যে-সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি, আমাদের কোনো কোনো নেতৃবৃন্দ, কোনো-না-কোনোভাবে তাতে বাধার সৃষ্টি ক'রেছেন। ১৭ জানুয়ারি নির্বাচন শেষ হ'য়ে যাওয়ার পর এবং দুটো প্রধান দলের নেতৃদ্বয়ের সাক্ষাৎ এবং ঢাকায় তাঁদের বৈঠক অনুষ্ঠানের পর আমি

তাঁদের সঙ্গে একাধিকবার সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা ক'রেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আওয়ামীলীগ প্রেসিডেণ্ট আমার আমন্ত্রণে সাড়া দেননি। এবং এভাবেই আমরা ভুল বোঝাবুঝি নিরসন অথবা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের একটি সুযোগ হারিয়েছি।

ফলে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে অচল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং বিশাল-সংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানী প্রতিনিধি ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে অসম্মতি জানান।

আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুই যে, ওই তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ব্যর্থ প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হবে। এমনকি পরিণতিতে পরিষদও ভেঙে যেতে পারে। কাজেই আমি অধিবেশন স্থগিত পরিস্থিতিকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হই। এই পন্থায় আমি দুটো লক্ষ্য অর্জনের আশা ক'রেছিলাম। প্রথম, পরিষদ এবং এর জন্মলগ্ন থেকে যে-সব জাতীয় প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে তা রক্ষা করা। দ্বিতীয়ত, পরিস্থিতিকে শান্ত করার জন্য ও ফলপ্রসূ আলোচনা চালানোর জন্যে সময় দেওয়া। কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত সেই দৃষ্টি-ভঙ্গিতে গ্রহণ করার পরিবর্তে আমাদের পূর্বপাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ এমনভাবে দেখেছেন যার পরিণতিতে 'ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত' ব্যক্তিরা রাস্তায় নেমে এসেছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই পরিস্থিতিতে কোনো সরকারই নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারে না। ওই অবস্থায় নির্দোষ ব্যক্তিদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ব্যবস্থা গ্রহণ আমার নৈতিক কর্তব্য ছিল। অন্যথায় আইনের প্রতি নিষ্ঠাবান শান্তিপ্রিয় নাগরিকরা 'চরমপন্থী' ব্যক্তিদের শিকার হতেন। দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে, পূর্বপাকিস্তানে এখনো অরাজকতা চলছে।

যে-কোনো কারণেই হোক, 'পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা পোষণ করা হ'য়েছে। এটা ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত আমি বলতে পারি না। তবে এটা ঠিক যে, এই ব্যাপারে এই ভুল বুঝাবুঝির সুযোগে অরাজকতা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। পর্যাপ্ত শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পরিস্থিতি সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এটা জানা থাকা সত্ত্বেও আইন ভঙ্গ-কারীদের লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ এবং হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার জন্য আমি ইচ্ছা করেই ন্যূনতম শক্তি প্রয়োগের জন্য পূর্বপাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছি।

দেখা যাচ্ছে, অধিবেশন স্থগিত রাখার পিছনে আমার উদ্দেশ্যের একটি—'খোদ পরিষদ বজায় রাখার লক্ষ্য' অর্জিত হ'য়েছে; অপর উদ্দেশ্য—'একটি ফলপ্রসূ আলোচনা' সফল হয়নি।

এদিকে নিরীহ মানুষের প্রাণ নষ্ট হচ্ছে। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার পূর্ণ সমবেদনা রয়েছে। এ পরিস্থিতি আমার সৃষ্ট নয়, এবং এ ধরনের পরিস্থিতি আমি কখনো সৃষ্টি করতে পারি না।

রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের উদ্বোধনী তারিখ নির্ধারণের জন্যে আমি যে প্রচেষ্টা চালাই, তা ব্যর্থ হয়েছে।......

আমি অনির্দিষ্টকালের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে পারি না, তাই আমি ঠিক করেছি, ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে এই সিদ্ধান্তের ফলে সকল রাজনৈতিক নেতার কাছ থেকে দেশপ্রেমিকজনোচিত ও গঠনমূলক সাড়া পাওয়া যাবে।

শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে নেতাদের একটা মোটামুটি ঐক্যমতে নিয়ে আসার জন্য আমার প্রচেষ্টা সফল না হওয়ায় যেসব রাজনৈতিক দল পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের কার্যোপযোগিতা

সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে পারেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই যে, আইনগত কাঠামো আদেশের চাইতে বড়ো আশ্বাসের প্রয়োজন নেই।

পরিশেষে আমি সুস্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই যে, যাই ঘটুক না কেন, যতদিন আমি পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনীর অধিনায়ক ও রাষ্ট্রপ্রধান পদে নিযুক্ত আছি, ততদিন পাকিস্তানের পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক সংহতি বজায় রাখব। এ প্রশ্নে কোনো সন্দেহ বা ভুল করা সঙ্গত নয়। এই দেশের অস্তিত্ব রাখার ব্যাপারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কোটি কোটি মানুষের প্রতি আমার দায়িত্ব রয়েছে।... আমি মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে কোটি কোটি নিরীহ পাকিস্তানীর মাতৃভূমি ধ্বংস করতে দেব না।...

পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস রেখে আসুন, আমরা আমাদের লক্ষ্য—গণতন্ত্র অর্জনের পথে এগিয়ে যাই এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে জাতির প্রত্যাশা এবং দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিই।'

ওইদিন রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসমাবেশে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন ২৫ মার্চ আহূত পরিষদ অধিবেশনে যোগ দেওয়ার প্রশ্ন বিবেচনা করতে পারি যদি (ক) অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা হয়, (খ) সমস্ত সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়, (গ) নিরস্ত্র গণহত্যার তদন্ত করা হয় এবং (ঘ) নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হয়।

সেদিনকার জনসমাবেশের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, অসংখ্য লোকের হাতে ছিল লাঠি, কারু হাতে তীর-ধনুক এবং বর্শাও ছিল। জনতার উদ্দেশ্যে তিনি সেদিন তাঁর ভাষণে বলেন, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হ'য়েছি। আপনারা সকলে জানেন এবং বোঝেন আমরা

আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ কলঙ্কিত হ'য়েছে। আজ বাঙলার মানুষ মুক্তি চায়, বাঙলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাঙলার মানুষ অধিকার চায়। কী অন্যায় ক'রেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাঙলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি ক'রবো এবং এদেশের ইতিহাসকে আমরা গড়ে তুলব। এদেশের মানুষ অর্থনীতি রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবেন, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি, বাঙলাদেশের করুণ ইতিহাস, বাঙলার মানুষের রক্তের ইতিহাস—এই রক্তের ইতিহাস মুমূর্ষু মানুষের করুণ আর্তনাদ—এদেশের করুণ ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আয়ুব খাঁ মর্শাল ল জারি ক'রে দশ বছর আমাদের গোলাম ক'রে রেখেছে। ৬ দফা আন্দোলনের সময় আমাদের ছেলেদের গুলি ক'রে হত্যা করা হ'য়েছে। আন্দোলনে আয়ুব খাঁর পতনের পরে ইয়াহিয়া এলেন। ইয়াহিয়া খান সাহেব বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন—আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হ'য়ে গেল, নির্বাচন হ'লো। প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাঙলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম ১৫ ফেবরুয়ারি তারিখে আমাদের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসের

প্রথম সপ্তাহে সভা হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেমব্লিতে বসব। আমি বললাম, এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা ক'রব—এমন কি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হ'লেও একজনের মতও যদি তা ন্যায্য কথা হয়, আমরা মেনে নেব।

ভুট্টো সাহেব এখানে ঢাকায় এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম। আলাপ ক'রে শাসনতন্ত্র তৈরী ক'রব। সবাই আসুন বসুন। আমরা আলাপ ক'রে শাসনতন্ত্র তৈরি করব। তিনি বললেন, পশ্চিমপাকিস্তানের মেম্বার যদি আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেমব্লি। তিনি বললেন, যে যে যাবে তাদের মেরে ফেলে দেওয়া হবে, যদি কেউ এসেমব্লিতে আসে, পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত জোর ক'রে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম এসেমব্লি চলবে। আর হঠাৎ ৩ তারিখ এসেমব্লি বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'লো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাব। ভুট্টো বললেন, যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিমপাকিস্তান থেকে এখানে এলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'লো। দোষ দেওয়া হ'লো বাঙলার মানুষের। দোষ দেওয়া হ'লো আমাকে। দেশের মানুষ প্রতিবাদে মুখর হ'য়ে উঠল।

আমি বললাম, আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করুন। আপনার কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দ্যান। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল, সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'লো। আমি বললাম, আমরা জামা কেনার পয়সা দিয়ে অস্ত্র পেয়েছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে

থেকে দেশকে রক্ষা করাবার জন্য, আজ সেই অস্ত্রে আমরা দেশের গরীব দুঃখী মানুষের বিরুদ্ধে—তার বুকের উপর হ'চ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু—আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরীবের উপর, আমার বাঙলার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হ'য়েছে। কীভাবে মায়ের কোল খালি করা হ'য়েছে, কী ক'রে মানুষকে হত্যা করা হ'য়েছে, আপনি আসুন, আপনি দেখুন। তিনি বললেন আমি ১০ তারিখে রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স ডাকব।

আমি বলেছি, কিসের এসেমব্লি বসবে, কার সঙ্গে কথা বলব? আপনারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছেন। তাদের সঙ্গে কথা বলব? পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠকে সমস্ত দোষ তারা আমাদের উপর, বাঙলার মানুষের উপর দিয়েছেন। দায়ী আমরা?

২৫ তারিখ এসেমব্লি ডেকেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। ১০ তারিখে বলেছি রক্তে পাড়া দিয়ে, শহীদের উপর-পাড়া দিয়ে এসেমব্লি খোলা চলবে না। সামরিক আইন, মার্শাল ল, উইথড্র ক'রতে হবে। সমস্ত সামরিকবাহিনীর লোকদের ব্যারাকের ভিতর ঢোকাতে হবে। যে-ভাইদের হত্যা করা হ'য়েছে তাদের তদন্ত ক'রতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখব, আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারব কি না পারব না। এর পূর্বে এসেমব্লি আমরা বসতে পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমাদের দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাঙলা দেশে কোর্ট, কাছারি আদালত, ফৌজদারী

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না ক'রে সেজন্য যে সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলি আছে সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকসা, গোরুর গাড়ি, রেল চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট সেমি গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা—কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারিরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এর পর যদি বেতন দেওয়া না হয়, এরপর যদি ১টি গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়—তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল (তুলুন)। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মুকাবিলা ক'রতে হবে, এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু—আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ ক'রে দেবে। আমরা ভাতে মারবো। আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, তোমাদের কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু, আর তোমরা গুলি করবার চেষ্টা ক'রো না। সাতকোটি মানুষকে দাবাইয়া রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবা না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হ'য়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হ'য়েছে, আমরা আওয়ামীলীগের থেকে যদ্দুর পারি সাহায্য ক'রতে চেষ্টা ক'রব। যাঁরা পারেন লীগ-অফিসে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আজ ৭ দিন হরতালে শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান ক'রেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে-পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন ওয়াপদা ট্যাক্স বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল। কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখুন, শত্রু পিছনে ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি ক'রবে; লুঠতরাজ ক'রবে।

এই বাঙলায়—হিন্দু, মুসলমান যারা আছে, আমাদের ভাই, বাঙালী, অবাঙালী—তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, কর্মচারিরা, রেডিও যদি আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালী রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিসন আমাদের নিউজ না দেয়, তাহ'লে টেলিভিসনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে যাতে করে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নিতে পারে। পূর্ববঙালা থেকে পশ্চিমপাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হ'তে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাঙলায় চলবে এবং বাঙলাদেশের নিউজ বাইরে পাঠানো চলবে।

এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা চলছে—বাঙালীরা বুঝেসুঝে কাজ ক'রবে। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন। এবং আমাদের যা-কিছু তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, আরও রক্ত দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত ক'রে তুলব। ইনসাল্লাহ। এ বারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এ বারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'

সেই সভাতেই শেখসাহেব বাঙলার মানুষকে কতগুলি নির্দেশ দেন। নির্দেশগুলি এই: (১) বাঙলার মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ রাখুন। (২) সমগ্র বাঙাদেশের সেক্রেটারিয়েট সরকারি আধাসরকারি অফিস, সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট এবং অন্যান্য কোর্টে হরতাল করুন। (কোথাও শিথিল করা হ'লে পরে জানানো হবে।) (৩) রিকসা, বাস, ট্যাক্সী, বেবী ট্যাক্সী প্রভৃতি এবং রেলগাড়ি ও বন্দরসমূহ চালু রাখুন। কিন্তু জনগণের ওপর জুলুম চালাবার উদ্দেশে সশস্ত্রবাহিনীর চলাচলের কাজে রেলওয়ে এবং বন্দর কর্মচারিগণ সহযোগিতা ক'রবেন না, এবং সেক্ষেত্রে

তাদের চলাচলের ব্যাপারে কোনো কিছু ঘটলে আমি দায়ী হব না। (৪) বেতার, টেলিভিসন ও সংবাদপত্রসেবীরা আমাদের বিবৃতি বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ দেবেন এবং গণ-আন্দোলনের কোনো খবর গায়েব ক'রবেন না। যদি তাতে বাধা দেওয়া হয়, তাহ'লে ওই সব প্রতিষ্ঠানের বাঙালী কর্মচারিগণ কাজে যোগ দেবেন না। (৫) শুধু লোকাল এবং আন্তঃজেলা ট্রাঙ্ক-টেলিফোন যোগাযোগ অব্যাহত রাখুন। (৬) স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিত্তালয় বন্ধ রাখুন। (৭) সকল গৃহশীর্ষে প্রতিদিন কালো পতাকা উড্ডীন রাখুন। (৮) ব্যাঙ্কসমূহ প্রতিদিন ছ ঘণ্টা খোলা রাখুন; কিন্তু পশ্চিমপাকিস্তানে এক পয়সাও যেন পাচার না হয়। (৯) অন্যান্য ক্ষেত্রে আজ থেকে হরতাল প্রত্যাহৃত হ'লো। কিন্তু অবস্থার প্রেক্ষিতে যে-কোনো সময় আবার আংশিক বা সর্বাত্মক হরতাল ঘোষণা করা হ'তে পারে, তজ্জন্য প্রস্তুত থাকুন। (১০) স্থানীয় আওয়ামীলীগ শাখার নেতৃত্বে অবিলম্বে বাঙলার প্রত্যেকটি ইউনিয়ন, মহল্লা, থানা, মহকুমা ও জেলা পর্যায়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করুন।

লক্ষ্যণীয়, শেখ মুজিব ছাত্রলীগের ৩নং ইস্তাহারে নির্দেশিত নির্দেশ অনুযায়ীই অসহযোগ আন্দোলন, সংগ্রাম পরিষদ গঠনের ডাক দিলেন।

পূর্ববাঙলার পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকল। তখনো যদি ইয়াহিয়া তাঁরা মাথা থেকে 'পর্যাপ্ত' শক্তি প্রয়োগের' চিন্তা সরাতে পারতেন, শেখ সাহেবের দাবিগুলি মেনে নিতেন, তাহ'লে ইয়াহিয়া খান (তথা পশ্চিমপাকিস্তান) লাভবানই হতেন। কেন্দ্রের শাসন চালানো এবং সেনাবাহিনী পোষার খরচা বাবদে একটা মোটা বখরা পেতেন পূর্ব-বাঙলার কাছ থেকে ইয়াহিয়া। কারণ, তখনো পর্যন্ত শেখ মুজিব প্রকাশ্যে 'স্বাধীন ও সার্বভৌম বাঙলা দেশ' ঘোষণা করে ফেলেননি। সাধারণ মানুষ অবশ্য তখন স্বাধীন

বাঙলাদেশের কথা বলাতে শুরু ক'রেছেন। তখনও পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখার ক্ষীণ সুযোগ ছিল ইয়াহিয়ার। কিন্তু পূর্ববাঙলার দাবি মেনে নেওয়ার পরিবর্তে তিনি পর্যাপ্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রলেন।

৯ মার্চ পল্টনের জনসভায় মৌলানা ভাসানী ঠিকই বলেছেন, হত্যা করে বাঙালীকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। এখনও সময় আছে। যাতে দুই অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক এবং ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক রক্ষা করার মতো পরিবেশ থাকে, যাতে রাষ্ট্রদূত বিনিময় করা যায় এবং যাতে একে-অপরের শত্রু না হই, এ জন্য আগে ভাগাভাগি ক'রে ফেলুন। মেজরিটি-মাইনরিটির খেল্ যা দেখাতে চান, পশ্চিমপাকিস্তানেই দেখান, আমাদের আপত্তি নেই।

তিনি আরও বলেন, 'পূর্বপাকিস্তান' স্বাধীন হবে। পাকিস্তান অখণ্ড থাকবে না, অখণ্ড রাখব না। ইয়াহিয়ার বাপেরও ক্ষমতা নেই তা ঠেকায়। আমি অহিংসায় বিশ্বাস করি না। আল্লাহ্ এবং রসুলও (দঃ) এই শিক্ষা দেয় নি। যে জুলুম করে, সে যেমন পাপী, যে তা সহ্য করে, সেও তেমনি পাপী। জালেমের সঙ্গে কোনো সহযোগিতা নেই।'

নির্বাচনের আগে ভাসানী মুজিবের বিরোধী থাকলেও নির্বাচনের পর তাঁকে সমর্থন করেন। ভাসানীই প্রথম প্রকাশ্যে স্বাধীন 'পূর্বপাকিস্তান' দাবি করেন।

ওই সভাতেই জাতীয় লীগ-প্রধান আতাউর রহমান খান শেখ মুজিবের উদ্দেশে বলেন, 'এই মুহূর্তে আপনি স্বাধীন বাঙলার জাতীয় সরকার ঘোষণা করুন। বাঙলার সকলেই আপনার হুকুম মেনে চলবেন। আমাদের আর কোনো দাবি নেই।'

নানান মহল থেকে দিন দিন শেখ মুজিবের ওপর এমনি চাপ আসতে থাকল। মুজিব তখনো আর রক্তপাত না ঘটিয়ে ধৈর্য ধরে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলেন।

১৫ মার্চ ঢাকায় নেমেই তিনি বুঝে গেলেন, পূর্বপাকিস্তান কার্যত 'স্বাধীন বাঙলাদেশ' হ'য়ে গেছে। আর শেখ মুজিবুর রহমান হলেন বাঙলাদেশের অবিসম্বাদী নেতা। বাঙলাদেশের শাসনব্যবস্থা চলছে তাঁরই নির্দেশে। ইসলামাবাদের শাসন সেখানে অচল। পশ্চিমা সৈন্য ছাড়া কেউ আর ইসলামাবাদের বশে নেই। এসে শুনলেন, রেডিও পাকিস্তান ঢাকা হ'য়ে গেছে ঢাকা বেতারকেন্দ্র। আর ওখানকারই ঘোষক আবদুস সাত্তার সকাল আটটা পঁয়তাল্লিশের খবরে বলেছেন: আওয়ামীলীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান আজ জানিয়েছেন, তাঁর দল প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী। এবং তাই তিনি বাঙলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের কল্যাণের জন্য শাসনক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। তিনি বাঙলাদেশের জনগণের উদ্দেশে ৩৫টি নির্দেশ জারি ক'রেছেন। এই নির্দেশনামায় বলা হ'য়েছে, ডেপুটি জেলা কমিশনার ও মহকুমা অফিসাররা যেন তাঁদের অফিস না খুলে যেসব কাজ করা সম্ভব, সেগুলোই করেন। পুলিশকে শৃঙ্খলা রক্ষা ক'রতে বলা হ'য়েছে। প্রয়োজন বোধে তাঁরা যেন আওয়ামীলীগ কর্মীর সহায়তা নেন। বন্দর-কর্তৃপক্ষকে জাহাজ চলাচল চালু রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু বাঙলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য আনা সৈন্য এবং সমরাস্ত্রবাহী জাহাজকে কোনো রকম সাহায্য দিতে নিষেধ করা হ'য়েছে। শেখসাহেব আরও বলেছেন, বাঙলাদেশের ভিতরে ডাক চলাচল ক'রবে; বাঙলাদেশের চিঠিপত্র টেলিগ্রাম ও মনি অর্ডার আগের মতোই পাঠানো চলবে, বিদেশেও পাঠানো চলবে; কিন্তু পশ্চিমপাকিস্তানে পাঠানো চলবে না। পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাংকগুলি কেবল বার্তা বিনিময়ের জন্য সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটে থেকে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত

টেলিপ্রিণ্টারে সংযোগ স্থাপন ক'রতে পারবেন। রেডিও, টেলিভিসন এবং সমস্ত সংবাদপত্রকে কাজকর্ম চালু রাখতে এবং গণ-আন্দোলন সম্পর্কীয় পুরো খবর ছাপতে বলা হয়েছে। যেসব সংবাদপত্রের মালিক পূর্ববাঙলার স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী, সেখানকার কর্মচারীদের মালিকের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রতে নিষেধ করা হ'য়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে কোনোরকম কর দিতে নিষেধ করা হ'য়েছে। বাঙলাদেশ সরকারের একাউণ্টে ওই কর ইস্টার্ন মার্কেনটাইল ব্যাঙ্ক এবং ইস্টার্ন ব্যাংকিং করপোরেশনে জমা দিতে বলেছেন।

এই সব নির্দেশ আসলে ৭ই মার্চের নির্দেশেরই ব্যাখ্যা এবং সংযোজন।

শেখসাহেবের ডাকে পূর্ববাঙলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ এককাট্টা হ'য়ে সাড়া দিল। বিভিন্ন কোম্পানী শেখসাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী ওই দু'টি ব্যাংকে কর জমা দিতে শুরু ক'রল। একটা সিগারেট কোম্পানীই এক দিনে জমা দিয়েছিল ১১ লক্ষ টাকা। শেখসাহেবের ডাকে যে অভূতপূর্ব সাড়া এবং সহযোগিতা পাওয়া গেছে তা আর কখনো দেখা যায়নি। বিজ্ঞাপন-দাতাদের ভাষা পর্যন্ত রাতারাতি পাল্টে গেছিল। ইস্টার্ন মার্কেনটাইল ব্যাংক দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' পুরো গানটি তুলে দিয়ে বিজ্ঞাপন ক'রল। ইউনাইটেড ব্যাংক লিঃ তাদের বিজ্ঞাপনে লিখল, 'বাঙলার, মাটি বাঙলার জল, বাঙলার বায়ু বাঙলার ফল, পুণ্য হউক,'...'বঙ্গ আমার জননী আমার, ধাতৃ আমার, আমার দেশ' ইত্যাদি। সরকারি-বেসরকারি পশ্চিমপাকিস্তানী সমস্ত প্রতিষ্ঠানেরই বিজ্ঞাপন প্রায় অনুরূপ।

কার্যত শেখসাহেবের ধানমণ্ডীর বাসভবন হ'য়ে গেল বাঙলাদেশ-সরকারের প্রধান কার্যালয়।

ইয়াহিয়া আলোচনা ক'রতে চাইলেন শেখ মুজিবের সঙ্গে।

যদিও শেখ মুজিবের এটা অজানা ছিল না যে, পিণ্ডি থেকে ঢাকা আসার পথে ইয়াহিয়া করাচিতে কয়েকটা দিন কাটিয়ে তবে এসেছেন। সেখানে তাঁর গতিবিধি সম্পূর্ণ গোপন রাখা হ'য়েছিল। তবু একথা শেখ মুজিবের জানতে বাকি থাকে নি যে, ইয়াহিয়া নিজে উপস্থিত থেকে জাহাজভর্তি পাঞ্জাবি, পাঠান ক্র্যাক ট্রুপ রওনা করিয়ে দিয়ে তবে এসেছেন। পশ্চিমপাকিস্তান থেকে জাহাজভর্তি সৈন্য আসছে—শেখসাহেবের কাছে ১০ মার্চের মধ্যেই সে খবর পৌঁছে যায়। তাই তিনি সৈন্যদের বন্দরে নামাতে বাধা দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সৈন্যদের রসদ এবং খাদ্য চলাচলে সহযোগিতা না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তবু শেখসাহেব ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে বসতে রাজী হ'লেন এই জন্যে যে, তিনি চাইছিলেন, আর রক্ত না ঝরিয়ে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান ক'রতে। তাই তিনি ১৬ তারিখ থেকে ২১ তারিখ পর্যন্ত ইয়াহিয়ার সঙ্গে সর্বমোট সাড়ে নয় ঘণ্টা আলোচনা চালিয়ে গেলেন। শেখমুজিবের দাবি মতো, ইয়াহিয়া তদন্ত-কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা ক'রলেন। তদন্তের বিষয় ঠিক ক'রে দেওয়া হ'লো, কী পরিস্থিতিতে বেসামরিক কর্তৃপক্ষ সৈন্য তলব ক'রতে বাধ্য হ'য়েছেন তাই নির্ধারণ করা। এবং তদন্তের রিপোর্টও দিতে বলা হ'লো সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে। শেখ মুজিবের প্রস্তাবিত তদন্ত কমিশন তো হ'লোই না, বরং সমস্ত নৃশংস হত্যা চাপা দেওয়ার ব্যবস্থা হ'লো এই তদন্ত কমিশন গঠন ক'রে। শেখসাহেব মেনে নিলেন না এই কমিশন।

সামরিক কর্তৃপক্ষ জানালেন, সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া হ'য়েছে। যদি তাই হয়, তাহ'লে ১৯ মার্চ জয়দেবপুরে জনতার ওপর সৈন্যরা গুলি ছুড়ল কী ক'রে? ওখানে সৈন্যদের গুলিতে

২ জন নিহত এবং ৯ জন আহত হয়! জয়দেবপুরের ঘটনার পর তাঁর বাড়িতে সমবেত জনতার উদ্দেশে শেখসাহেব বললেন, বাঙলাদেশের রাজপথ অলিগলি শহীদের রক্তে রঞ্জিত হ'য়েছে। আজ আবার জয়দেবপুরের মাটি বাঙালীর রক্তে ছয়লাব হ'লো।' তারপর পশ্চিমা সামরিক শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশে বললেন, 'আর কতো রক্ত চাও তোমরা, আর কতো রক্ত হ'লে তোমাদের তৃষ্ণা মিটবে? আমরা শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার সমাধান চাই, আর তোমরা চাও অস্ত্রের জোরে, শক্তির জোরে শাসন ক'রতে। কিন্তু শক্তির জোরে বাঙালীকে দাবিয়ে রাখা যাবে না।'

গোড়ায় রাজী না হ'লেও, ইয়াহিয়া শেষপর্যন্ত শেখ মুজিবের দাবি মতো পরে মেনে নিলেন বিভিন্ন প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জন-প্রতিনিধিদের হাতে শাসনভার তুলে দেওয়ার সর্ত। রাজী হ'লেন, সামরিক শাসন তুলে নিতে। কিন্তু এসব প্রতিশ্রুতির সবটাই যে ছিল ভণ্ডামী একথা বুঝতে শেখ মুজিবের বিলম্ব হয় নি। ২২ তারিখেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, পশ্চিমের জঙ্গীশাকরা বাঙালী নিপীড়ন থেকে নিরস্ত হবে না কোনোদিন। চিরদিন তারা পূর্ববঙ্গকে তাদের উপনিবেশ বানিয়ে রাখতে চায়। উপনিবেশ বানিয়ে রাখতে চায় পূর্ববাঙলারই পয়সায় বছরের পর বছর লক্ষ লক্ষ সৈন্য পুষে, দিনের পর দিন সমরশক্তি বৃদ্ধি ক'রে। পাকিস্তানের গোটা সেনাবাহিনী পোষার শতকরা ৮০ ভাগ খরচা জোগায় পূর্ববাঙলা। অথচ শেখ মুজিব এবং পূর্ববাঙলার অন্যান্য নেতাদের হাজার দাবি সত্বেও পাকিস্তানে আজও একটা পুরো বাঙালী রেজিমেন্ট গড়া সম্পূর্ণ হ'লো না। আয়ুবের আমলেই এই রেজিমেন্ট গড়ার কাজ শুরু হয়। কিন্তু এ-পর্যন্ত মাত্র আটটি ব্যাটেলিয়ন গড়ার কাজ শেষ হয়েছে। একটা পুরো ডিভিসনও তৈরী হয়নি ২৫ মার্চ পর্যন্ত। পাছে সুযোগ বুঝে বাঙালীরা পশ্চিমাদের শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে

বসে—এই ভয়ে শ্লথ গতিতে চলেছে বাঙালী রেজিমেণ্ট গড়ার কাজ। শুধু তাই নয়, পশ্চিমা জঙ্গীশাসকদের ভয়টা এত দূরই যে, তাঁরা ওই আট হাজার বাঙালী সৈন্যকে পূর্ববাঙলায় রাখতে ভরসা পাননি। সারা পাকিস্তান জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখেছিলেন তাঁদের। বাঙালী রেজিমেণ্টের আট ব্যাটেলিয়ন সৈন্যের দুই ব্যাটেলিয়নকে রেখেছেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে; দুই ব্যাটেলিয়ানকে রেখেছেন পাঞ্জাবে। আর বাকি চার ব্যাটেলিয়ন মাত্র ছিল বাঙলাদেশে। পশ্চিমা জঙ্গীশাসকদের ওই ভয় অহেতুক ছিল না। কারণ তাঁরা জানতেন, পূর্ববাঙলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ শিগ্‌গীরই দীর্ঘ তেইশ বছরের বঞ্চনা আর প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন। তারা বিশ্বাস করেন, বাঙলাদেশের মানুষকে দাবিয়ে রাখতে চাই বন্দুকের নল। তাই হপ্তাখানেক ধরে শেখ মুজিবের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা চালিয়ে ইয়াহিয়া খান কাল ক্ষেপণ করে পশ্চিমা সৈন্যদের পূর্ববাঙলার মাটিতে নামার সুযোগ ক'রে দিচ্ছিলেন। মুজিবও তৈরী হ'তে শুরু ক'রলেন। আওয়ামী স্বেচ্ছাবাহিনীর ছেলেরা জহুরুল হক হল (ইকবাল হল), প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে, ঢাকার অনতিদূরে কামরাঙ্গীর চরে, নারায়ণগঞ্জের চাঁদমারিতে রাইফেল চালনায় তালিম নিতে লাগল। মেয়েরাও বাদ গেল না। তাঁরাও প্রস্তুতি নিতে থাকল ইয়াহিয়ার প্রত্যাশিত হামলার মুকাবিলার জন্য। কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট প্রভৃতি স্থানেও তখন চলছিল প্রস্তুতি।

তেজগাঁ ক্যানটনমেণ্ট থেকে বাইরে অস্ত্রপাচার চলল। শোনা যায়, শেখসাহেব ইয়াহিয়াকেও বন্দী করার আয়োজন ক'রছিলেন। এটা ইয়াহিয়া সরকারেই অভিযোগ। টিক্কা খান পীরজাদা বুঝেছিলেন, ই. পি. আর, পুলিশ এবং বেঙ্গল রেজিমেণ্ট বিদ্রোহ ক'রবে। তাই তাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা চলল। আই. জি.

তসলিমউদ্দীন সাহেবের কাছে নির্দেশ গেল পুলিশকে নিরস্ত্র করার। তসলিমউদ্দীন সমস্ত ই. পি. আর ব্যারাকে খবর পাঠালেন উল্টো, অস্ত্র হাত ছাড়া ক'রো না। লড়াইয়ের জন্য তৈরী হও। পাকসৈন্য যে-কোনো মুহূর্তে হামলা ক'রতে পারে। ই. পি. আর ব্যারাকেও প্রস্তুতির নির্দেশ গেল, ২৪ তারিখ চট্টগ্রাম থেকে বাঙালী বিগ্রেডিয়ার মজুমদারকে ডেকে পাঠালেন টিক্কা খান ঢাকায়। বিগ্রেডিয়ার মজুমদার তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে গেলেন, আমি না আসতে পারলেও, হামলা হ'লেই সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো তোমরা। তৈরী হ'য়ে থাক।

ওই দিনই পাক-সৈন্য নতুন ক'রে আবার আক্রমণ চালাল জনতার ওপরে, রংপুর, চট্টগ্রাম সৈয়দপুরে ১১০ জন নিহত হ'লো। চট্টগ্রামে বন্দরে একটি জাহাজ থেকে ডক-কর্মীরা অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ খালাস ক'রতে অস্বীকার করে। সৈন্যরা নিজেরাই তা খালাস ক'রতে গেলে জনতা রাস্তায় রাস্তায় অসংখ্য ব্যারিকেড সৃষ্টি ক'রে। সৈন্যরাও গুলি চালায় সংঘর্ষ শুরু হয় জনতা আর সৈন্যে।

২৫ তারিখ গোপনসূত্রে শেখসাহেব খবর পেলেন আজকে হামলা হ'তে পাবে। রাস্তায়ও তিনি সৈন্যদের দুই চারিটা জীপ ও ভ্যান চলাচল ক'রতে দেখলেন। তিনি প্রেসিডেণ্ট ভবনে ইয়াহিয়ার সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। মুজিব ফোন তুলে বললেন, আমি এক্ষুণি একবার আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে চাই।

ইয়াহিয়ার জবাব: দুঃখিত এখন সম্ভব নয়।

মুজিব ফের বললেন, ব্যাপারটা জরুরি, এক্ষুনি দেখা হওয়া প্রয়োজন।

ইয়াহিয়া: আমি অসুস্থ হ'য়ে পড়েছি। এখন কারু সঙ্গে দেখা ক'রতে পারছি না।

শেখসাহেবের মনে সন্দেহ ঘনিভূত হ'লো। তাহ'লে কি ইয়াহিয়া নেই? এটা কি ইয়াহিয়ার টেপরেকড করা কণ্ঠস্বর। যতটুকু জানা যায়, ইয়াহিয়া সন্ধ্যের কিছুক্ষণ আগেই একটি বিশেষ বিমানে করাচি পাড়ি দিয়েছেন। ঘুর-পথে করাচির দূরত্ব এবং বিমানের গতিবেগ হিসাব ক'রে পরে দেখা গেছে ইয়াহিয়া ছ'টার মধ্যেই ঢাকা ছেড়েছেন।

শেখসাহেবের আসল পরিকল্পনা ছিল, প্রথমে স্বায়ত্তশাসন আদায় ক'রে, আঞ্চলিক প্রতিরক্ষার নাম দিয়ে একটি মিলিশিয়া গঠন ক'রে পরে স্বাধীনতা ঘোষণা করা। কিন্তু শেখ মুজিবের আইনবিষয়ক পরামর্শদাতা ডক্টর কামাল হোসেন কথাটা ফাঁস ক'রে দিয়েছেন। তাঁরই বেইমানির জন্য সবকিছু ভেস্তে গেল শেষটায়। না হ'লে ইয়াহিয়া হয়তো শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপক সেনা-অভিযান চালাতেন না। ইয়াহিয়া ভেবে রেখেছিলেন, আলোচনা সফল না হ'লে পর্যাপ্ত শক্তির মাধ্যমে আন্দোলন দমানো হবে। কয়েকটি মহলের চাপে এবং পরামর্শেই ইয়াহিয়া শেষ পর্যন্ত বিগড়ে যান। তখনই তিনি 'পর্যাপ্ত শক্তি' প্রয়োগের পরিকল্পনা নিলেন।

শেখসাহেব ভেবেছিলেন, ইয়াহিয়া আওয়ামীলীগ নিষিদ্ধ ক'রে দেবেন, কর্মী এবং নেতাদের ব্যাপকহারে গ্রেপ্তার ক'রবেন, কিছু কিছু হত্যাকাণ্ডও চালাবেন।

তিনি দ্রুত প্রথম শ্রেণীর কর্মী এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সতর্ক ক'রে দিলেন। বললেন, আত্মগোপন ক'রতে। জায়গায় জায়গায় সম্ভাব্য প্রতিরোধও গড়ে তুলতে বললেন। রংপুর, চট্টগ্রাম এবং সৈয়দপুরে সেনাবাহিনীর নির্বিচার গণহত্যার বিরুদ্ধে শেখসাহেব ২৭ মার্চ হরতালের সর্বাত্মক ডাক দিলেন। শেখসাহেবের প্রেস-সেক্রেটারি আমিনুল হক বাদশা আমায় বলেন, তিনি ন'টার আগে পর্যন্ত কিছুই জানতে পারেন নি। রিপোর্টারদের ধর্মঘট সংক্রান্ত

খবর দেওয়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ঢাকা বেতারই শুধু খবরটা প্রচার ক'রতে পেরেছিল।

সবাইকে পরামর্শ দিলেন, শেখসাহেব নিজে কিন্তু আত্মগোপন ক'রতে রাজী হলেন না।

রাত এগারোটা পর্যন্ত যে তিনি বাড়ি ছিলেন, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। [বইয়ের গোড়ায় তার উল্লেখ আছে] তখন তাঁর কাছে ছিলেন শ্রীতাজউদ্দীন আহমদ এবং শেখ সাহেবের বডিগার্ড মহিমউদ্দীন এবং রাজু।

রাত এগারোটা কুড়ি মিনিটে রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং পিলখানার ই. পি. আর ব্যারাক আক্রান্ত হ'লো।

সেই খবর এলো শেখসাহেবের কাছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন এবং ওয়ারলেস কর্মীদের ফোন ক'রে বললেন, সব জায়গায় পুলিশ এবং ই. পি. আরকে জানিয়ে দিন, পাক সৈন্য ঢাকার ই. পি. আর এবং পুলিশ ব্যারাক আক্রমণ ক'রেছে। তাদের সংগ্রামের জন্য তৈরী হ'তে বলুন।

শেখসাহেব স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রলেন।

মুহূর্তে সেই খবর ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। ই. পি. আর এবং পুলিশ স্থানীয় যুবকদের সহায়তায় স্থানে স্থানে ব্যারিকেড তৈরী ক'রে এবং পরিখা খনন ক'রে পাক-সৈন্যের হামলা প্রতিরোধ ক'রবার জন্য তৈরী হ'য়ে রইলেন।

তারপর ?

সংগ্রাম···সংগ্রাম।

২৬ মার্চ। ১৩ চৈত্র। শুক্রবার।

সন্ধ্যে সাতটা।

স্বাধীন বাঙলা বেতারকেন্দ্র থেকে ঘোষণা শোনা গেল :

স্বাধীন বাঙলার ভাই-বোনেরা আস্‌সালামু আলেয়কুম।

মহান জননায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙলার স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রেছেন।

সারা বাঙলাদেশে আজ যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান। চিরাচরিত প্রথায় বাঙলার ধনসম্পদ লুণ্ঠন ক'রবার ঘৃণ্য মানসিকতা বর্জন ক'রতে না পেরে ওরা এখনো শোষণ অব্যাহত রাখতে চায়। ওরা তাই সকল ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে পৈশাচিক ভাবে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে বদ্ধপরিকর। সমগ্র বাঙলাদেশ, সারা পৃথিবী স্তম্ভিত। সামরিক শক্তির এহেন জঘন্য প্রয়োগের দ্বিতীয় নজির নেই পৃথিবীতে।

আজ সারা দেশ সামরিক শক্তির দাপটে এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ডে ক্ষতবিক্ষত।…

ক্যানটনমেণ্ট এলাকায় স্বাধীন বাঙলার মুক্তি যোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণে হানাদার চক্রের দল প্রায় দিশেহারা হ'য়ে পড়েছে।

এই অবস্থায় শত্রুবাহিনী শক্তি বাড়াবার উদ্দেশ্যে অনবরত হেলিকপ্টার ব্যবহার ক'রছে। কুমিল্লা থেকে সৈন্য এনে তাদের শক্তিকে মজবুত ক'রতে চাইছে। ই. পি. আর এবং অন্যান্য শক্তি তাদের মুকাবিলা করার জন্য প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

তাই আজ মুক্তিপাগল কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র জনতার নিকট

আহ্বান জানাই—শত্রুসৈন্যের মুকাবিলায় তুমুল যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। হানাদারদের যাতায়াতের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ ক'রে দিন। শত্রুসেনা শহরে প্রবেশ ক'রতে চাইলে সুবিধামতো স্থানে অবস্থান ক'রে মরিচের গুঁড়া, সোডা ও অন্যান্য জিনিস ছুড়ে দিন। হাতবোমা নিক্ষেপ করুন। গ্রামের ভাইদের কাছে আমাদের আবেদন, দলে দলে শহর অভিমুখে অগ্রসর হোন এবং ক্যানটনমেণ্ট দখল করার কাজে লিপ্ত মুক্তিসেনাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করুন। শহরের ভাইদের কাছে আবেদন, আপনারা দলে দলে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে মুক্তি-সেনাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের সর্বপ্রকার সাহায্য দিয়ে আমাদের এই দুর্বার আন্দোলনকে সফল ক'রে তুলুন।

বন্ধুগণ, আজকে সারা দেশে মানুষ উৎকণ্ঠায় পাগলের মতো হ'য়ে উঠেছে। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, নিরপরাধ নিরীহ নিরস্ত্র জনগণের ওপর ওরা অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। দেখামাত্র গুলি করছে, হাজার হাজার মানুষ আজকে মৃত্যুবরণ ক'রছে। এর নজির বিশ্বের ইতিহাসে নেই। তাই সারা বিশ্বের কাছে আবেদন জানাই, বিশেষ ক'রে আমাদের প্রতিবেশি রাষ্ট্রের কাছে, আপনারা এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড দেখেও চুপ ক'রে থাকবেন না। সাড়ে সাত কোটি এই বাঙালী ভাইদের বাঁচাবার জন্য সাহায্য করুন। আপনারা মানবতার খাতিরে, মানুষকে বাঁচাবার তাগিদে বাঙলার জনগণের মুক্তির জন্য অগ্রসর হোন।···

বাঙালী ভাইয়েরা আপনারা তুমুল সংগ্রামে নিজেদের শরিক করুন। এবং হানাদার দুশমনদের খতম করুন। যে যেখানে যে-অবস্থায় আছেন, যার হাতে যা অস্ত্র হাতে তাই তুলে নিন।··· সুবিধা মতো স্থানে অবস্থান করে শত্রু সেনাদের ঘায়েল করুন। মারাত্মকভাবে আঘাত হানুন।···আঘাতের পর আঘাত হেনে বাঙলাকে মুক্ত করুন।

পরিশেষে জানাই, বাঙলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের দেবতা, বাঙলার নয়নের মণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের নির্দেশে পরিচালিত হবে। অন্য কারুর নির্দেশ বাঙালীরা বরদাস্ত ক'রবে না এবং কোনো মার্শাল ল বাঙলীরা মানে না। আপনারা মার্শাল ল মানবেন না। আমরা স্বাধীন বাঙলার নাগরিক, স্বাধীন বাঙলার জন-নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশই আমাদের শিরোধার্য। জয় বাঙলা। স্বাধীন বাঙলা।

যে-সময়ে স্বাধীন বাঙলা বেতারকেন্দ্রের ঐতিহাসিক ঘোষণা চলছিল। প্রায় ওই সময়েই পশ্চিম থেকে শোনা যাচ্ছিল, জঙ্গীশাসক ইয়াহিয়া খানের তর্জন এবং গর্জন। তিনি বললেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা অপমান ক'রেছেন। শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর অনুগামীরা পাকিস্তানের শত্রু। তাঁরা পাকিস্তানকে ভেঙে ফেলতে চান। এই অপরাধের জন্য তাঁদের শাস্তি পেতেই হবে।

খানসাহেবের বুদ্ধি-সুদ্ধির তারিফ করতে হয়। সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসম্বাদী নেতা যিনি, যিনি নির্বাচনে পূর্ববাঙলায় ৯৮·৭ ভাগ ভোট পেয়েছেন, জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন ক'রেছেন, যিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছেন প্রাদেশিক পরিষদেও তিনি হলেন দেশদ্রোহী, আর জঙ্গীশাসক ইয়াহিয়া যাঁর পিছনে বিন্দুমাত্র জনসমর্থন নেই, যিনি সুযোগ বুঝে প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে, পিস্তলের নল দেখিয়ে আয়ুব খানকে সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন, তিনি হলেন দেশপ্রেমিক? আশ্চর্য! এই রকম নির্লজ্জ উক্তি তিনি করলেন কী ক'রে। নির্বাচনের পর ঢাকায় একদিন—না তিনি বলেছিলেন, 'আমি সৈনিক, গণ-প্রতিনিধির হাতে যথাসত্বর ক্ষমতা তুলে দিয়ে আমি আমার ব্যারাকে ফিরে যেতে চাই। আমি জানি, লোকে সামরিক শাসন পছন্দ করে না।' কিন্তু আজ কোথায় গেল তার সেই বড়ো বড়ো বুলি।

২৭ মার্চ।

বাঙলাদেশ বেতারের খবর: প্রধান সামরিক প্রশাসক লেফটেনেন্ট জেনারেল টিক্কা খান গুলিতে নিহত।

এই সেই টিক্কা খান অগনিত নিরীহ বালুচকে নৃশংসভাবে হত্যা ক'রেছে যে। বালুচেদের স্বাধিকার আন্দোলন দমন ক'রতে গিয়ে সেবার জেট আর সাঁজোয়া গাড়ি ব্যবহার ক'রেছে যে। যে একজন মুসলমান হ'য়েও রোজার মাস বলে রেয়াত করেনি বেলুচিস্তানের ধর্মভীরু মুসলমানদের। যে কানরানচ উপত্যকায় ঈদের জামাতের ওপর নির্বিচার বোমা বর্ষণ করেছিল। ওই দিনের বোমা বর্ষণে জখম হ'য়েছিলেন ৩০০ জনের মতো, নিহত হয়েছিলেন ২৬ জন। তার মধ্যে ৬টি নিষ্পাপ শিশুও ছিল যারা নতুন জামা-কাপড় পরে বাপ-দাদার হাত ধরে কানরানচে গিয়েছিল ঈদের জামাও দেখতে। তারপরেই মারুনার একটি নিরস্ত্র নিরীহ ফাফেলার ওপর বোমা বর্ষণ ক'রল। কত দেশ প্রেমিক যুবককে যে টিক্কা খান তার টর্চার চেম্বারে নৃশংসভাবে হত্যা ক'রেছে ঠিক নেই। এ সেই টিক্কা খান কচ্ছের রান অঞ্চলে যে যুদ্ধ পরিচালনা ক'রেছিল। বলেছিল, কয়েকদিনের মধ্যেই সে বোম্বে পৌঁছে যাবে। যাঁদের চাপের কাছে ইয়াহিয়া নত হ'য়েছেন, টিক্কা খান তাঁদের অন্যতম। সাধারণ সৈনিক থেকে সে আজ একজন জেনারেল হ'য়েছে। তাঁরই নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে বাঙলাদেশের নিরীহ জনতার ওপর পাক-বাহিনীর আক্রমণ।

স্বভাবতই খবরটা শুনে সকল মহলে উল্লাস শোনা গিয়েছিল। কিন্তু আমি পরে ঢাকা থেকে আগত একজন প্রথম শ্রেণীর ছাত্রনেতার কাছে খবর পেলুম, টিক্কা খান মারা যান নি। ডান হাতের গুলি লেগেছিল। হাত-ঢাকা অবস্থায় টেলিভিসনে তাঁকে একদিন বক্তৃতা দিতে দেখা গেছে।

ওইদিনের যুদ্ধের খবর: পাকিস্তানী সৈন্য বোমারু বিমান ব্যবহার ক'রছে। চট্টগ্রাম বন্দর দখল নিয়ে মুক্তিফৌজের সঙ্গে পাক-বাহিনীর তীব্র লড়াই চলছে। জাহাজ থেকে পাকবাহিনী গোলাবর্ষণ ক'রে চলেছে। দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে চট্টগ্রাম বন্দর। চট্টগ্রামের রাস্তায় রাস্তায় চলছে খণ্ড যুদ্ধ। ওদিকে মুক্তিফৌজের প্রধান মেজর জিয়া খান সকলকে লালদীঘির ময়দানে হাজির হ'য়ে মুক্তিফৌজে যোগ দেওয়ার ডাক দিলেন। ঢাকায় সাবার বেতার-কেন্দ্রের ট্রানসমিশন দখল নিয়ে মুক্তিফৌজের সঙ্গে পাক-বাহিনীর সংঘর্ষ চলছে। সেনাবাহিনী অধিকৃত কুমিল্লার পুলিশ আর্মারি দখলের জন্য জোর লড়াই হয়। মুক্তিফৌজ পাকবাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে আর্মারি দখল করে এবং অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিফৌজের সদস্যদের মধ্যে বিলি ক'রে দেয়। সংঘর্ষ চলছে দিনাজপুর এবং সিলেটেও। হাজারে হাজারে সাধারণ মানুষ—দা কাচি বর্শা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পাকবাহিনীর মেসিনগানের সামনে। হাজারে হাজারে মরছে, তবু জনস্রোতের বিরাম নেই।

বাঙলাদেশ বেতার বলল, এই তিন দিনের সংঘর্ষে ১ লক্ষ মানুষ মারা গেছ।

২৮ মার্চ। বারোটা বেজে পনের মিনিট।

স্বাধীনবাঙলা বেতারের ঘোষণা: খুলনা, যশোর এবং কুমিল্লার ক্যানটনমেনট এলাকা মুক্তিফৌজের দখলে। সরবরাহের অভাবে পাকিস্তানী সৈন্যরা অসহায় হ'য়ে পড়ছে ক্রমশ। আজ সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে সীতাকুণ্ডুর কাছে কুমিরাতে মুক্তিফৌজ তিনশ পাঞ্জাবী সৈন্যকে হত্যা ক'রেছে। বিমান অবতরণের ঘাঁটিগুলো খুঁড়ে, গাছ ফেলে অকেজো ক'রে রাখার জন্য বেতার থেকে আবেদন জানানো হ'য়েছে। সকাল সোয়া আটটায় ঢাকা দখলের জন্য চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা থেকে মুক্তিফৌজের এক বিরাট বাহিনী ঢাকা

অভিমুখে রওনা দিয়েছে। মুক্তিফৌজ যতই এগুচ্ছে ততই তার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।

অন্যান্য সূত্রের খবরে প্রকাশ, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পার্বতীপুর, ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম, যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়াতে পাক-বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিফৌজের প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলছে। লড়াই ছড়িয়ে পড়েছে সারা বাঙলাদেশে। কুষ্টিয়ার সারা ব্রিজ পার হ'তে যাচ্ছিল মুক্তিফৌজ; পাক-বিমান বোমাবর্ষণ ক'রেছে। ফলে সারা ব্রিজ অর্থাৎ হার্ডিঞ্জ ব্রিজের একাংশ বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছে। করতোয়ার নদীর ওপরকার সেতুটিও উড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছে। মুক্তিফৌজ সর্বত্র রেললাইন তুলে ফেলে রাস্তা খুঁড়ে নৌচলাচল বন্ধ রেখে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ক'রে ফেলেছে। খুলনা এবং কুষ্টিয়ায় দু কোম্পানী পশ্চিমপাকিস্তানী সৈন্যকে মুক্তিফৌজ নির্মূল ক'রে দিয়েছে। খুলনার সামরিক প্রশাসক গুরুতর আহত। দৌলতপুরে কাপ্টেন মেইজ ও তাঁর কয়েকজন লোক গুরুতর আহত। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দু'জন কর্নেল সহ চারজন উচ্চপদস্থ সৈনিক মুক্তিফৌজের হাতে নিহত হ'য়েছে। পাক-বাহিনী ময়নসিংহের মির্জাপুর আক্রমণ ক'রেছিল। মুক্তিফৌজ তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। মালদহতেও সংঘর্ষ চলছে। মুক্তিফৌজ কুমিল্লার কুলতলির কাছে ফাঁদে ফেলে ট্যাংক ধ্বংস ক'রেছে। ট্যাংক ধ্বংস ক'রতে গিয়ে ৩০ জন লোক নিহত হ'য়েছে। সৈয়দপুর-দিনাজপুরের এবং লালমনিরহাট-রংপুর রাস্তার স্থানে স্থানে খুঁড়ে সেনাবাহিনীর জীপ এবং ভ্যান চলাচল অসম্ভব ক'রে তুলেছে। খুঁড়ে খুঁড়ে গাছ ফেলে লালমণির হাটের বিমান-অবতরণ ক্ষেত্র সাধারণ মানুষ অকেজো ক'রে ফেলেছে। চট্টগ্রামে ক্যাপ্টেন ভূইঞার নেতৃত্বে মুক্তিফৌজ পাকসৈন্যের আক্রমণের সার্থক মুকাবিলা ক'রেছে।

২৯ মার্চ।

স্বাধীন বাঙলাদেশ বেতারের খবর: ঢাকায় এয়ারপোর্ট এবং বেতারকেন্দ্র দখল নিয়ে পাকসৈন্যের সঙ্গে মুক্তি ফৌজের প্রবল সংঘর্ষ হ'চ্ছে। বেতারকেন্দ্র কয়েকবারই মুক্তিফৌজের দখলে যায়। আবার পাকিস্তানী সৈন্যরা কয়েকবারই তা ছিনিয়ে নেয়। দুপুর বারোটা দশ মিনিটে ঢাকা বেতার নীরব হ'য়ে যায়। ট্র্যানসমিশন কেন্দ্রের ক্ষতি হওয়ায় কয়েকদিন ঢাকা বেতার প্রায় অচল হ'য়েছিল। মুক্তিফৌজ গাজিপুরের অরডন্যানেস ফ্যাক্টরি দখল ক'রে নিয়ে সমস্ত অস্ত্র লুটে-পুটে নিয়ে চলে গেছে। ফ্যাক্টরীর রেসিডেনসিয়াল ডাইরেকটার বিগ্রেডিয়ার করিমুল্লাহ নিহত। পাকসৈন্য চট্টগ্রাম পুলিশ-লাইন আক্রমণ ক'রে। কিন্তু মুক্তিফৌজ হানাদারদের হটিয়ে দেয়। চট্টগ্রামে পাক-ফৌজ ঢুকে পড়েছে। শহরে মুক্তিফৌজের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই চলছে। লড়াই চলছে বাঙলাদেশের চৌদ্দটা জেলায়। মুক্তিফৌজ যশোর কুমিল্লা ক্যানটনমেণ্টে পাকসৈন্যদের প্রায় অবরুদ্ধ ক'রে রেখেছে। পাকিস্তান কুমিল্লা এবং যশোরে হেলিকপ্টারে দ্রুত রসদ এবং সৈন্য পাঠাচ্ছে। রাজশাহী বেতারকেন্দ্র এবং শহর মুক্তিফৌজের দখলে। ক্যানটেনমেণ্টও অবরুদ্ধ। দিনাজপুর কুষ্টিয়া মুক্তিফৌজের দখলে। পাকিস্তান হন্যে হ'য়ে ১৭ জন জেনারেলকে এই সামরিক অভিযানের কাজে লাগিয়েছেন। ওদিকে বিমানে সৈন্যের পর সৈন্য, অস্ত্র এবং রসদ পাঠানো হচ্ছে পশ্চিমপাকিস্তান থেকে। দৈনিক এককোটি টাকা ক'রে খরচা হ'চ্ছে পাকিস্তান সরকারের। বাঙলাদেশ বেতার জানিয়েছে ইতিমধ্যেও তিন লক্ষ লোক নিহত হয়েছে।

পরের দিনের খবর, বগুড়া, খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙা এবং যশোরে পাকিস্তানী সৈন্য বিমান থেকে প্রচুর

বোমাবর্ষণ ক'রছে। রংপুর ক্যানটনমেনটে তখনও মুক্তিফৌজের অবরোধ চলছে। চট্টগ্রামে কয়েকটি ই. পি. আর ব্যারাক পাক-সৈন্য দখল ক'রে নিয়েছে। পাকিস্তান বিভিন্ন স্থানে এক ব্যাটেলিয়ন কমাণ্ডো সৈন্য নামিয়েছে। পাক-সৈন্য রাজশাহীতেও বিমান থেকে সৈন্য নামিয়েছে। সৈন্যরা কুমিল্লা, রাজশাহীতে ১২০ এম. এম. মর্টার দিয়ে লোকালয়ের ওপর গোলা বর্ষণ ক'রে চলেছে। জনসাধারণ দ্রুত গ্রামাঞ্চলে সরে যাচ্ছে। পাক-সৈন্য শহরাঞ্চল এবং যাতায়াতের প্রধান প্রধান সড়কগুলি দখলে আনার জন্য মরিয়া হ'য়ে উঠেছে। যশোর ক্যানটনমেণ্ট থেকে সৈন্যরা শহরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা ক'রছে।

তারপরের ইতিহাস?

কখনো পাকসৈন্য কোনো শহর দখল ক'রে নিচ্ছে, আবার পরক্ষণেই মুক্তিফৌজ তাদের হটিয়ে দিচ্ছে। যেখানেই পাকসৈন্য ঢুকেছে, নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। স্ত্রী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ কাউকে রেহাই দেয় নি। ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়েছে। লোক যেই বেরুতে গেছে মেসিনগানের গুলিতে শুইয়ে দিয়েছে মাটিতে। হপ্তাখানেক পর্যন্ত বাঙলাদেশের শহরে বন্দরে, বড়ো বড়ো সড়কের ছু'পাশের গ্রামে দেখা গেছে শুধু দাউ-দাউ আগুন আর ধোঁয়া। নিরীহ, নিরস্ত্র জনসাধাণের ওপর এমন নৃশংস অত্যাচার বোধহয় নাৎসীরাও করেনি। পাকসৈন্যের অত্যাচার যেন সমস্ত অত্যাচারকে ছাপিয়ে গেছে।

যশোরের চাঁচড়া রাজবাড়ির চারজন মহিলাকে পাকিস্তানী সৈন্যরা ঘর থেকে জোর করে টেনে এনেছে সামনের পুকুরের ধারে। তাদের আর্তচীৎকার ওদের মন টলাতে পারেনি। একের পর

এক তাদের ওপর বলাৎকার ক'রেছে। যাবার আগে বুলেটের গুলিতে তাদের কণ্ঠাগত প্রাণও নিঃশেষ ক'রে দিয়ে গেছে শয়তানেরা। ২ এপ্রিল দুপুর পর্যন্তও হতভাগিনীদের নগ্ন দেহগুলো পুকুরে পারে পড়ে ছিল।

কুমিল্লা থেকে এক খবরে জানা যায়, এক বাড়িতে হঠাৎ সৈন্যরা ঢুকে পড়ে। মেয়ে তখন বাথরুমে স্নান ক'রছিল। ধস্তাধস্তির শব্দ শুনে দরজা ফাঁক ক'রে দেখে একজন সৈন্য তাঁর মাকে মাটিতে ফেলে তার শাড়ি-ব্লাউজ টেনে ছিড়ে ফেলছে। মেয়ে স্থির থাকতে পারে না। দ্রুত রান্না ঘরে গিয়ে লঙ্কা গুঁড়ো এনে ছিটিয়ে দেয় সৈনিকটির চোখে। সৈনিকটি যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে উঠে তার চাপ শিথিল ক'রে দেয়। সেই অবসরে মেয়ে মাকে নিয়ে দেয়াল ডিঙিয়ে পালাতে চেষ্টা করে। মাকে পার ক'রেও দেয়। কিন্তু নিজে পালাতে পারে না। পাক-সৈন্যের গুলিতে তার দেহ লুটিয়ে পড়ে নিচে।

পাক-সৈন্যের নির্বিচার হত্যায়, অত্যাচারে, বর্বরতায় বাঙলা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ তাঁদের পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে প্রাণের তাগিদে, মানের তাগিদে একবস্ত্রে নিঃস্ব অবস্থায় এসে আশ্রয় নিচ্ছে ভারতে, ক্যাম্পে। ক্যাম্পে এমন বহু মেয়ে আছে পাক সৈন্যের ধর্ষণ থেকে রেহাই পায় নি যারা।

কুমিল্লার একটি বাড়িতে গিয়ে মিলিটারি কড়া নাড়ে। জনৈকা বয়স্কা মহিলা বেরিয়ে আসেন। সৈন্যটি তার হাত ধরে একটা হাতের নিচ থেকে বেয়নট দিয়ে চামড়া কেটে সেই চামড়া হাতের অনেকটা ওপর পর্যন্ত টেনে তুলে ফেলে; যেমনটা ক'রে পাঁঠার ছাল ছাড়ায় কশাইরা। ভদ্র মহিলা যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে ওঠে। সৈনিকটি মুখে চুকচুক ক'রে আওয়াজ তুলে বলে, 'রো মৎ। দেখো, কেয়স্যা আচ্ছা রুহ্ নিকতালতা।' ক্রূর চাপা হাসি হেসে সৈনিকটি চলে যায়।

এমনি অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। সে আর-এক ইতিহাস।

বাঙলাদেশের মানুষ আজ ছিন্নমূল। বাপ ছেলেকে খুঁজে পাচ্ছে না, মা মেয়েকে; সন্তান পিতামাতাকে। আত্মীয়-পরিজন কে কোথায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেছে কেউ জানে না।

অনেকটা পথ ডিঙিয়ে, গা-ভরা ক্লান্তি নিয়ে যখন সীমান্তের কাছে পৌঁছলাম তখন রাত হ'য়ে গেছে। একজনের সহায়তায় রাত কাটানোর মতো একটা আস্তানা পেয়ে গেলাম। পেল্লায় বনেদী বাড়ি। সারা বাড়িতে জনা-দুই লোক। অন্যরা শহরবাসী। উঠোনে দেখলাম, ধানের গোলা। ধান নেই। আমরা জামা-কাপড় ছেড়ে বাড়ির পিছন দিককার একটা নির্জন সান-বাঁধানো ঘাটে গিয়ে বসলাম। সুন্দর চৈতালি হাওয়া দিচ্ছিল। চাঁদের চাপা আলোয় বন জঙ্গল, পুরনো পুরনো বাড়িগুলো রূপকথার রাজ্যি বলে হচ্ছিল। গাছে গাছে তখনো পাখির ডানা ঝাপটানির আওয়াজ উঠছে। ওই গাঁয়েরই তিন চারজন ছেলের সঙ্গে আলাপ হ'লো ঘাটে। ওদের অনেকেরই হয়তো জন্ম এখানে, কখনো যায় নি ওপারে, পূর্ববাঙলায়। শুধু নদীর এপার থেকে ওই নিষিদ্ধ রাজ্যিটাকে দেখেছে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। দেখলাম, যুদ্ধের খবরে ওদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ এসেছে। ওপারের বাঙালি ভাইদের সাহায্যের জন্য দিনরাত খাটছে। পেট্রোল, কেরোসিন, পত্রিকা দিয়ে আসছে গিয়ে বার বার। তাঁদের একজনের সঙ্গে আলাপ হ'লো। বললাম, 'চলুন নদীর ধারটা ঘুরে আসি।'

ঘোষবাবু আমাদের নদীর ধারে নিয়ে গেলেন।

ভেড়ির কাছে, উঁচু পারে দাঁড়ালাম গিয়ে। অদূরে ভারতের বি. এস. এফের ঘাঁটি। একজন বি. এস. এফ রাইফেল কাঁধে পাহারা দিয়ে চলেছে। ক্যাম্পের কাছেই ভাঙাচুরো অনেকগুলো নৌকো। ওপারের নৌকা। এপারে এসেছিল। আটকা পড়েছে।

ঘোষবাবু ওপারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ওই যে দেখছেন আবছা মতন একটা বাড়ি, ওটাই থানা। কাছেই ই. পি. আর ক্যাম্প। চাঁদের আবছা আলোয় সবকিছুই ধোঁয়াটে দেখাচ্ছিল। না দেখেও বললাম, 'হুঁ।'

ঘোষবাবু বলে চললেন, ২৭ তারিখ রাত্রে হঠাৎ একটা গুজব ছড়ায়, পাকিস্তানী সৈন্য ওপারের গ্রাম আক্রমণ ক'রেছে। এপার থেকে কান্নাকাটি, চীৎকারের আওয়াজ শুনতে পেলাম। ওপারে অনেকে নদীতেও ঝাঁপিয়ে পড়েছে। উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে ওপারের ও. সি. এপারে আসার অনুমতি চাইলেন। আমরা বি. এস. এফের লোকদের বলে তাঁর আসার ব্যবস্থা ক'রলাম। তিনি আশ্রয় চাইলেন, সাহায্য চাইলেন। ওপারে ই. পি. আরের পাঁচজন অবাঙালী। পাঠান। ওরা বলে, খানসেনা। ওদের সর্দারটি বাঙালী ই. পি. আরদের হাত থেকে সমস্ত অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে। এপার থেকে কোনো সাহায্য যাতে ওপারে গিয়ে না পৌঁছুতে পারে তার জন্য খান-সেনারা সব সময় সতর্ক পাহারা দিয়ে চলেছে।

আমরা ওপারের ছেলেদের হাত নেড়ে, চীৎকার ক'রে সাহস জুগিয়ে চললাম। রাতের অন্ধকারে নৌকো ক'রে ওদের ওখানে যাই। সলামর্শ দিই। খানসেনাদের আটকানোর পরিকল্পনা আঁটা হ'লো।

ওপারের ই. পি. আরের ওয়ারলেস অপারেটর ছিলেন বাঙালী। যশোর ক্যানটনমেন্ট থেকে খবর আসে, 'খানকো বোলাও।'

একটু সময় বাদে তিনিই উর্দুতে পশতুতে মিশিয়ে জবাব দেন,' 'মাই খান বোল রহা হ্যায়।'

তারপর সমস্ত গোপন নির্দেশগুলো জেনে নেন। শোনেন, যশোরে তাঁদের অবস্থা ভালো নয়।

একদিন পরিকল্পিতভাবে খানদের বলা হ'লো, 'আজই তোমাদের

যশোর থেকে ডেকে পাঠিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ি পাঠাচ্ছে। সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছিল। ও. সি-র পাঠানো গাড়ি এলো। গাড়ির চারপাশে গাঁয়ের লোকেরা ওঁৎ পেতে রইল। পুলিশের লোকও আছে। ই. পি. আরের বাঙালী সদস্যরাও তৈরী হ'য়ে রয়েছে। সর্দারটির হাতে ছিল ব্রেনগান। অন্যদের কাঁধে রাইফেল। ওরা গাড়িতে উঠতে যাবে, হঠাৎ ক'রে তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল অনেক ছেলে। তারা কাঁধ থেকে রাইফেল নামাবার অবকাশও পেলো না। একজন ছেলে ছোঁ মেরে সর্দারের হাত থেকে ব্রেনগানটি তুলে নিল। বাঙালী ই. পি. আর পুলিশ রাইফেল উচিয়ে ধরল। বন্দী করা হ'লো পাঁচজন খান-সেনাকে। জনসাধারণের মনে কী উৎসাহ। ওদের সর্দারকে নিয়ে জবাই দিল গাঁয়ের লোক। তারপর তাঁর দেহ নদীর জলে ভাসিয়ে দিল। অন্যদের বন্দী করে নৌকোয় তুলে এপারের পুলিশের হাতে তুলে দিল। খানসেনারা বন্দী হওয়ায় ওপারের লোকেদের মধ্যে নতুন উৎসাহ দেখা দিল।' নদীর ধার থেকে ফিরে এলাম। ঠিক হ'লো, ঘোষবাবু আমাদের ওপারে পৌঁছে দেবেন খুব ভোরে।

চিক—চিক—চিক। কুউ—উ কুউ—উ। চুক—চুউক। পাখিদের কলরবে ঘুম ভেঙে গেল। জানালা দিয়ে চোখ গেল বাইরে। ফর্সা হ'য়ে গেছে। ঘরের ফোঁকর থেকে ফুড়ৎ-ফুড়ৎ ক'রে কয়েকটা চড়ুই উড়ে গেল। দু'চারটা কুটো পড়ল মেঝেতে। চারদিকে তখনো এক সুন্দর নির্জনতা। গাছপালার গায় যেন একটা প্রশান্তি ছড়িয়ে রয়েছে। হাতমুখ ধুয়ে তৈরী হ'তে-না-হ'তেই ঘোষবাবু এসে হাজির হ'লেন। তাঁর সঙ্গে কয়েকটি ছেলে। বেরিয়ে পড়লাম। বি. এস. এফের ক্যাম্পের ধার দিয়ে নদী পার হওয়া যাবে না। এবড়ো-খেবড়ো অনেকটা জমিন পার

হ'য়ে এলাম নির্দিষ্ট জায়গায়। নদীর ধারেই জেলেদের বাড়ি। ঘোষবাবু জেলেদের নৌকো নিয়ে এলেন। উঠলাম তাতে। সূর্য তখন পুব আকাশে উঠে গেছে। ভোরের পরিচ্ছন্ন আলোয় গাছ-পালা, নদী সবকিছু ঝরঝরে ঠেকছে।

নৌকো গিয়ে ওপারে ভিড়ল। সামান্য জল ভেঙে যখন পারে গিয়ে দাঁড়ালাম, এক আশ্চর্য অনুভূতি আমায় অসাড় ক'রে ফেলল। সেই কাস্তের মতো বাঁকা খেজুরগাছ। সেই ঘরদুয়োর, সেই গোয়ালঘর তবু যেন সবকিছু নতুন ঠেকছে আজ। কিছুদিন আগেও যে দেশে ছিলাম, সে যেন সে দেশ নয়। এ তো পূর্বপাকিস্তান নয়, স্বাধীন বাঙলাদেশ। যে-সোনার বাঙলার কথা একদিন আমরা ভাবতাম, মুন্সীগঞ্জের চরে, ধানের ক্ষেতে, শ্মশানে, গোরস্তানে নির্জন রাত্রিতে, আমি শাহাবউদ্দীন আতোয়ার আলো সিতাংশু এনাজুর আরও অনেকে যে সোনার বাঙলা, স্বাধীন বাঙলা গড়ার স্বপ্ন দেখতুম, পরিকল্পনা করতুম, ১৯৬০ সালের দিকে, আজ সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত। আমার দুঃখ, আজকের এই সুখের দিনে আতোয়ার নেই। শাহাবউদ্দীন, প্রজেশ, আলোর কাছে থেকেও আমি বিচ্ছিন্ন। দুঃখ, আজ শাহাবউদ্দীন, আলোর পাশে পাশে রাইফেল হাতে থাকতে পারছি না বলে। আজ ডাক ছেড়ে বলতে ইচ্ছা ক'রছে, শাহাবউদ্দীন মেমসাহেব তোমরা কোথায়? তোমরা কি লড়ছ? তোমরা বেঁচে আছ তো বন্ধু? 'আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' বলতে বলতে মাটিতে হাত ছুঁইয়ে কপালে ঠেকালাম। আমি জানি, আমরাই সেদিন স্বাধীন বাঙলা গুপ্তসমিতি করিনি, এমনি সমিতি আরও নানান জায়গায় গড়ে উঠেছিল। গড়ে উঠেছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে, সিলেটে এবং আরও কয়েকটি জায়গায়। ছাত্রলীগ জঙ্গীবাহিনীর একজন প্রথম সারির নেতা আমায় বলেছে, সিরাজভাই এ-নিয়ে '৬১-'৬২ সাল থেকেই

ভাবছিলেন। আমাদের নিয়ে তেজগাঁর দূর গ্রামে, পরিত্যক্ত বিমানঘাঁটিতে চলে যেতেন। সেখানে তিনি স্বাধীন বাঙলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন। পরিকল্পনা ক'রতেন।

নদীর পার বেয়ে আমরা রাস্তায় উঠলাম। সুরকি ঢালা একটা সরু রাস্তা নদীর ধার দিয়ে বহুদূর চলে গেছে। পথেই পড়ল ই. পি. আরের ক্যাম্প। চারদিকে ইটের দেওয়াল। ছাউনি টিনের। সুন্দর বাংলো প্যাটার্নের ক্যাম্প। ঝকঝক ক'রছে। ভিতরে সুরকি ঢালা পথ। পথের দু'পাশে নানারঙের ফুল। ক্যাম্পের এক কোণে নদীর দিকে মুখ ক'রে তৈরী হয়েছে একটা বাংকার। ক্যাম্পে ঢুকলাম। সকলের সঙ্গে পরিচয় হ'লো। ওয়ারলেস অপারেটর ভদ্রলোককে দেখলাম। ফর্সাপানা দীর্ঘদেহী মানুষটি। তাঁরা তখন গোছগাছে ব্যস্ত ছিল। যশোর থেকে ডাক এসেছে। যুদ্ধে যেতে হবে। তাঁদের স্পীডবোটটি থানায় জিম্মা ক'রে দিলেন। গাঁয়ের কয়েকজনের কাছে ই. পি. আরের লোকেরা তাঁদের দেশের ঠিকানা দিয়ে অনুরোধ জানাল, যুদ্ধে গিয়ে আর ফিরতে না পারলে পরিজনের কাছে যেন খবরটা পাঠানো হয়। ওয়ালেস্ সেটটিও নিয়ে চলেছেন ওঁরা। ওঁরা আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। করমর্দন ক'রলেন। তাঁদের নেতা ব্যাংকারের ওপরে উঠে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'পশ্চিমা সৈন্যরা আমাদের ওপর শোষণ চালাবার জন্য নির্বিচারে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা ক'রে চলেছে। আমরা আজ বসে থাকতে পারি না। ওদের সঙ্গে লড়াই ক'রব। আমরা সৈনিক। একবার যখন অস্ত্র ধরেছি, জান দেব, তবু পিছু হটব না কখনো। ইন্‌সআল্লাহ্ জয় আমাদের হবেই। জয় বাংলা।'

ওখান থেকে থানায় এলাম। থানায় লোকজন তেমন নেই, সিপাইসান্ত্রী নেই। গারদগুলো ফাঁকা। সকলে ছাড়া পেয়ে গেছে।

দারোগাসাহেবের সঙ্গে আলাপ হ'লো। তিনি গাছ থেকে ডাব পেড়ে আনতে বললেন। অনেক মানা করেও দারোগা-সাহেবের অনুরোধ শেষ পর্যন্ত ফেলতে পারলাম না। ডাবের জলে চুমুক নিতে দিতে দারোগাসাহেবের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তাঁর কাছে শুনলাম খুলনায় গণ্ডগোলের সূত্রপাতের ইতিবৃত্ত।

২৬ তারিখ খুলনায় কার্ফু জারি করা হ'লো। কয়েকজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান জুম্মার নামাজ আদায় ক'রতে গিয়েছিলেন বড়ো মসজিদে। পাকসৈন্যরা তাঁদের গুলি ক'রে হত্যা ক'রল। এস-পিকে হাউস এ্যারেস্ট ক'রে রাখল। এস পির দুইজন পুলিশ যাঁরা তাঁর বাড়িতে প্রহরা ছিল, তাঁরা পুকুরপার ঘুরে গোপনে অতর্কিতে টহলদারী সৈন্যদের ওপর গুলি ছুড়ে ছুড়ে তাদের অনেককে হত্যা ক'রল। ক্ষিপ্ত হ'য়ে পাকিস্তান সেনাকর্তৃপক্ষ জীপ জীপ সৈন্য পাঠালো। পুলিশ দুইজন অন্যদের সহায়তায় গর্ত কেটে রেখেছিল, সেনাবাহিনীর গাড়ি এসে তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সেনাবাহিনীর অনেকেই মারা পড়ল। তারপরেই ক্রমশ খুলনায় সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ল।

যশোরে পাক-সেনারা প্রথম ই. পি. আর ও পুলিশ লাইন আক্রমণ করে। তারপর সংঘর্ষ বেঁধে যায়।

•

কুষ্টিয়ায় লড়াই ক'রেছে এমন কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে আলাপ হ'লো। তাদের কাছে কুষ্টিয়ার মুক্তিসংগ্রামের একটা ছবি পাওয়া গেল। তাদের একজন পুলিশ লাইনে ছিলেন। তার জবানীতেই শুরু করি সেখানকার কাহিনী।

'পঁচিশে মার্চ রাত দশটা-সোয়া দশটা হবে তখন। আমি পোশাক ছেড়ে লুঙ্গি-গেঞ্জী পরে তখন ঘুমোতে যাবার আয়োজন ক'রছিলাম। হঠাৎ মেসিনগানের গুলির আওয়াজ পেয়ে ছুটে

দোতলার জানলার ধারে গেলাম। দেখলাম, সৈন্যদের কয়েকটা সাঁজোয়াগাড়ি দাঁড়িয়ে। ভ্যান এবং জীপ থেকে পাকিস্তানী সৈন্যরা লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে বিভিন্ন দলে ভাগ হ'য়ে ব্যারাকে ঢোকার চেষ্টা ক'রছে। পুলিশ-লাইনের সান্ত্রীরা কিছু বুঝবার আগেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আমাদের হতচকিত অবস্থা তখন খানিক কেটেছে। দ্রুত ছুটে গেলাম রাইফেলের দিকে। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হ'য়ে গেছে। ওরা ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়েছে। আমি দৌড়ে অন্যদিকে চলে গেলাম। মাঠে নেমে এলাম। ওই লুঙ্গি এবং গেঞ্জি-পরা অবস্থায়ই পালালাম। সৈন্যরা নিচতলা থেকে আমাদের লোকজনকে ওপরে তাড়িয়ে এনে একটা ঘরে আটকে রেখেছিল। অস্ত্রাগার খুলে সব অস্ত্র নিয়ে নিয়েছিল। সৈন্যরা ঘণ্টা দেড়-দুইয়েকের মধ্যেই টেলিফোন এ্যাকচেঞ্জ, জেলা হাইস্কুল, সার্কিট হাউস, কোর্ট, ওয়্যালেস সেণ্টার, ডি. সি'র বাড়ি সব দখল ক'রে নিল। নির্বিচার গুলি-গোলা চালিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ধ্বংস ক'রল পুলিশ লাইনের আশেপাশে বাড়ি-ঘর। ক্ষতিগ্রস্ত হ'লো সারকিট হাউস, টেলিফোন এ্যাকচেঞ্জ, ওয়্যারলেস সেণ্টার, জেলা স্কুল। সেদিন সারা রাত ধরে দাউ দাউ আগুন জ্বলেছে কুষ্টিয়ায়। কত যে লোক পাক-সৈন্যের গুলিতে মরেছে সেদিন জানি না: মৃত্যু-ভয়ে যে-যেমন অবস্থায় ছিল ছুটেছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

ভোর হ'য়ে এলো। শোনা গেল, সৈন্যরা এস. ডি. ওকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেছে। ভোর ছ'টা থেকে সৈন্যরা কার্ফু জারি ক'রল। কিন্তু আমরা তখন প্রথম ধাক্কাটা সামলে উঠেছি অনেকখানি। শহরের বাইরে ছাত্র, যুবক, গাঁয়ের মানুষ তখন লাঠি, সড়কি, দা হাতে জমায়েত হ'তে শুরু ক'রেছে। কিছু রাইফেল আর বন্দুকও জোগাড় হ'য়ে গেল। সকলে রাগে ফুঁসছে। জনতা গিয়ে ট্রেন লাইন উপড়ে ফেলল। কুষ্টিয়া-মেহেরপুরের সড়কের

একটা অংশ কেটে ফেলল চোখের পলকে। দেখতে দেখতে রাস্তায় তৈরি হ'লো অসংখ্য ব্যারিকেড। কুষ্টিয়ার সঙ্গে তখন বাইরের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল।

বেলা বাড়তেই সৈন্যদের জীপের আনাগোনা চলল। তারা ব্যারিকেড সরিয়ে যায়, তো পরক্ষণেই আবার ব্যারিকেড গড়ে ওঠে। সৈন্যরা রাস্তায় লোক দেখলেই গুলি ছুড়ছে। কয়েক জায়গায় সৈন্যদের সঙ্গে আমাদের বিক্ষিপ্ত গুলি বিনিময়ও হ'লো। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হ'লো সৈন্যদের অত্যাচার। এতক্ষণ ওরা স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টগুলো দখল ক'রে ছিল। লোকে ভেবেছিল, কিছু ধরপাকড় হবে, সামান্য গুলি-টুলিও ছুড়তে পারে, ব্যস। সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এবারে সৈন্যদের স্বরূপ প্রকাশ পেল। ওরা বাড়ি বাড়ি ঢুকে আমাদের মেয়েদের ইজ্জত নিল। অনেককে ধরে নিয়ে গেল। সেই সঙ্গে চলল লুঠতরাজ।

আমরা কিন্তু ওই মুহূর্তেই সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম না। সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। হানাদাররা ভাবল, জনসাধারণ ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে। একদফা ব্যাপক আক্রমণের পরই সব ঠিক হ'য়ে যাবে ভেবে ওরা যশোর ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে রসদ বেশি আনে নি। সাতাশ, আঠাশ তারিখে সারা শহরে কোনো আওয়াজই পাওয়া গেল। সব কিছু নীরব, স্তব্ধ। কিন্তু তলে তলে আমাদের ব্যাপক প্রস্তুতি চলেছে। সাইকেলে, স্কুটারে, লোকের হাতে হাতে অস্ত্রশস্ত্র গিয়ে পৌঁছছিল জায়গা মতো।

মেহেরপুর ও চুয়াডাঙার গোপন ঘাঁটিতে তৈরি হ'তে থাকল বোমা। চুয়াডাঙার ট্রেজারিতে চোদ্দ শ'র মতো রাইফেল ছিল। সেগুলি আনসার, ছাত্র, যুবক কর্মীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হ'লো। ছাত্রদের রাইফেল চালনা শিখিয়ে দেওয়া হ'লো। থানার বন্দুক সব জনতার হাতে তুলে দেওয়া হ'লো। কিছু ভারি অস্ত্রও পাওয়া গেল।

মেহেরপুরের এস. ডি. ওর নেতৃত্বে আনসার, মুজাহিদ এবং ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকদের এক বাহিনী পাঁচটি ট্রাকে মীরপুরে হ'য়ে কুষ্টিয়ায় পৌঁছে গেল। চুয়াডাঙা থেকেও ই. পি. আরে একটা বিরাট বাহিনী এসেছে। আঠাশ তারিখের রাত্রির মধ্যেই কুষ্টিয়ার আশে পাশে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার মুক্তিসেনা জড়ো হ'য়ে গেল। লড়াইয়ের জন্য সকলেই প্রস্তুত।

পাক-সৈন্যরা তখন পাঁচটি ঘাঁটিতে নিজেদের রুদ্ধ ক'রে রেখেছে। আঠাশে মার্চ রাতেই আমরা কুষ্টিয়া শহর তিনদিকে ঘিরে ফেললাম। অন্য দিকে গড়াইনদী। ওখান দিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা পালাতে পারবে না।

আমরা উনত্রিশ মার্চ রাত আটটার দিকে প্রথম আক্রমণ শুরু ক'রলাম। ই.পি. আর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ ও স্বেচ্ছাসেবকদের এক বিরাট বাহিনী এগিয়ে চলল পুলিশ লাইনের দিকে। প্রায় এক মাইল জুড়ে এই পুলিশ লাইন। চারদিক থেকে আমরা পুলিশ লাইন ঘিরে ফেললাম। পুলিশ লাইনের কাঁটাতারের ওপারে পাঞ্জাবী সৈন্যরাও তখন লড়াইয়ের জন্য তৈরি হ'য়ে গেছে। পাঞ্জাবীরা শয়তানি করে বাঙালী সৈন্যদের সামনে রাখল, যাতে আমরা গুলি না করতে পারি। আমরা আমাদের বাঙালী ভাইয়ের বুকে গুলি ছুড়তে পারি না। দু'পক্ষ নীরবতা পালন ক'রে চলেছে। রাত বারোটার দিকে আমরা প্রথম আক্রমণ ক'রলাম। কয়েকটা গ্রেনেড ছুড়ে দিলাম ভিতরে। সুইসাইড স্কোয়াডের ছেলেরা গ্রেনেড ছুড়তে ছুড়তে ভিতরে ঢুকে পড়ল। পাক-সৈন্যরা তখন মেসিনগান থেকে গুলি ছুড়ে চলেছে। গ্রেনেডের ঘায়ে একটা মেসিনগান অকেজো হয়ে গেল। আমরা গুলি ছুড়তে ছুড়তে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। বুলেটের আঘাতে অনেকেই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তবু আমরা দুর্দম বেগে এগিয়ে গেছি সামনে। ফাঁক

বুঝে কয়েকজন বাঙালী সৈন্য এসে আমাদের সঙ্গে ভিড়ে পড়ল। ভারি অস্ত্রপাতিগুলি ওরাই চালাল। গুলি করতে অস্বীকার করায় পাঞ্জাবী সৈন্যরা অনেক বাঙালী সৈন্যকে হত্যা করে। আমাদের বিরাট বাহিনীর বেপরোয়া আক্রমণের মুখে মুষ্টিমেয় পাক-সৈন্য বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়ল। শেষটায় পাঠান সৈন্যরা আত্ম সমর্পণ ক'রল। পুলিশ লাইন আমাদের দখলে এলো।

বাকিরা তখন জেলা-স্কুল এবং সার্কিট হাউসে অবরুদ্ধ হ'য়ে রইল। ওদের খাবারও ফুরিয়ে গিয়েছিল। যশোর থেকে সাহায্য এসে পৌঁছুতে পারছিল না। আমাদের খাবারের জোগান দিয়ে গেছে আমাদের মা-বোনেরা।

৩১ মার্চ ভোর রাত্রে আমাদের দ্বিতীয় দফা আক্রমণ শুরু হ'লো। সার্কিট, হাউস, জেলা স্কুলও আমাদের দখলে এলো। অনেক পাকিস্তানী সৈন্য মারা গেল। বাকিরা পালাল। কিছু আত্মসমর্পণ ক'রল। পুরো কুষ্টিয়া আমাদের দখলে চলে এলো। বেলা এগারোটা নাগাদ পাক সৈন্যরা অবশ্য বোমা ফেলেছিল বিমান থেকে, কিন্তু কিছুই ক'রতে পারে নি।'

মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে কুষ্টিয়া দখল একটি স্মরণীয় অধ্যায় নিঃসন্দেহে।

মুক্তি-সংগ্রাম প্রথম সুরু হয় চট্টগ্রামে। যথার্থ সংগ্রাম বলতে যা বোঝায় প্রথমদিন তো ঢাকা বা অন্য কোথাও হয় নি, হ'য়েছে প্রতিরোধ। চট্টগ্রামের বীর ছেলেদের সংগ্রাম এবং অবদান অতুলনীয়। চট্টগ্রামে আওয়ামীলীগ কর্মীরা তাদের নেতা আবদুল হান্নানের নেতৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরণ-যুদ্ধে। মুক্তিফৌজ দখল ক'রে নেয় চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্র। আবদুল হান্নান শেখ সাহেবের নির্দেশ অনুসারে ঘোষণা করেন স্বাধীনতা। স্বাধীন বাঙলা বেতারকেন্দ্রের

অনেকগুলি ঘোষণাই ছিল হান্নানসাহেবের। কিন্তু মেজর জেয়াউর রহমানের।

মেজর জেয়াউর রহমান মেজর জিয়া খান নামে প্রথম দিকে মুক্তিফৌজের সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব নেন। মেজর জিয়া ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের ছাত্র। পদমর্যাদার তুলনায় বয়স খুবই কম। বেঙ্গল রেজিমেণ্টের অফিসার জিয়া। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার জিয়ার অফিসার, জিয়ার আদর্শও। সামরিক অভিযান চালানোর আগের দিন প্রধান-সামরিক প্রশাসক প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার নির্দেশ জানিয়ে ব্রিগ্রেডিয়ার মজুমদারকে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা নিয়ে আটক ক'রে রাখলেন। টিক্কা খান ব্রিগ্রেডিয়ার মজুদারকে ভয় পাচ্ছিলেন। কারণ বাঙালী রেজিমেণ্টের সৈন্যরা ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে পীরেরও চেয়েও ভক্তি করে, পরম আত্মীয় থেকেও বেশি ভালোবাসে। ব্রিগ্রেডিয়ার মজুমদারের মতো আপনজনের সাক্ষাৎ আর সৈন্যরা কখনো পায়নি।

ব্রিগেডিয়ার মজুমদার তাঁর সৈন্যদের প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। প্রতিটি সৈন্যের খোঁজ-খবর নিতেন। নিজে গিয়ে জানতেন কে কীরকম খাচ্ছে, কার শারীরিক অবস্থা কী রকম, বাড়ির লোকেরা কোনো অসুবিধায় আছে কিনা। সৈন্যদের সুখ-দুঃখের সর্বসময়কার সাথী ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মজুমদার। তাইতো সৈন্যরাও তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে, তাঁর কথায় ওঠে-বসে।

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালেই মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মজুমদার। বাঙালীর দাসত্ব মোচন ক'রতেই হবে। বাঙলাদেশের চরম প্রয়োজনের দিনে তিনি তাঁর সৈন্যদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, গিয়ে দাঁড়াবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাশে। তিনি তাঁর কয়েকজন অনুগত জুনিয়র অফিসারকে সেকথা বলেও রেখেছিলেন। তাঁদের একজন মেজর জিয়া; অন্য

জন চাকমা ক্যাপ্টেন। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ঢাকা যাবার আগে তাঁর অফিসারদের নির্দেশ দিয়ে গেলেন, তোমরা তৈরি থেকো, আমি না ফিরলে তোমরা লড়াই ক'রো, সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়ো, পশ্চিমপাকিস্তানী সৈন্যদের ওপর। দখল ক'রে রাখবে চট্টগ্রাম।

ব্রিগেডিয়ার মজুমদার আর ফিরলেন না। ভোর রাতের দিকে ক্যানটমেণ্টে পাঞ্জাবী সৈন্যরা কয়েকজন ঘুমন্ত বাঙালী সৈন্যকে গুলি ক'রে হত্যা ক'রল। বাঙালী সৈন্যরা জেগে উঠে অস্ত্র তুলে নিল হাতে। মুহূর্তে মুকাবিলা ক'রল পাঞ্জাবী সৈন্যদের। পাঞ্জাবী সৈন্যরা পাহাড়ের ওপরে উঠে গেল। বাঙালী সৈন্যদের হাতে জনা-চল্লিশেক পাঞ্জাবী সৈন্য নিহত হ'লো প্রথম দফায়।

পরদিন সীমান্ত থেকে ই. পি. আর এবং পুলিশ-বাহিনী এসে পড়ল বেঙ্গল রেজিমেণ্টের সহায়তায়। হাজার হাজার ছাত্র শ্রমিক এসে যোগ দিল তাদের সঙ্গে। এক দুর্বার মুক্তিফৌজ গড়ে উঠল দুই-তিন দিনেই। মেজর জিয়া আর আবদুল হান্নানের নেতৃত্বে চলল তুমুল লড়াই। পাক-সৈন্যরা সমুদ্র থেকে আক্রমণ শুরু ক'রল ভারি কামান দিয়ে। মুক্তিফৌজ মুকাবিলা ক'রে চলল সেই আক্রমণের। পতাঙ্গার পথে পথে, চট্টগ্রামের স্থানে স্থানে চলল নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ।

চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্র হ'য়েছে 'স্বাধীন বাঙলা বেতারকেন্দ্র।' সেখান থেকে জিয়ার নির্দেশ প্রচারিত হ'লো। চট্টগ্রামের কালুর-ঘাট ট্র্যান্সমিটার শেষ অবধি মুক্তি ফৌজরা দখল ক'রে রেখেছিল প্রাণপণ চেষ্টায়। লালদীঘি ময়দানে দলে দলে যুবক এসে মুক্তি-ফৌজে নাম লেখাল।

চট্টগ্রামের পাক-সৈন্যদের সহায়তায় কুমিল্লা ক্যানটনমেণ্ট থেকে ৮০ ট্রাক সৈন্য পাঠানো হয়। কুমিল্লার পথে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে

তাদের তুমুল লড়াই হয়। শোনা যায়, তাতে পাক-সৈন্যরা বিপর্যস্ত হ'য়ে ফিরে যায়।

ডেনমার্কের একজন ছাত্র জন মার্টিন্সুসেনের কাছ থেকে চট্টগ্রামে লড়াইয়ের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। ৪ এপ্রিল মার্টিন্সুসেন চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে আসেন। তাঁর কথা: ২৫ মার্চ শহরে কয়েকটা অস্বাভাবিক বিষয় লক্ষ্য পড়ে। এগারোটা নাগাদ দেখলাম, ক্যানটনমেণ্টের পথে কয়েকজন ই. পি. আর ঘুমুচ্ছে। হাউসিং সোসাইটিতে পশ্চিমপাকিস্তানী অফিসারদের বাড়িগুলিতে কড়া প্রহরা বসানো হ'য়েছে। শেষ রাতের দিকে ক্যাণ্টনমেণ্ট গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। ২৬ মার্চ সকালে হাউজিং সোসাইটি এলাকা থেকে কিছু ই. পি. আরের লোককে গ্রেপ্তার ক'রল। কয়েকজনকে হত্যাও করে। ই. পি. আর তার বদলা নিল। তারাও সাতজন পাঞ্জাবী সৈন্য মেরে ফেলল। কিছু অবাঙ্গালী ব্যাংক-অফিসার তখন বাঙালী মুসলমানদের উপর গুলি ছুড়ল। জনতা ক্ষিপ্ত হ'য়ে তাদের হত্যা করল। ওই দিন ই. পি. আর এবং বাঙালী রেজিমেণ্ট ক্যাণ্টনমেণ্ট এলাকা ঘিরে ফেলল। আমি দেখলাম, হাজার হাজার মানুষ লুঙিপরা অবস্থায় দা-কাচি নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসছে রাস্তায়। সকলেরই লক্ষ্য ক্যানটনমেণ্ট। কিছু কিছু মুক্তিফৌজ বাড়ির ছাদে ছাদে গরম জল, লঙ্কা গোলা জল নিয়ে তৈরি হ'লো।

বিকেলের দিকে গুলি-গোলা শুরু হ'লো। বহু লোক দেখলাম শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে চলেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

৩০ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানী সৈন্যরা ক্যাণ্টনমেণ্ট, নৌ-দফতর এলাকায় অবরুদ্ধ হ'য়ে রইল। ওই দিন দুপুর আড়াইটায় দুটো পাকিস্তানী বোমারু বিমান, সম্ভবত সেবারজেট থেকে আক্রমণ চালাল স্বাধীন বাঙলা বেতারকেন্দ্রে। তিন-তিনবার রকেট ছুড়ে

বেতারকেন্দ্রটি অকেজো ক'রে দিল। অনেক রাতে শহরের পশ্চিমাঞ্চলে প্রবল গোলাগুলির শব্দ পাওয়া গেল। তিন ঘণ্টা ধরে চলল সেই গুলি-গোলা।

আমার চাকর এসে বলল, শহরতলি অঞ্চলে পাকিস্তানী সৈন্যরা কাচা বাড়ি-ঘরগুলিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, লোকজন বেরুতে গেলে তাদের গুলি ক'রে হত্যা ক'রেছে। পশ্চিমপাকিস্তানী একজন মেজর আমাকে বলেছে, 'আমি লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে পুলিশদের গুলি ক'রে মেরেছি। কুকুরগুলোর কয়েক দিনের খাবার হবে। তেইশ বছর ওদের খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ ক'রেছি, আজ আমাদের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়িয়েছে। হাতির কোন্ পাঁচ পা দেখেছে ওরা।'

৩১ মার্চ শহরের অবস্থা পাল্টাল। ক্রমে পাকিস্তানী সৈন্যরা শহরের দখল নিতে শুরু ক'রল। শহরে ঢুকে সৈন্যরা নির্বিচারে গুলি ছুড়ে হত্যার তাণ্ডব চালাল। একটা দোকানে জনা-পনের লোক খাবার কিনছিল, গুলি ক'রে মেরেছে তাদের সৈন্যরা নির্দয় ভাবে। বাজারে এবং বহু বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল সৈন্যরা। আমি ছাদ থেকে দেখলাম, চারদিকে শুধু দাউ-দাউ আগুন জ্বলছে। ক্যানটনমেন্টের পথে ৪০টি ফ্যাক্টরী পাক-সৈন্যরা জ্বালিয়ে দিয়েছে। মর্টার দেগে চট্টগ্রামে নিউমার্কেট পাক-সৈন্যরা ধ্বংস ক'রে দিল।

আমাদের জাহাজের ক্যাপ্টেন বললেন, তিনি নিজে নদীতে চারশ' দেহ ভেসে যেতে দেখেছেন। পরে আরও ৮০টি মৃত দেহ-পড়ে থাকতে দেখেন।

পাকিস্তানী সৈন্যরা চট্টগ্রাম:দখল করে নিল বটে, কিন্তু বাঙলা-দেশ থেকে তাদের পাততাড়ি গোটাতে হবেই।

যে-দেশে কর্নেল ওসমানী, মেজর জিয়া খানের মতো দেশ প্রেমিক যোদ্ধা জন্মায়, যত শক্তিই থাক, সে-দেশ হানাদাররা কিছুতেই

দখলে রাখতে পারেন না। স্যাণ্ডহার্স্টে'র ছাত্র হ'য়েও বাংলা ছাড়া কথা বলেন না কর্নেল ওসমানী। বৃটেনের লেবার পার্টির সদস্য যখন কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে দেখা করেন, কর্নেল ওসমানী তাঁর জবাব বাঙলায় দিচ্ছিলেন। একজন দো-ভাষী তাঁর ইংরেজী অনুবাদ ক'রে দিচ্ছিলেন। কর্নেল ওসমানী অত্যন্ত দক্ষ সৈনিক। গত বছর চাকুরি থেকে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু দেশের ডাকে, বাঙলা মায়ের ডাকে আবার তিনি নেমে এসেছেন লড়াইয়ের ময়দানে। সিলেটে মুক্তিযুদ্ধ চালাচ্ছিলেন তিনি। বেগম ওসমানীও স্বামীর পাশে পাশে থেকে স্বামীকে সাহস জুগিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন।

এক সাংবাদিক বন্ধুর কাছে ঢাকার সর্বশেষ সংবাদ পেলাম। ঢাকায় এখনো যারা আছে ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছে। এখনো ঢাকায় পাক সৈন্যরা বাঙালি হত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে আগের মতো এত বেপরোয়াভাবে নয়। এখন হত্যা ক'রছে প্রকাশ্যে নয়, কিছুটা গোপনে। তবে এখনো নৃশংস এবং ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চলছে গ্রামে। অত্যাচারটা চলছে বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর। পাকিস্তানী সৈন্যরা হিন্দুদের তাড়িয়ে পূর্ববাঙলাকে সংখ্যালঘু ক'রতে এবং ভারতের অর্থনীতি ওপর চাপ সৃষ্টি ক'রতে চায়।

ঢাকায় পাক-সৈন্যরা এখন হঠাৎ-হঠাৎ একা-একটা এলাকা ঘিরে ফেলে পনের থেকে চল্লিশ বছরের লোকদের দল বেঁধে ধরে নিয়ে যায়। প্রতি সকালেই দেখা যাবে ট্রাক-ভর্তি লোককে চোখ বেঁধে, হাত বেঁধে সৈন্যরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে ক্যানটনমেণ্টে। কোনো কোনো ট্রাকে মেয়েদেরও দেখা যাচ্ছে। গোড়ায় রাস্তার ওপরই মেয়েদের ইজ্জত হানি ক'রেছে পাক-সৈন্যরা। এখন বোধ হয়, ক্যানটনমেণ্টে নিয়ে যায়। জানি না তাদের কী হাল হয়। গড়ে রোজ এমনি ৩০০ লোক ধরে নিয়ে-যাওয়া হ'চ্ছে। পরে বুড়িগঙ্গায়

তাদের রক্তশূন্য নিষ্প্রাণ দেহ ভাসতে দেখা যাচ্ছে। পাকিস্তানী সৈন্যদের এখন রক্তের খুব প্রয়োজন। এর মধ্যেই অন্তত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার পাক-সৈন্য আহত হ'য়েছে। তাদের প্রয়োজনীয় রক্তের জোগান দিতে হচ্ছে এইসব হতভাগ্য বাঙালীদের। তাদের শরীর থেকে শেষ বিন্দু পর্যন্ত রক্ত শুষে নিয়ে রক্তশূন্য দেহগুলো ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে নদীতে। ঢাকা ক্যানটনমেন্টের সিগনাল মেসের কাছে বিরাট বিরাট গর্তে তাদের স্তূপাকৃত ক'রে অনেককে মাটি চাপা দেওয়া হচ্ছে একসঙ্গে। উঃ কী বর্বরতা, কী পৈশাচিকতা। এই সব হতভাগ্যের বেশির ভাগই জিকাতলা, কলাবাগান, সাজাহানপুর, খিলগাঁওর বাসিন্দা।

সরকারি অফিসারগুলি প্রায় কর্মচারি শূন্য। কোর্টকাছারি আইন-আদালতের বালাই এখন ঢাকাতে নেই। বাঙালী অফিসারদের ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে অনেকে প্রাণ ভিক্ষা পাচ্ছে। পাক-সেনাবাহিনীর অফিসারদের একটা দলের নজর এখন বড়ো ঘরের শিক্ষিতা মেয়েদের দিকে। সুযোগ পেলেই তাদেরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে নিজেদের আস্তানায়।

সৈন্যরা নামী নামী বাঙালী ব্যবসায়ীকেও ধরে নিয়ে গুলি ক'রে হত্যা ক'রছে। এঁদের মধ্যে এসোর জেনারেল ম্যানেজার আলমগীর রহমান এবং রেলি ব্রাদার্সের মালিক এ, আহাদও রয়েছেন।

সামরিক কর্তৃপক্ষ বলেছিল যেসব বাঙালী শ্রমিক কাজে যোগ দেবে তাদের কিছু করা হবে না। তাদের কথায় বিশ্বাস ক'রে আদমজী জুট মিলের কিছু বাঙালী শ্রমিক কাজে যোগ দিতে গিয়েছিল। সৈন্যরা তাদের হত্যা ক'রে শীতলক্ষার জলে ভাসিয়ে দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় শহীদমিনার ভেঙে সেখানে উর্দু সাইনবোর্ড লাগিয়েছে : 'এটা মসজিদ'। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো মুসলমান সেখানে নামাজ পড়তে যায় নি।

মার্চের গোড়ায় পাক-সৈন্যের গুলিতে নিহত হ'য়েছিল ইকবাল ফারুক। মালিবাগ চৌরাস্তার কাছে আইল্যাণ্ডে তার দেহ সমাহিত করা হ'য়েছিল। সৈন্যরা মাটি খুঁড়ে সেই দেহ নিয়ে গেছে।

কিছু দিনের বেলা যতই অত্যাচার করুক, রাতের বেলা সৈন্যরা বড়ো একটা বেরুতে সাহস পাচ্ছে না। মুক্তিসেনারা অতর্কিতে হানা দিয়ে বেশ কয়েকজনকে হত্যা ক'রেছে। জীপ উল্টে যাচ্ছে মুক্তিযোদ্ধার গ্রেনেডে। শান্তিকমিটী করার নাম দিয়ে যেসব কুলাঙ্গার বাঙালী সাধারণের ওপর অত্যাচার ক'রছিল, সেনাবাহিনীর সহায়তা ক'রছিল তাদের কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে প্রাণ দিয়েছে। তারাও এখন ক্রমশ আতঙ্কিত হ'য়ে উঠছে।

পলাশীর এক আম্রকুঞ্জে বাঙালীর স্বাধীনতা অস্তমিত হ'য়েছিল, হ'শো চোদ্দ বছর বাদে মুজিবনগরের আম্রকুঞ্জে নতুন রূপে খণ্ডিত বাঙলার একটা অংশে আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম নিল স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ। স্বাধীনবাঙলা বেতার থেকে প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় ২৬ মার্চ। ১৭ এপ্রিল দেশী-বিদেশী শতাধিক সাংবাদিক, অতিথি এবং কয়েক সহস্র জনতার উপস্থিতিতে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হ'লো :

যেহেতু ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হইয়াছিল এবং যেহেতু এই নির্বাচনে বাঙলাদেশের জনগণ ১৬৯ আসনের মধ্যে আওয়ামীলীগ দলীয় ১৬৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়াছিলেন ৮ এবং যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চ তারিখে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন এবং যেহেতু আহুত এই অধিবেশন স্বেচ্ছাচার এবং বেআইনীভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন এবং যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিবার পরিবর্তে বাংলাদেশের গণ-প্রতিনিধিদের সহিত পারস্পরিক আলোচনা চলাকালে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ হঠাৎ ন্যায়নীতি বহির্ভূত এবং বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠান জন্য

২৬শে মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান এবং যেহেতু পাকিস্তান-কর্তৃপক্ষ বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ-পরিচালনা করিয়াছে এবং এখনও বাঙলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে নজির বিহীন গণহত্যা ও নির্যাতন চালাইতেছে এবং যেহেতু পাকিস্তান সরকার অন্যায় যুদ্ধ ও গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার পরিচালনা দ্বারা বাঙলাদেশের গণ-প্রতিনিধিদের একত্রিত হইয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়া জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে সেই হেতু বাঙলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাঙদেশের উপর তাঁহাদের কার্যকরী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাঙলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যে ম্যাণ্ডেন্ট দিয়াছেন, সেই ম্যাণ্ডেন্ট মোতাবেক আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন করিয়া পারস্পরিক আলাপ আলোচনায় মাধ্যমে বাঙলাদেশে জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য—সেইহেতু আমরা বাঙলাদেশকে সার্বভৌম গণ-প্রজাতান্ত্রিক বাঙলাদেশে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি এবং উহার দ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করিতেছি।

এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক পদেও

অধিষ্ঠিত থাকিবেন। রাষ্ট্রপ্রধানই সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী।

রাষ্ট্রপ্রধানের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়োগের ক্ষমতা থাকিবে। তাঁহার কর ধার্য ও অর্থব্যয়ের ক্ষমতা থাকিবে, তাঁহার গণ-পরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও উহার অধিবেশন মুলতুবী ঘোষণার ক্ষমতা থাকিবে। উহা ছাড়া বাঙলাদেশের জনসাধারণের জন্য আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হইবেন।

বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে কোন কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা রাষ্ট্রপ্রধান যদি কাজে যোগদান করিতে না পারেন অথবা তাঁহার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে যদি তিনি অক্ষম হন তাহা হইলে রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপরাষ্ট্রপ্রধান পালন করিবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসাবে এবং জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তাইয়াছে উহা যথাযথভাবে আমরা পালন করিব।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের এই স্বাধীনতার ঘোষণা ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকরী বলিয়া গণ্য হইবে।

সভা শুরু হওয়ার আগে আনসার-বাহিনী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার দেন। তিনি আসলে উপরাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যগণ মঞ্চে এলেন। আম্রকুঞ্জের শীতল ছায়ায় তৈরি হ'য়েছে খোলা মঞ্চ। মঞ্চের কয়েকটা মেহগনিগাছ মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে

রয়েছে। সভামঞ্চের তিনটি সোফা লাল কাপড়ে মোড়া ছিল। দু'পাশে ছিল তিনটা কাঠের চেয়ার। সামনে ছিল একটা ছোট্ট সাইড টেবিল। একটু দূরে আমগাছ আর খুঁটির সঙ্গে জড়িয়ে একটা বৃত্ত রচনা করা হ'য়েছিল, তার মধ্যে দাঁড়িয়েছিলেন কিছু সশস্ত্র সৈনিক। কিন্তু একটু দূরে গাছের ফাঁকে ছিল আরও সৈনিক। সকালের রোদ গাছের ফাঁকে ফাঁকে এসে চিত্তির কাটছে মঞ্চে, এখানে-ওখানে, গায়ে। আবদুল মান্নান অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন: তারপর গাওয়া হ'লো জাতীয় সংগীত: আমার সোনার বাঙলা তোমায় আমি ভালবাসি সকলে। উঠে দাঁড়ালেন।

সেদিনকার অনুষ্ঠানে একজনের অভাব সকলেই বোধ ক'রছিলেন। মন্ত্রিসভার সকলেই বার বার সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ ক'রছিলেন বঙ্গবন্ধুর অবদান। সাংবাদিকরা জানতে চাইলেন বঙ্গবন্ধু কোথায়? এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বললেন, বঙ্গবন্ধু এখনও আমাদের সঙ্গে আছেন। আমরা তাঁর নির্দেশ পালন ক'রছি। সময়মতো আপনাদের জনপ্রিয় নেতা আত্মপ্রকাশ ক'রবেন।'

কিন্তু করাচি বেতার ২৭ মার্চ, শনিবার সকাল সাতটা পনেরো মিনিটে খবর দিয়েছে, শেখ মুজিবুর রহমানকে তার ৩২ নং ধানমণ্ডীর বাড়ি থেকে ২৫ মার্চ রাত্রি ১২টা ১০ মিনিটে গ্রেপ্তার করা হ'য়েছে।

তারপরেই স্বাধীনবাঙলা বেতার থেকে ঘোষণা করা হয়, শেখ মুজিবুর রহমান না ধৃত, না মৃত। তিনি মুক্ত এবং সুস্থ।

২৮ মার্চ ইউ এন আই খবর দিল, বিদেশী একাধিক সাংবাদিক ঢাকা থেকে লনডনে ফিরে বলেছেন মুজিবুর রহমান আত্মগোপন ক'রতে অস্বীকার ক'রেছেন এবং সম্ভবত তিনি জেলে। লনডনের

গার্ডিয়ান পত্রিকা'র সম্পাদকেরও ধারণা মুজিবুর রহমান জেলে। তাঁর ধারণার সূত্র শেখ সাহেবের আত্মগোপন ক'রতে অস্বীকার করা।

২৯ মার্চ দিল্লির সরকারী সূত্রে প্রকাশ, ভারত-সরকার মনে করেন মুজিবুর গ্রেপ্তার হন নি। তিনি এখনও মুক্ত। কুষ্টিয়া থেকে সেখানকার মুক্তিফৌজের প্রধান উপদেষ্টা আসাবুল হক জানান, শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিফৌজের সামরিক সদর দপ্তরে নিরাপদেই আছেন।

২ এপ্রিল যুগান্তর পত্রিকায় 'সব জল্পনাকল্পনার অবসান' শীর্ষক শিরোনামায় খবর বেরোয়, নয়াদিল্লি সরকারী মহলের খবর, শেখ মুজিবুর রহমান এখনও মুক্ত আছেন। গতকাল অর্থাৎ ১ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত নয়াদিল্লি কাছে শেখ মুজিবুরের তাই খোঁজ আছে।

আগরতলা থেকে ইউ এন আইয়ের খবর বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান পাকিস্তানী সৈন্যদের অভিযান আশঙ্কা ক'রে ২৫ মার্চ সকালে ঢাকায় তাঁর ধানমণ্ডীর বাড়ি থেকে চলে যান। ঢাকার এক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক একথা জানিয়েছেন।

রয়টারের খবর: লনডনের টেলিগ্রাফ পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে লাহোরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁর বিচার হবে।

চুয়াডাঙ্গার এম এল এ আবু আমেদ বজলুর রশিদ পি টি আইকে বলেছেন বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিরাপদেই আছেন। লনডন থেকে যে খবর বেরিয়েছে তা ভুয়া বলে তিনি মন্তব্য ক'রেছেন।

আর-একটি খবর, ২৬ মার্চ রাত একটায় ই পি আরের দুজন বাঙালী অফিসার তাঁদের সঙ্গে যেতে শেখ মুজিবুরকে বাধ্য করান। আগরতলা থেকে এই খবরটিরই একটু রকমফের খবর পাওয়া যায়। খবরটি এই সৈন্যদের মতো দেখতে একদল লোক জীপ

থেকে শেখ সাহেবের বাড়ির সামনে নেমেই এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে এবং দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢোকে। গুলি চলার সময় শেখ সাহেব তাঁর স্ত্রী, তিন পুত্র—কামাল, জামাল রাছল দুই কন্যা—হাসিনা ও রেহানা এবং জামাতা ডাক্তার ওয়াজেদকে নিয়ে পিছনের ড্রয়িংরুমে যান। পরক্ষণে শেখসাহেব চীৎকার করে বলেন, 'গুলি বন্ধ করো।' এরপর তিনি হানাদারদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলেন, 'গুলি করার কী মানে হয়, আমাকে ফোন করলেই পারতেন।' কিন্তু চলে যাওয়ার সময় অপহরণকারীদের কণ্ঠে নাকি 'জয় বাংলা ধ্বনি' শোনা যায়।

ডেইলি টেলিগ্রাফের সংবাদদাতা সাইমন ড্রিংকের খবর, শেখ মুজিবের একজন প্রতিবেশী তাঁকে জানিয়েছেন, একজন পুলিস অফিসার এসে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। একটা ভ্যানে তাঁর বাড়ি থেকে সমস্ত কাগজপত্র তুলে নেয় এবং বাড়িটা নষ্ট করে দেয়।

১০ এপ্রিল রাওয়ালপিণ্ডি থেকে রয়টার খবর দিল, শেখ মুজিবের বন্দীদশার একটি ছবি পাকিস্তানসরকার প্রচার ক'রেছেন। ছবিতে দেখানো হয়েছে শেখ মুজিব দু'জন পুলিস অফিসার পরিবৃত হ'য়ে একটি ঘরে সোফায় বসে রয়েছেন। ঘরটি করাচি বিমানঘাটির ভি আই পি লাউঞ্জের মতো বলে সংবাদদাতার অনুমান।

আওয়ামীলীগের জাতীয় পরিষদের একজন সদস্য (রংপুর) আসাম সীমান্তের কাছে একজন সাংবাদিককে জানান ২৫ মার্চ গভীর রাত্রিতে তাজউদ্দীন সাহেব কয়েকজন ই পি আর-এর লোককে নিয়ে শেখ মুজিবের বাড়ি যান। বারবার অনুরোধের পরও শেখসাহেব নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে অস্বীকার করায় তাজউদ্দীন সাহেব রিভলভার উঁচিয়ে বলেন, 'আমি আপনাকে পাঞ্জাবীদের হাতে মরতে দেব না। আপনি যদি আমাদের সঙ্গে

আসতে না চান তাহলে একজন বাঙালীই আপনাকে হত্যা করার সুযোগ লাভ করুক।' তখন শেখসাহেব মত বদলালেন এবং তাঁদের সঙ্গে গেলেন।

জাতীয় পরিষদ সদস্য শামসুল চৌধুরী একজন সাংবাদিককে জানান আসাম-বাঙলা সীমান্তের কোনো এক জায়গায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আমি দেখা করি। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং জীবিত আছেন।

১৬ এপ্রিল পশ্চিম পাকিস্তানের "জঙ" পত্রিকা খবর দিল সামরিক আদালতে শেখ মুজিবুরের বিচার হবে।

পাকিস্তান সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মেজর জেনারেল মহম্মদ আকবর খান ৫ মে জানান শেখ মুজিব জীবিত এবং সুস্থ আছেন।

১৬ মে উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শনে এসে কলকাতায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বললেন, গোড়ায় আমাদের কাছে যে খবর ছিল সেই অনুযায়ীই আমরা বলেছি শেখ মুজিবুর মুক্ত এবং নিরাপদে আছেন। পাক সরকার বিভিন্ন রাষ্ট্রকে জানিয়েছে, শেখ মুজিব ধৃত। সরকারীভাবে আমাদের কাছে কোনো খবর নেই।

বর্তমানে সাধারণভাবে সকলেই বিশ্বাস ক'রতে শুরু ক'রেছেন, শেখ মুজিব ধৃত এবং তিনি অনশনরত রয়েছেন। আওয়ামীলীগ কর্মীদেরও অনেকে এই খবর বিশ্বাস করেন। এপ্রিলের মাঝামাঝি ছাত্রলীগের কয়েকজন প্রভাবশালী ছাত্রনেতা আমাকে বললেন, 'মুজিবভাই অ্যারেস্ট' হ'য়ে গেছেন। ঢাকা থেকে সদ্য আগত অনেক ছাত্রও এই কথাই বলেন। কিন্তু যাঁরা বলেছেন শেখ মুজিব মুক্ত আছেন তাঁদের, বিশেষ ক'রে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং বাঙলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের

কথা কি উড়িয়ে দেওয়া? এখন অবশ্য, তাজউদ্দীন সাহেব বলছেন, শেখসাহেব ধৃত। তাহ'লে তিনি পূর্বে বলেছিলেন কেন যে শেখ সাহেব মুক্ত? মনে রাখতে হবে তাঁরা দায়িত্বহীনের মতো কোনো উক্তি ক'রতে পারেন না। কথার মারপ্যাঁচ তাঁরা রাখতে পারেন, কিন্তু সরাসরি মিথ্যা সংবাদ অন্তত জেনেশুনে পরিবেশন ক'রতে পারেন না। এটা ঠিক যে, তাজউদ্দীন আহমদ শেখসাহেবের সঙ্গে ২৫ মার্চ রাত এগারোটা পর্যন্ত ছিলেন। খবরটা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রের। তারপরেও তাজউদ্দীন সাহেবের পক্ষে শেখসাহেবের বাড়িতে কিছুক্ষণ থাকা স্বাভাবিক। সেই সময় শেখসাহেবের বাড়ি আরও অন্তত একজন ছিলেন। তিনি শেখসাহেবের বডি গার্ড। নাম মহিউদ্দীন (মুন্সীগঞ্জ)। এগারোটা দশ মিনিটের সময় সামরিক অভিযান প্রথম শুরু হয়। ফার্মগেটের কাছে একটা ব্যারিকেড সরানো নিয়ে শেখ মুজিবের বাহিনীর সঙ্গে পাকসৈন্যের প্রথম সংঘর্ষ হয়। শেখ মুজিবের ধানমণ্ডীর বাড়ি আক্রান্ত হয় বারোটা পাঁচ-সাত মিনিটে। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, শেখ সাহেব ঢাকার বাইরে যাবার সময় পাননি। শেখসাহেব গ্রেপ্তার হ'য়েছেন—এই ধারণা আরও দৃঢ় হয় যখন শুনি, হুলিডে পত্রিকার সম্পাদক এনায়েতউল্লা খানেক ধরে নিয়ে সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা তাজউদ্দীন আহমদ, নজরুল ইসলাম প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দেরই খোঁজ ক'রতে। শেখ মুজিবের খোঁজ তাঁরা করেন নি। তাহলে কি ধরে নিতে হয় শেখসাহেব সত্যি গ্রেপ্তার হ'য়েছেন? সরাসরি 'হ্যাঁ' বলা যাচ্ছে না। কেননা, তাজউদ্দীন অহমদ এবং মহীউদ্দীন যদি ঢাকা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরে থাকেন, তাহ'লে শেখ সাহেবই-বা পারবেন না কেন? কারণটা কি তাঁর আত্মগোপনে অস্বীকৃতি? বিদেশী সাংবাদিকদের অনেকে এবং 'গারডিয়ান' পত্রিকার সম্পাদকের ধারণা কিন্তু তাই।

দ্বিতীয় বিষয়, শেখ মুজিব যদি পঁচিশ তারিখ রাত্রিতেই গ্রেপ্তার হবেন, তাহ'লে পরদিন সকালের খবরে পাকিস্তান রেডিও সেই সংবাদ জানাল না কেন? শেখ মুজিবের গ্রেপ্তারের সংবাদে গণ-বিক্ষোভ আরও তীব্র হ'য়ে উঠবে বলে কি? তাই যদি হবে তবে ২৭ মার্চ সকালে কেন তাঁর গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রচার করা হ'লো? ধরে নেওয়া যাক, পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ যখন দেখলেন, পঁচিশ-ছাব্বিশ দু'দিন পর্যাপ্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রেও জনসাধারণকে দমানো গেল না, বরং সমস্ত বাঙালী এককাট্টা হ'য়ে অসম সাহসে পাক-সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে চলেছে, যখন দেখলেন মুজিবের গ্রেপ্তারের খবর চেপে রেখেও প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ দমিয়ে রাখা গেল না এবং যখন দেখলেন, মুজিবের নামে গোপন বেতার থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হ'য়েছে, তখন গোপন বেতারকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার জন্য এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য শেখসাহেবের গ্রেপ্তারের খবর প্রচার করা উচিত বিবেচনা ক'রলেন পাক-কর্তৃপক্ষ। ২৭ মার্চ শেখ সাহেবের খবর প্রথম প্রচারিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, তাই যদি হবে, পাক-কর্তৃপক্ষ যদি মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল ভাঙার জন্যই শেখসাহেবের গ্রেপ্তারের খবর প্রচার ক'রে থাকবেন, তাহ'লে শেখ মুজিব মুক্ত—বাঙলাদেশ এবং ভারত সরকারের এই বারংবার প্রচারের মুখেও পাক-কর্তৃপক্ষ নিজেদের উক্তির সত্যতা প্রমাণের ব্যবস্থা ক'রলেন না কেন? সত্যতা প্রমাণের পথ ছিল দুটো, এক, শেখ সাহেবের বন্দী অবস্থার ফটো প্রকাশ করা; দুই, দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের নিয়ে বন্দী শেখসাহেবকে দেখানো। পাক-কর্তৃপক্ষ প্রথম ব্যবস্থাটি নিলেন, কিন্তু অনেক বিলম্বে। ১৬ দিন বাদে শেখ মুজিবের বন্দীদশার একটি আলোকচিত্র প্রকাশ ক'রলেন পাক-কর্তৃপক্ষ। ফটোটি এই: একটি ঘরে সোফায় উপবিষ্ট বিমর্ষ শেখসাহেবের ছবি। শেখসাহেবের দু'পাশে দুজন

প্রহরী। ঘরটি দেখতে করাচি বিমানবন্দরের ভি. আই. পি. রুমের মতো। শেখসাহেবের পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি এবং হাফ মুজিব কোট। শীত চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলের মতো শেখ সাহেবও যে তাঁর কোট ছেড়ে দিয়েছিলেন এটা সকলেরই জানা। শেখসাহেব মার্চ মাসে পাজামা এবং সাদা পাঞ্জাবিই পরতেন। তাহলে ওই কোটটি এলো কোত্থেকে? তাছাড়া পাক-কর্তৃপক্ষের ছবির সঙ্গে শেখ মুজিবের সাম্প্রতিক কালের চেহারার পার্থক্যটাও চোখে পড়ার মতো। তাহ'লে কি এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে, ছবিটা মুজিবের সাম্প্রতিক গ্রেপ্তারের পর তোলা নয়। পাক-কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ছবি প্রকাশ করাটা ছিল খুবই জরুরি, তা তাঁরা করতে পারলেন না কেন? যদি ধরেও নিই ছবিটা সত্যি, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, যখন পাক-কর্তৃপক্ষ বুঝলেন, ছবিটা প্রকাশ করা খুবই প্রয়োজন, এবং তা ২৬-২৭ মার্চেই প্রকাশ করা সম্ভব থাকা সত্ত্বেও তা প্রকাশ ক'রতে ১৬ দিন সময় নিলেন কেন? তাছাড়া এই ছবিটা সম্পর্কে যখন অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ ক'রেছেন, সেক্ষেত্রে নিজেদের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য পাক-কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল না কি বন্দী মুজিবের আরও ছবি প্রকাশ করা?

মে মাসে ঢাকার বিভিন্ন দালানকোঠা মেরামত করে টিক্কা খান যখন ছয়জন বিদেশী সাংবাদিককে ঢাকা পরিদর্শনে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেলেন, ঢাকা ঘুরিয়ে দেখালেন, তখনও তো নিজেদের উক্তির সত্যতা প্রমাণের জন্য বিদেশী সংবাদিকদের বন্দী শেখ মুজিবকে দেখাতে পারতেন? কথা বলতে না দিন, কিছুটা ব্যবধানে থেকে শেখ মুজিবকে তাঁদের দেখতে দিতে কোনো আপত্তি থাকার কারণ ছিল না। তা ছাড়া আওয়ামী লীগের সাধারণ কর্মী এবং ভারতের কিছু পার্লামেন্ট সদস্যের বারংবার দাবির মুখে শ্রীতাজউদ্দীন আহমদ

এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শেখ মুজিবের মুক্তির প্রশ্নে পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য বড়ো বড়ো রাষ্ট্রগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা ক'রছেন না কেন? আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ দেখছি এ-ব্যাপারে নির্বিকার। অবশ্য ৬ জুন সৈয়দ নজরুল ইসলাম রাজনৈতিক সমাধানের শর্ত হিসাবে বাঙলাদেশ সরকারের প্রেসিডেণ্ট শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি চেয়েছেন। শেখসাহেব যদি সত্যিই অনশনরত থাকেন তাহলে তাঁর উক্তিতে যথেষ্ট উদ্বেগ থাকতো। কারণ, ওইদিন শেখ মুজিবের অনশনের ৭৩ দিন অতিবাহিত হয়। কবে রাজনৈতিক সমাধানের আলোচনার কথা উঠবে তার নেই ঠিক, শেখসাহেব অনশনরত থাকলে তাঁর মুক্তির প্রশ্নই তখন উঠবে না। কারণ ততদিন কোনো মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব।

তাহ'লে কি এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয়, শেখ মুজিব মুক্ত? এ প্রশ্নের জবাবেও 'হ্যাঁ' বলা যাচ্ছে না। কারণ, শেখ মজিব যদি মুক্তই থাকবেন তাহ'লে এই বিপদের দিনে, যখন তাঁর উপস্থিতির একান্তই প্রয়োজন, তখন তিনি কোথায়? তিনি যদি মুক্ত থেকে আত্মগোপন করেই থাকেন, তাহলে তিনি অন্তত তাঁর সই-করা তারিখ-দেওয়া বাণী এবং টেপরেকর্ড-করা ভাষণও তো প্রচার ক'রতে পারেন অনায়াসেই, তা তিনি পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তেই থাকুন না কেন? বিশেষ ক'রে আজ যখন তাঁকে নিয়ে পরস্পর বিরোধী মন্তব্যে সারা বিশ্ব সরগরম, বিশেষ করে তাঁর একটি হলেও বাণী, একটি হলেও ভাষণের যখন খুবই প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, তখনও তাঁর কাছ থেকে তা পাওয়া যাচ্ছে না কেন? তিনি মুক্ত থাকলে নিশ্চয়ই তা পাওয়া যেত। ১৭ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে যখন প্রজাতন্ত্র বাঙলাদেশের জন্ম হ'লো, রাষ্ট্রপতি হ'য়েও তিনি তখন অনুপস্থিত কেন? পাকচর বা গুপ্তঘাতকের ভয়ে? সে ভয়টা তো

তাজউদ্দিন আহমদ, নজরুল ইসলাম প্রমুখদের ক্ষেত্রেও থাকার কথা। তাঁরা সংবাদিকদের সামনে আসতে পারলে, তিনিই বা আসলেন না কেন? তবে তিনি কোথায়? অপ্রিয় হ'লেও একটি প্রশ্ন আসে তিনি কি তবে মৃত? এ মতের স্বপক্ষের কারণগুলো প্রথমে আলোচনা করা যাক। এ ব্যাপারে প্রথম সন্দেহের সৃষ্টি করে, মুজিবের নামে বৈদ্যনাথতলার 'মুজিবনগর' নামকরণ। শেখ সাহেব মুক্ত থাকলে এ নামকরণে তিনি নিশ্চয়ই রাজী হতেন না। এই নামকরণ এবং সেই সঙ্গে শেখসাহেবের সহকর্মিগণ কর্তৃক ওই অনুষ্ঠানে বার বার তাঁর অবদান উল্লেখ করাটা শ্রদ্ধা প্রদর্শন নিশ্চয়ই। মানুষের মৃত্যুর পরই সাধারণতঃ এই ধরণের শ্রদ্ধা প্রদর্শন হ'য়ে থাকে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, এই ধরণের শ্রদ্ধা প্রদর্শন অন্য ক্ষেত্রেও হ'তে পারে না।

পাকিস্তান সরকারের মুখপাত্রের উক্তিটিও এ প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। তিনি বলেছেন, শেখ মুজিব জীবিত এবং সুস্থ। পাকিস্তান সরকারের ঘোষণা মতো শেখ মুজিব যখন অনশন ক'রে চলেছেন, যখন তাঁর মৃত্যুর প্রশ্নই ওঠে না, যখন তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতির প্রশ্নই মাত্র ওঠে, তখন তাঁর 'সুস্থ' শব্দটি প্রয়োগ সঙ্গতই হ'য়েছে। কিন্তু হঠাৎ তিনি 'জীবিত' শব্দটি প্রয়ো॰॰ ক'রতে গেলেন কেন? তাহ'লে কি পাকিস্তান সরকারের মাথায় বিপরীত ধারণাই কাজ ক'রছে?

সেক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে প্রথমেই কেন তাঁরা 'শেখ মৃত'—কথাটা ঘোষণা ক'রলেন না? প্রশ্নটির জবাব এই: সম্ভবত তাঁরা ভেবেছিলেন, শেখসাহেবকে হত্যা করার ঘোষণায় মুক্তিপাগল প্রতিটি বাঙালী ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠবে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র তাঁকে ধিক্কার দেবে। তাই ইয়াহিয়া শেখকে 'ধৃত' বলে ঘোষণা ক'রেছিলেন। কিংবা এও হতে পারে, পাক-কর্তৃপক্ষ শেখ সাহেবকে

না পেয়ে ধরে নিয়েছেন শেখ সাহেব 'মৃত'। তাই তাঁরা মুক্তি-ফৌজের মনোবল ভাঙার উদ্দেশে শেখ মুজিব 'ধৃত' ঘোষণা ক'রতে সাহসী হ'য়েছেন। তখন হয়ত মাথায় ঢোকে নি, যে-'ধৃত' তাঁকে 'মুক্ত' করার প্রশ্নও আসবে। বিপদে পড়ে এখন তাই অনশনের নাম দিয়ে সম্ভাব্য সময়ের পর শেখকে 'মৃত' ঘোষণার প্রতীক্ষায় আছেন পাক-কর্তৃপক্ষ। এদিকে বাঙলাদেশও হয়তো ইয়াহিয়ার শেখ মুজিবুরকে গ্রেপ্তারের সংবাদটা কাজে লাগানের চেষ্টায় আছেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন হয়ত ভালো করেই জানেন যে, শেখ মুজিব ধৃত নন। তাই বর্তমানে নীরব থেকে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ অদূর ভবিষ্যতে ইয়াহিয়াকে তাঁরই মিথ্যার জালে আটকানোর পরিকল্পনা ক'রেছেন—এমনটাও হ'তে পারে। হয়তো সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দীন আহমদ কর্তৃক শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিটা তাঁরই একটা প্রাথমিক পদক্ষেপ। শেখ মুজিবের গ্রেপ্তারের পর আজ (২৯ জুন) ৯৮ দিন অতিবাহিত হবে। অনশনরত একজন লোককে (যত সবলই হোন) নব্বুই দিনের বেশি ইয়াহিয়া বাঁচিয়ে রাখতে পারেন না। পাক সরকার শেখ মুজিবর মৃত কিংবা অনশন ভঙ্গ করেছেন এবং অনশন ভাঙার কারণ স্বরূপ বলেন তাঁর সঙ্গে ইয়াহিয়ার একটা সমঝোতা হ'য়েছে, তাহ'লে শিগ্‌গীরই তাঁকে ওই রকম একটা ঘোষণা ক'রতেই হবে। আর একটি পথ আছে। এ-ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা। বাঙলাদেশ সরকার চান ইয়াহিয়া প্রথম সম্ভাব্য ঘোষণাটি করুক। তখন তাঁরা বিশ্বজনমত গঠনে সেই ঘোষণাটাকে কাজে লাগাতে পারবেন। সেই জন্যেই সম্ভবত তাঁরা নীরবতা অবলম্বন ক'রছেন। মুজিবকে এখন 'মৃত' ঘোষণার ফলটা সারাবিশ্বে যে কী মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রবে তা যে ইয়াহিয়া বুঝতে না পারছেন তা নয়, সেক্ষেত্রে ইয়াহিয়া সম্ভবত দ্বিতীয় সম্ভাব্য ঘোষণাটিই ক'রবেন।

সেক্ষেত্রেও বাঙলাদেশ সরকার লাভবান হবেন। বাঙলদেশ সরকার বিশ্বের সামনে তখন শেখ মুজিবকে হাজির করার চেষ্টা ক'রে প্রমাণ ক'রতে চাইবেন ইয়াহিয়ার জালিয়াতি। তার অর্থ দাঁড়ায় শেখ গ্রেপ্তার হননি। তা যদি না পারেন তা'হলে চ্যালেঞ্জ জানাবেন সেই উক্তির এবং তোলপাড় শুরু ক'রবেন এই বলে যে, মুজিবকে পাক-সরকার হত্যা করে ফেলেছে। এই পথে ভারত এবং বাঙলাদেশ ইতিমধ্যে এগুতে শুরু ক'রেছেন। তখন মুজিবকে সামনে না আনান, মুজিবকে দিয়ে টেলিভিসনে একটা বক্তৃতা তো পাক-সরকারকে দেওয়াতেই হবে। সেক্ষেত্রেও বাঙলাদেশ সরকার লাভবান হবেন।

আর যদি একশ' দিন পরেও পাক-সরকার নীরব থাকেন তাহলে অন্তত প্রমাণ হবে, শেখ অনশন ক'রছেন না।

শেখ মুজিব জীবিত—এই মতের বড়ো সমর্থন হ'লো তাঁকে বাঙলাদেশ সরকারের প্রেসিডেণ্ট করা হ'য়েছে।

এই পর্যালোচনা এবং পরস্পর-বিরোধী মন্তব্য থেকে নির্যাস যে-টুকু বের করা গেল তাই এই (১) সাধারণ বিশ্বাস, তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং অনশনরত আছেন, (যুক্তির বিচারে তা মেনে নিতে অসুবিধা হয়) (২) তিনি মুক্ত। (এ যুক্তিও ধোপে টেকে না।) (৩) তিনি মৃত। (এও নিঃসংশয়ে বলা যায় না।)

শেখ মুজিব মুক্ত, গ্রেপ্তার বা মৃত কোনোটাই যদি না হন, তা'হলে আর কী হতে পারে? এমনও তো হতে পারে যে, তিনি গ্রেপ্তার হন নি। গ্রেপ্তার হন নি, অথচ মুক্তও নন—এমন কী হতে পারে? সম্ভাব্য উত্তর, তিনি ঢাকার কোনো এক জায়গায় আছেন, যেখান থেকে তাঁর পক্ষে বেরুনো সম্ভব হচ্ছে না। পাক-সৈন্যরা সদা সতর্ক প্রহরা দিয়ে চলছে তার চার পাশে। আমার কাছে এ রকম একটা খবরও আছে যে, শেখ সাহেবের বডি গার্ড মহিউদ্দীন জোর ক'রে

শেখসাহেবকে কোনো একটি বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছেন। আমার সংবাদের সূত্রটি মোটামুটি নির্ভরযোগ্য। তিনি আমাকে বাড়ির নির্দিষ্ট ঠিকানাও বলেছেন। এই সংবাদ মিথ্যা বা সত্যি যাই হোক না কেন, এর বেশি কিছু বলা এখন আমার উচিত হবে না।

শেখসাহেবের কী হাল হ'য়েছে তা সঠিক করে বলা না গেলেও এ কথা ঠিক যে, বাঙলাদেশের মানুষ এমন প্রয়োজনের দিনেও তাঁদের বন্ধু শেখ মুজিবকে কাছে পাচ্ছেন না।

১৮ জুন,

কল্হন,

আগরতলা এসে চিঠিটা ডাকে ফেললাম। এতদিনে সবই শুনেছিস। যে-বাঙলা দেশের স্বপ্ন আমরা একদিন দেখেছিলাম আজ তাই বাস্তবায়িত হ'তে চলেছে। বাঙলার মানুষ অনেক রক্ত দিয়েছে, প্রয়োজনে আরও দেবে। বাঙলার দামাল ছেলেমেয়েরা রক্ত দিতে ভয় পায় না। শহীদের বেদী ছুঁয়ে আমরা শপথ নিয়েছি 'মাগো তোমায় মুক্ত করব।' —এই শপথের মর্যাদা রাখতে আমরা আমাদের শেষ রক্ত-বিন্দু পর্যন্ত ঢেলে দেব। যত শক্তিশালীই হোক হানাদার পশ্চিমপাকিস্তানী সৈন্যদের আমরা হটাবই। কী বর্বর, কী নৃশংস অত্যাচার ওরা চালিয়েছে আমাদের ওপর তুই কল্পনাও ক'রতে পারবি না। কত মা সন্তান হারিয়েছে, কত সন্তান বাবা-মাকে হারিয়েছে, বাঙলার কত নারী ধর্ষিতা হ'য়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আমার হাতে স্টেটসম্যানের একটা কপি এসেছিল। তাতে দেখলাম, একজন বিদেশীর কাছে পাক-সেনাবাহিনীর একজন অফিসার বলেছে, বাঙলাদেশের প্রত্যেক মেয়েকে আমরা রক্ষিতা ক'রে রাখব। আমি আমার সৈন্যদের এক-একজনকে এক-একটি বাঙালী মেয়ে উপহার দেব। সেদিনই রাগে ক্ষিপ্ত হ'য়ে হঠাৎ আক্রমণ করে কয়েকজন পাকিস্তানী সৈন্যকে হত্যা ক'রেছি। তবু বুকের জ্বালা মেটে নি। মেয়ে উপহার দেব। উঃ! কী অসহ্য অপমান! ওই অপমানের বদলা যে-পর্যন্ত নিতে না পারব, যে-পর্যন্ত না আমার মায়ের বোনের সম্মান ফিরিয়ে আনতে পারব, যে-পর্যন্ত না পূর্ববাঙলাকে পশ্চিমা শোষকগোষ্ঠীর হাত থেকে মুক্ত

ক'রতে পারব, যে-পর্যন্ত না বাঙলার কোটি কোটি বঞ্চিত, ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে দুবেলা দুমুঠো ভাত তুলে দিতে পারব, সেদিন পর্যন্ত আমাদের শান্তি নেই। বাঙলাদেশ থেকে পশ্চিমা বর্গীদের না তাড়ানো পর্যন্ত দুচোখে শান্তির অঞ্জন মেখে আমরা ঘুমুতে পারব না।

একটা অঞ্চলের গেরিলাবাহিনীর নেতৃত্বে রয়েছি আমি। গেরিলাট্রেনিং চলছে জোর। আমাদের ছেলেরা খুব দ্রুত শিখে নিচ্ছে সব কিছু। আগে আমরা প্রাণ দিয়েছি কাতারে কাতারে, এবারে শুরু হচ্ছে প্রাণ নেওয়ার পালা। ইতিমধ্যেই আমরা ১৩ হাজার পাকিস্তানীকে হত্যা ক'রেছি, ৩৫ হাজারকে জখম করেছি। 'ক', জয় আমাদের হবেই। পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে পদানত ক'রে রাখে। দেশকে আমরা ভালোবাসি, দেশের জল মাটি ঘাসই আমাদের শক্তি। শক্তি আমাদের শত্রুর প্রতি সীমাহীন ঘৃণা। ওরা লড়ছে অর্থের জন্য, আমরা লড়ছি দেশের জন্য, অস্তিত্বের জন্য। -সংখ্যায় আমাদের অর্ধেকের চেয়ে কম হ'য়ে ভিয়েতনামের মানুষ বছরের পর বছর লড়াই চালিয়ে যেতে পারে, কাঁধে রাইফেল নিয়ে যদি ভিয়েতনামী চাষী যদি ফসল ফলিয়ে যেতে পারে, পৃথিবীর একটি বড়ো শক্তির বিরুদ্ধে, তাহ'লে আমরাই-বা পারব না কেন? আমরা দেখিয়ে দেব, বাঙালী শুধু কবিতা লিখতেই জানে না, সেই সঙ্গে অস্ত্র ধরতেও জানে।

যখন একা থাকি, মাঝে মাঝে মনটা খারাপ হ'য়ে যায়। বাড়ির সকলে কে কোথায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে জানি না। মানুষ তো! দয়ামায়া এখনো বিসর্জন দিয়ে উঠতে পারি নি। দু'চোখ জলে ভরে আসে। কিন্তু পরমুহূর্তেই যখন ভাবি পশ্চিমপাকিস্তানের পশুরা বাঙলাদেশের মানুষের রক্ত শুষে নিয়ে, বেয়নেট খুঁচিয়ে, গুলি ক'রে ফ্লেম ছড়িয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা ক'রছে,

তখন ঠিক থাকতে পারি না। বুকের ভিতর অসহ্য জ্বালা ধরে যায়। সেইসব পশুদের হত্যা ক'রে বাঙলাদেশকে মুক্ত ক'রবই—তাতে যত রক্ত দিতে হয় দেব—এই আমাদের কসম।

শক্তির কথা ভাবছিস? অস্ত্রই একমাত্র শক্তি নয়। তাহ'লে বহুদিন আগেই ভিয়েতনাম নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেত। শক্তি মনোবল। আমাদের মায়েরা-বোনেরা সেই শক্তি। আকাশবাণী থেকে বাঙলার দামাল ছেলেমেয়েদের জন্য বেগম হোসেন আলীর কান্না-চাপা জ্বালানো-ধরানো কথা শুনেছিস নিশ্চয়ই। বেগম হোসেন আলীর মতো বাঙলাদেশের লক্ষ লক্ষ মা আজ বুক-ভরা অশ্রু আর দু'চোখে আগুন নিয়ে আশীর্বাদের অমোঘ বর্ম পরিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে পাঠাচ্ছে সন্তানদের। তাদের মুখের ভাষা: বাছা এসো; বুকের ভাষা: দেখো, আর-একটি মা-বোনকেও যেন চোখের জল ফেলতে না হয়। পশুদের হাতে আর একটি মায়ের, একটি বোনেরও ইজ্জতও যেন হানি না হয়। বুকের রক্ত ঢেলেও তা রুখবে, রক্তের বদলে তার শোধ নেবে।' 'ক', ভাবতে পারিস, এই 'মাভৈঃ' মন্ত্রের কাছে কোন্ অস্ত্র লাগে?

একটা খবর আছে, আলোও লড়াইয়ে নেমে পড়েছে। তোর মেমসাহেবকে দেখলে হয়তো চিনতেই পারবি না। পরনে সৈনিকের পোশাক, কাঁধে রাইফেল। কুমিল্লায় আলো একটি গেরিলা ইউনিটের নেতৃত্ব দিচ্ছে। আলো বলল, 'আতোয়ার থাকলে আজ আতোয়ারই লড়ত, আমি পাশে পাশে থাকতাম। আতোয়ার নেই। দেশের প্রতি আতোয়ারের শেষ কর্তব্যভার তাই আমিই তুলে নিয়েছি। আমি ছাড়া আতোয়ারের কাজ আর কে ক'রবে ব'লো। আতোয়ার নেই বলে তোমরা ওকে ছাড়িয়ে যাবে এ হ'তে পারে না।' এই বলে হু হু ক'রে কাঁদতে থাকল ও। ইতি।

তোর শাহাব